ইসলামী উপন্যাস

বায়াত

বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু – সহীহ বুখারী।

কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলহজ্জ-১৪৩৬ হিজরী

অক্টোবর-২০১৫ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ১৫০ টাকা।

এক:

....

নড়বড়ে বাসটা যখন পায়রাগাছি পৌঁছালো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাসটা থামতে না থামতেই শাহিন তাড়াহুড়া করে নামতে শুরু করে। রেজা তখনও নিজের সীটে স্থির বসে রয়েছে। তার গন্তব্যও যে এখানেই শেষ তা বোঝার উপায় নেই। আসলে সবার সাথে পাল্লা দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নামা তার মোটেও পছন্দ নয়। ওদিকে শাহিন বাস থেকে নেমে হাক ডাক শুরু করেছে।

- এই রেজা, নেমে আয় তাড়াতাড়ি। বাস ছেড়ে দেবে তো।

বাস ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনেও রেজার ভাবগতিতে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না। সে জানে এখনই বাস ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ড্রাইভারের খুব একটা তাড়া নেই। যতটা লোক নেমে গিয়েছে ততটা ভর্তি না হওয়া অবধি যে বাসটা এখানেই কালক্ষেপণ করবে সেটা সুনিশ্চিত। অতএব, বেশ কিছুক্ষণ

স্থিরভাবে বসে থেকে যখন বাসটা মোটামুটি খালি হয়ে এসেছে তখন ধীরে ধীরে রেজা আসন ছেড়ে নেমে এলো। তাকে নামতে দেখেই শাহিন দ্রুত গতিতে হাটতে শুরু করলো। ঠিক সমগতিতে তার পিছু পিছু হাটার পরিবর্তে রেজা নিজের জায়গায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলো। ততক্ষণে শাহিন বেশ দূরে চলে গেছে। দু'হাতে দু'মন ভারি দুটো ব্যাগ নিয়ে অত দ্রুত যে কীভাবে হাটছে সেটাই চিন্তার বিষয়। অনেক দূর যাওয়ার পর পিছনে তাকিয়ে যখন দেখলো রেজা ঠাঁই দাঁড়িয়ে তখন ভিতরে কিছুটা বিরক্ত হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে ভীষণ জোরে চিৎকার করে বলল,

- এই রেজা, দাঁড়িয়ে কেনো? জোরে হেঁটে আয়।

শাহিনের চিৎকার শুনে উপস্থিত সবাই তার দিকে দৃষ্টি দিল কেবল রেজা ছাড়া। সে শাহিনের দিকে তাকানোর বদলে এদিক সেদিক তাকিয়ে কি যেন তালাশ করছিল। অগত্যা কি আর করা, পেল্লাই সাইজের ব্যাগ দুটো দু'হাতে বহন করে শাহিনকে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে হলো।

- কি রে, বাদরের মতো ঠাঁই দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেনো? এদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

- বাদরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে না গাধা, বরং ছটফট

করে। যেভাবে তুই ছটফট করছিস। এমন কি মহামূল্যবান কাজে যাচ্ছিস যে এতো তাড়াহুড়া করে হাঁটতে হবে!

রেজার এই কথাটা শুনে শাহিনের অবশ্যই রাগ হওয়া উচিৎ ছিল, পীরের দরবারের বাৎসরিক মাহফিলটি তার নিকট মহামূল্যবানই বটে। কিন্তু এখনই রাগ প্রকাশ করলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। তাই মনের রাগ মনে চেপে রেখে আবারও হাসির মতো ভান করে বলে,

- যেতে যখন হবে তখন হাঁটতে তো হবেই, দাঁড়িয়ে থাকলে তো আর যাওয়া হবে না।

- হাঁটতে হবে কেনো? এখান থেকে ভ্যান-রিকশা যাবে না?

শাহিন বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলে,

- না, না।

শাহিনের কথা শেষ হতে না হতেই পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলো,

- আছে হুজুর, মাহফিলের স্পেশাল গাড়ি আছে। ঐ যে দেখুন।

লোকটির হাতের ইশারা মোতাবেক মাথা তুলে তাকাতেই দেখা গেলো অদূরে কয়েকটা ভ্যান সদৃশ বাহন এক স্থানে জড়ো করা আছে। টুপি পরা দু-

একজন লোক ব্যাগ-বস্তা সহ ঐ সব বাহনে উঠে মাহফিল অভিমুখে গমন করছে। এটা দেখে একগাল হেসে রেজা শাহিনের দিকে তাকায়। মিথ্যে কথাটা একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে দেখে শাহিন ভীষণ সংকুচিত হয়ে বলে,

- ঐ গাড়িতে যাওয়া যাবে না, ওর ভাড়া অনেক। এতদূর বাসে যে ভাড়া দিয়েছি এই তিন-চার কিলো পথে তার চেয়ে বেশি ভাড়া লেগে যাবে। তারচে বরং একটু হাঁটলেই পৌঁছে যাবো।

তিন-চার কিলো পথ হাটার কথা শুনে রেজা আরো বেশি নারাজ হয়ে যায়। মাথা নাড়িয়ে বলে,

- হেঁটে আমি যাবো না, হয় ভ্যানে চলো নয়তো আমার ফিরতি ভাড়া দিয়ে দাও বাড়ি চলে যাবো। এখনও সময় আছে রাত দশটা নাগাত বাড়ি পৌঁছে যাবো।

কথাটা শুনে শাহিনের মুখটা তিতো হয়ে যায়। অনেক মেহনত করে ছেলেটাকে মাহফিলে আসতে রাজি করিয়েছে। এরজন্য তার বেশ কিছু টাকাও খরচা হয়েছে। এখন সামান্য কিছু টাকার জন্য সেসব কষ্টের ফলাফল নষ্ট করা সম্ভব নয়।

- চলো তাহলে। কটা টাকা না হয় গচ্চাই যাবে।

শাহিনের মুখের ভাব দেখে বেশ জোরে হেসে ফেলে

রেজা।

- গচ্চা যাবে কেনো? আল্লাহর রাস্তায় যাবে। পীরের পিছনে পয়সা খরচা করলে কি আর গচ্চা যায়! গচ্চা যায় তো বাপ-মা কে খাওয়ালে।

শেষের কথাটুকু না বললে শাহিন মোটামুটি খুশিই হতো। শান্তিতে ভ্যান ভাড়ার টাকাটা খরচ করতে পারতো। এ ধরণের কথা পীরের দরবারের খাদেমরা প্রায়ই বলে, স্বয়ং পীর সাহেবও বলেন। পীর সাহেব কে হাদিয়া-তোহফা দিয়ে খুশি করতে পারলে নাকি আল্লাহ-রসুল, ফেরেস্তাকুল সবাই খুশি হয়ে যায়। এসব ফতোয়া শুনে শাহিনও খুশি হয়ে যায়। পকেটে যা থাকে বের করে দেয়। এমনিতে সে ভীষণ কৃপণ। পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত কয়েক বিঘা জমি চাষাবাদ করে আয়-উপার্জন মন্দ হয় না। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার ব্যাপারে সে কঠিন নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। প্রতিদিনকার চাল তাকে কিনতে হয় না। ঘরের ধানেই বছর ঘুরে যায়। তবু বাজার খরচে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা খরচা হয়ে গেলে তার মনটা উসখুস করে। গ্রামে হায়দারের দোকানে চা-পান খেয়ে তার বাবা মাসে প্রায় শ-খানেক টাকা বাকী করে ফেলে। এ নিয়ে বাবার সাথে তার প্রায়ই বচসা হয়। ছেলে-পুলে গুলো মন্ডা-মিঠাই খাওয়ার জন্য এক-আধ টাকা চাইলে তাদের

অনেক সময় ডান্ডা বাড়ি খেতে হয়। হিসাবের বাইরে কিছু খরচ হলেই তার মুখ কালো হয়ে যায়। বাড়ির সব কটা লোককেই শাহিন খুব অপছন্দ করে। তারা শুধু শুধু খরচ করায়। কেবল তার বিবি ময়না, তার কাছে কিছুই চায়না। শাড়ি, চুরি, গয়না ইত্যাদি যা কিছুর দরকার হয় সে নিজেই কিনে নেয়। শাহিনের পকেট থেকে প্রতিদিন দু-পাঁচ টাকা সরিয়ে যে টাকা জমে তা দিয়ে নিজের জন্য কিছু একটা কিনে বাবার বাড়ির নামে চালিয়ে দেয়। শাহিন তখন খুশি হয়ে শশুর-শাশুড়ি আর তাদের গুণবতী মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়। কিন্তু পীর-বাবার দরবারে আসলে শাহিন অকাতরে খরচ করে। পীরকে খুশি করার জন্য বেশি বেশি হাদিয়া পেশ করার চেষ্টা করে। শাহিন লক্ষ্য করেছে নতুন লোক মুরিদ করতে পারলে পীর সাহেব খুব খুশি হোন। একারণে সে গত কয়েক বছর থেকে তাদের গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের পিছনে লেগে আছে। ইমাম সাহেব তার বাল্যবন্ধু। বয়স বেশি নয় কিন্তু খুব প্যাঁচাল মানুষ। তাকে বোঝানো সহজ কথা নয়। গত কয়েক বছর থেকে বলে বলে তাকে মাহফিলে হাজির করা যায় নি। এবার এক রকম জোর করে তাকে ধরে এনেছে। তবে শর্ত হলো যাওয়া-আসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় খরচ

শাহিনকে বহন করতে হবে। শাহিন এ শর্তে রাজি হয়েছে। অতএব ভ্যান ভাড়ার টাকা তো তাকে খরচ করতেই হবে। এখন আর টাকার মায়া করে কী লাভ!

বেশ কিছুক্ষণ দর দাম করে ভ্যানের ভাড়া দুই'শ টাকাতে দাঁড়ালো। এর কমে কেউ যেতে রাজি নয়। নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই চড়া মূল্য মেনে নিতে হলো। মাল সামানা গুলো ভ্যানে তুলে দিয়ে দু'জন ভ্যানে উঠে বসলো। আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে টুং টাং শব্দ করে দুলে দুলে ভ্যান চলছিল। সারাদিনের ক্লান্তি মাখা চোখে রেজার তন্দ্রা এসে যাচ্ছিল। সেই তন্দ্রাকে উপেক্ষা করে মাঝে মাঝে সে আলতো ভাবে দৃষ্টি খুলে চারিদিকটাই চোখ বুলিয়ে দেখছিল। আধা ঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব জগৎটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল তার কাছে। সে দেখছিল শাহিনের মতো একটি বা দুটি ব্যাগ বহন করে শত-শত মানুষ চারিদিকে কিলবিল করছে। যে যার মতো তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু একটি ভ্যানও চোখে পড়ছে। বোঝাই যাচ্ছে তারা সবাই মাহফিলে যাচ্ছে। শাহিনের মতো তারা যে খুব একটা তাড়াহুড়া করছে তা নয় তবে তারা পঙ্গপালের মতো এক নাগাড়ে হেঁটেই চলেছে।

মাহফিলের মাঠে পৌঁছে রেজা সত্যিই বিস্মিত হলো। হাজার হাজার লোক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

চটের ছাউনির নিচে যে যার মতো বিছানা বা চাদর পেতে বসে রয়েছে। শাহিন রেজাকে নিয়ে বেশ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে এক স্থানে বিছানা ও চাদর পেতে জায়গা করে নিল। তখনও জোহরের ওয়াক্ত বাকী ছিল। তারা ওযু করে এসে নামায পড়ে নিল। তারপর শাহিন হালকা কিছু খাবার কেনার জন্য বের হয়ে গেলো। আর রেজা হালকা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়ল। প্রায় সাথে সাথেই তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেলো।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ রেজার সামনে ভেসে উঠলো একটা বিশাল মরুপ্রান্তর। এখানে সেখানে দু'একটি খেজুর গাছ আর মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য। সেই সাথে ভেসে আসছে একটা মৃদু গুঞ্জরন। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে রেজা দেখলো, পূর্ব দিকে দিগন্তের সীমানায় যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিশে গেছে সেখানে ধোঁয়ার মতো কি যেনো উড়ছে। সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সেদিক থেকে গুমগুম একটা আওয়াজ আসছে। ভীষণ কৌতূহল নিয়ে রেজা সেদিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ক্রমেই কোলাহল বাড়তে থাকে এবং একসময় পূর্ব দিকের খেজুর গাছ গুলোর আড়াল থেকে হঠাৎ বেশ কিছু ঘোড়সওয়ার দৃশ্যমান হয়। তাদের হাতে নানা রকম অস্ত্র। ক্ষিপ্র গতিতে তারা ছুটে আসছে। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধুলাবালি ধোঁয়ার মতো মনে

হচ্ছে। এই দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও রেজার নিকট খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। তার মনে হচ্ছে এটা আসলে ভয়ংকর কোনো ব্যাপার নয় বরং ভীষণ মজার ব্যাপার। যেনো এ দৃশ্য তার নিকট অতি পরিচিত। কিন্তু এমন মনে হওয়ার কারন কি? সে তো কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি। পঁচিশ বছরের জীবনে সে কখনও তার সামনে দিয়ে একদল মারমুখী সসস্ত্র লোককে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে আসতে দেখেনি। তবে কেনো এই দৃশ্য তার নিকট এতটা পরিচিত মনে হচ্ছে? তার কানে ভেসে আসে কে যেনো বলছে,

- এরা হলো মুজাহিদ, জিহাদে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ চমকের মতো রেজার মনে পড়ে যায় বদর, উহুদের কথা। এভাবে খন্দক, খায়বার, তাবুক, ইয়ারমুক ইত্যাদি সব ঘটনা তার স্মৃতির পাতায় ভেসে আসতে থাকে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ের মতো সূরা আদিয়াতের প্রথম দিককার আয়াতগুলো তার মনে পড়ে যায়। যেখানে ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমান ঘোড়ার কসম করা হয়েছে। যার পায়ের আঘাতে অগ্নি ঝরে আর ধোঁয়ার মতো ধুলো ওড়ে। মুজাহিদরা সেগুলো নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রু বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। রেজার মনে হয় এসব আয়াতে এরকম একটি

মুজিহিদদের দলের কথাই বলা হয়েছে।

জিহাদের কথা কল্পণা করে রেজার তরুণ মনটা আবেগে উথলে ওঠে। সেই ছোট বেলা থেকে সে জিহাদের কাহিনী শুনে আসছে। জিহাদে কত সওয়াব আর শহীদের কত সম্মান!! এসব মুজাহিদদের সাথে জিহাদে যোগ দেওয়ার জন্য তার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুজাহিদদের দলটি রেজার খুব কাছে চলে আসে। রেজা লক্ষ্য করে তাদের সবার মাথায় একটা করে পাগড়ি বাঁধা আর পাগড়ির এক প্রান্ত দিয়ে সবাই নিজের মুখ ঢেকে রেখেছে। ঠিক মাঝে একজন লোক একটা কালো পতাকা উঁচু করে রেখেছে। পতাকাটা কি সুন্দর পতপত করে উড়ছে! রেজা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। আবেগে উত্তেজিত হয়ে বলে,

- তোমরা কারা?

তাদের মধ্যে কে একজন গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়,

- আমরা ইমাম মেহেদীর বাহিনী।

ইমাম মেহেদীর কথা শুনে রেজার আনন্দ বিশাল আকার ধারন করে। সবাই বলে, শেষ জামানায় মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য ইমাম মেহেদী

আসবেন। তিনি ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবেন আর ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তার দলে যারা থাকবে তারাই শ্রেষ্ঠ। খুশিতে রেজার মুখটা উজ্জল হয়ে যায়।

- ইমাম মেহেদী এসে গেছেন?

রেজার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে সেই ব্যক্তি আবার বলে,

- না। তিনি এখনও আসেন নি। তবে হয়তো শীঘ্রই আসবেন।

রেজা কিছুটা হতাশ হয়ে বলে,

- তিনি যখন আসেন নি তখন আর জিহাদে গিয়ে কি লাভ! ইমাম মেহেদী আসার আগে তো আর কোনো জিহাদ হবে না!

লোকটা এবার ভীষণ রেগে যায়। ধমক দিয়ে বলে,

- কে বলেছে জিহাদ হবে না? আল্লাহর রাসুল বলেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। প্রতি যুগেই কেউ না কেউ জিহাদ করতে থাকবে। আল্লাহর রাসুলের ওফাতের পর সাহাবারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের পর প্রতি যুগেই জিহাদ হয়েছে এখনও হচ্ছে। তারেক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এর কনস্টান্টিপল বিজয়, ক্রুসেড যুদ্ধে সুলতান সালাহ

উদ্দীনের বিজয় এসব কাহিনী শোনো নি?

রেজা সম্মতি জানায়। সে এসব কাহিনী শুনেছে। এসব যুদ্ধের উপর লেখা বিভিন্ন উপন্যাস পড়েছে।

লোকটি বলতে থাকে,

- শোনো, ইমাম মেহেদী এসে এক চুলও বসে থাকবেন না। তিনি কাফিরদের সাথে সংগ্রাম করবেন। মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেবেন। মুসলিম উম্মাহকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। যদি আগে থেকেই মুজাহিদরা তৈরী হয়ে না থাকে তবে তিনি কাদের সাথে নিয়ে লড়বেন? একা তো আর যুদ্ধ করা যায় না! সারা বিশ্বের মুজাহিদদের একত্রিত করে জিহাদের প্রশিক্ষণ যদি তাকেই দিতে হয় তবে তো বছরের পর বছর তাকে বসে থাকতে হবে। আমরা আগে থেকেই তার জন্য রাস্তা তৈরী করছি। তার জন্য বাহিনী প্রস্তুত করছি। তিনি আসলেই আমরা তার হাতে পতাকা তুলে দেবো। এটাই হলো তার বাহিনী তিনি এসে এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন।

বিষয়টি রেজা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহর দ্বীন কোনো ব্যক্তির জন্য বসে থাকে না। ইমাম মেহেদীর জন্য যেমন, মুসলমানরা নামায রোজা ছেড়ে দিয়ে বসে নেই তেমনি জিহাদও ছাড়া যাবে না। উহুদের ময়দানে

যখন রাসুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে তখন সাহাবাদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে তরবারী ফেলে দেন এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বেও অনেক রাসুল গত হয়েছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হোন তবে কি তোমরা আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করবে?" অতএব, কোনো অজুহাতে বসে থাকলে চলবে না। জিহাদ করতে হবে। রেজা ভীষণ উচ্ছাস নিয়ে বলে,

- আমি জিহাদে যাবো, আমাকে নিয়ে চলো।

রেজার অতি উৎসাহ দেখে সামান্য হেসে লোকটি বলে,

- জিহাদের জন্য আগে বায়াত লাগবে।

বায়াত কথাটি শুনে রেজা ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

- বায়াত কি?

- বায়াত হলো, ওয়াদা।

- কিসের ওয়াদা?

- আনুগত্যের ওয়াদা, সহযোগীতার ওয়াদা। যারা জিহাদ করতে চাই তারা সবাই মিলে একজন আমীরের হাতে হাত দিয়ে ওয়াদা করতে হবে যে, আজীবন লড়াই করতে থাকবো, পালিয়ে যাবো না।

বিষয়টি রেজা এখনও ভাল বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে বলে,

- অতো ওয়াদার কি দরকার! যে পালাই পালাক, আমি একাই জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাবো। জান্নাতে চলে যাবো।

তারুণ্যের আবেগ অবলোকন করে লোকটি মুচকি হেসে বলে,

- এভাবে যে যার মতো একাকী জিহাদ করে শহীদ হয়ে জান্নাত হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু কাফিরদের পরাজিত করা যাবেনা, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, মুসলমানদের কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

রেজা এখন বিষয়টির গুরুত্ব কিছুটা অনুধাবন করতে পারে কিন্তু এখনও পুরো জট কাটিয়ে উঠতে পারে না।

- তা ঠিক কিন্তু নামায পড়তে বায়াত লাগে না জিহাদে বায়াত লাগবে কেনো?

- দেখো, নামায পড়তে বায়াত লাগেনা কারণ নামাযে কোনো ভয় নেই পালিয়ে আসার সম্ভাবনাও নেই। ধরো, মসজিদে একদল লোক জামাতে নামায পড়তে দাঁড়ালো, তার পর একজন একজন করে সবাই পালিয়ে গেলো, কেবল ইমাম সাহেব একা দাঁড়িয়ে

নামায পড়তেই থাকলো। এমন কখনও হয়?

রেজা মাথা নাড়ে। এমন কখনও হয় না। সে নিজেই কয়েক বছর ধরে মসজিদে নামায পড়ায়। এমন ঘটনা জীবনে কখনও দেখে নি।

লোকটি বলতে থাকে,

- কিন্তু জিহাদে এমন ঘটনা ঘটে। বড় বড় ঈমানদার লোকেরাও অনেক সময় পালিয়ে যায়। উহুদ, হুনায়নে অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আরও একটা ব্যাপার হলো, নামায পড়তে গিয়ে যদি সবগুলো মুছল্লী পালিয়ে যায় আর ইমাম সাহেব একা নামায পড়তে থাকে তবু কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় না। এমন কি নামাযও নষ্ট হয় না। কিন্তু জিহাদের ময়দান থেকে কিছু লোক পালিয়ে গেলে বাকীরা নিহত হয়, মুসলিমরা পরাজিত হয়, কাফিররা বিজয়ী হয়। ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। একারণে আগেই সবার কাছ থেকে ওয়াদা নেওয়া হয় যাতে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো দৃঢ়ভাবে শত্রুকে মোকাবিলা করে। এটাই হলো, বায়াত।

সীসা ঢালা প্রাচীরের কথা শুনে রেজার মনের মধ্যে কি যেনো একটা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। তার মনে হয় কথাটা যেনো সে কোথায় পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ স্মরণ

করার পর সে মনে করতে পারে, সূরা সফের প্রথম দিকে বলা হয়েছে,

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন যারা তার রাস্তায় সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে।”

এতক্ষণে তার নিকট বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়।

- হ্যাঁ হ্যাঁ জিহাদে তো বায়াত অবশ্যই দরকার। এটা তো কুরআনেই বলা হয়েছে। আসুন আমি আপনার হাতে বায়াত হবো।

বায়াত হওয়ার কথা শুনে লোকটি আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। ধমক দিয়ে বলে,

- যার তার হাতে বায়াত হলেই কি হয়? বায়াত হতে হবে বুঝে শুনে। মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবে, ইসলাম কায়েম করবে কেবল এমন লোকের হাতে বায়াত হতে হবে। সে হবে জামানার ইমাম, মুসলিমদের খলীফা। বায়াতের দায়িত্ব অনেক। সে দায়িত্ব যে পালন করতে পারবে তাকেই বায়াত দিতে হবে। এমন একটা লোক অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। বায়াত হতেই হবে, বায়াত ছাড়া উম্মতের মুক্তি নেই।

কথাটি বলেই লোকটি যাত্রা শুরু করে, তার পিছু পিছু সবাই চলে যায়। কেবল রেজা পিছনে পড়ে থাকে।

তার মনে কেবল একটি কথায় বাজতে থাকে “বায়াত ছাড়া মুক্তি নেই, বায়াত ছাড়া মুক্তি নেই”। সে মৃদু শব্দে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ঠিক তখন সে লক্ষ্য করে শাহিন তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,

- কাঁদছিস কেনো?

রেজা তার দুহাত ধরে চেচিয়ে বলে,

- আমি বায়াত হবো, বায়াত ছাড়া মুক্তি নেই।

ঘুম ভাঙার পরই রেজার চোখের সামনে শাহিনের চিন্তিত চেহারাটা ভেসে উঠলো। তার কাঁধে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। তার পিছনে লাঠি হাতে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটির চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে উত্তেজনা চেপে রেখেছে। লোকটি সম্ভবত এখানকার স্বেচ্ছাসেবক। তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শাহিনের দিকে তাকাতেই সে বলে,

- কিরে স্বপ্ন দেখছিলি মনে হয়?

- হু।

- কি দেখলি?

- অনেক কিছু। অনেক লম্বা স্বপ্ন। পরে বলবো। এখন ভাল্লাগছে না।

পাশের লাঠিওয়ালা লোকটির যেনো তর সইছে না। হঠাৎ বসে পড়ে রেজার দু হাত ধরে বলল,

- বাবা কি দেখলে বলো, আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, শুনলাম তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যেনো বলছো। বলো বাবা, কি বলছিলে। তোমাকে বলতেই হবে।

লাঠিয়াল লোকটি অনবরত পীড়াপীড়ি করতেই থাকে। রেজা ভীষণ বিরক্তি অনুভব করে। এই স্বপ্নটি বেশ আশ্চর্যজনক। জীবনে এমন স্বপ্ন সে কখনও দেখেনি। এখনই কাউকে এ সম্পর্কে জানানোর ইচ্ছা তার নেই। সে নিজেই স্বপ্নটি নিয়ে গভীরভাবে ভাববে। তবে দ্রুত লোকটাকে বিদায় করার জন্য সংক্ষেপে বলে,

- দেখলাম কেউ একজন আমাকে বলছে, জামানার ইমামের হাতে বায়াত হতে হবে।

হিতে বিপরীত হয়ে গেলো। এতদূর বলতেই লোকটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলতে লাগল,

- নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। বাবা অটল বীর পটলপুরী, জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

তার চিৎকার শুনে বিশাল লোক জমায়েত হয়ে গেলো। ঘটনা কি জানার জন্য উৎসুক জনতা লোকটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেলো। লোকটি রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকলো,

- এই ছেলেটা স্বপ্ন দেখেছে, তাকে একজন ফেরেস্তা

এসে বলছে, জামানার ইমাম বাবা অটলবীর পটলপুরীর হাতে বায়াত হতে। এটাই প্রমাণ করে আমাদের বাবা জামানার ইমাম, পীরানে পীর একজন জিন্দা কুতুব। নারায়ে তাকবীর,

সবাই একত্রে বলে ওঠে

- আল্লাহু আকবার।

এই গোলোযোগে রেজার মাথাটা খারাপ হওয়ার উপক্রম হয়। তার মেজাজটা আরও বেশি চড়ে গেলো যখন দেখলো লোকজন ঐ বৃদ্ধ লাঠিয়ালকে ছেড়ে এবার তাকে ঘিরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তারা একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে,

- কী দেখেছো বাবা আমাদের একটু বলো, নিজ কানে শুনি।

এক সময় রেজার মেজাজটা পুরা বিগড়ে যায়। রাগে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। চিৎকার করে ধমক দিয়ে বলে,

- সবাই সরে যান। আমি কিচ্ছু দেখি নি। যান বলছি।

এই ধমকে কাজ হয়। বৃদ্ধ লাঠিয়াল লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে সবাইকে সরিয়ে দেয়। সে নিজেও চলে যায়। জায়গাটা আবার আগের মতো নিরব হয়ে যায়। শাহিন তখন পলেথিনের ব্যাগ থেকে সদ্য কিনে আনা খাবারগুলো

বের করে। কয়েকটা রুটি আর কলা, একটা বোতল ভর্তি পানি। এখন এসব খেয়েই থাকতে হবে। রাতে ভাল খাবারের ব্যবস্থা হবে।

মাগরিবের পর স্বয়ং পীর সাহেব মঞ্চ অলংকৃত করলেন। অলংকৃত করলেন কি কলংকিত করলেন তা বলা মুশকিল। যেহেতু বক্তব্যে তিনি যেভাবে জাল হাদীস আর ভেজাল কাহিনী বর্ণনা করছিলেন তাতে রেজার বদ হজমের উপক্রম হয়।

প্রথমেই কয়েকটা উর্দু, ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করে নিয়ে বললেন,

- বাবারা কান্দো, বুক ফাটাইয়া কান্দো। কানতে কানতে মাঠ ভাসাইয়া ফেলো।

এরপর নিজেও হাই হাই হু হু ইত্যাদি বিকট শব্দে কাঁদতে শুরু করেন। আর মুরীদানরা হাত-পা ছুড়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে শুরু করে। এর মাঝে পীর সাহেবের সামনে একটি পাত্র হাজির করা হলো, তিনি তাতে কয়েক বার থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। তারপর কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন,

- আমার রুহানী সন্তানরা ....

ময়দানে তখন বিভীষিকার সৃষ্টি হলো। মুরীদরা দুহাত

উঁচু করে, বাবা আমার বাবা, দয়াল বাবা, কেবলা কা'বা ইত্যাদি বলে পীরের ডাকে সম্মতি জ্ঞাপন করছিল। সেই সাথে বাবা মরে গেলে মানুষ যেভাবে কাঁদে তেমন মাতম চলছিল। রেজার পাশে বসে শাহিনও হাত-পা ছড়িয়ে কান্না-কাটি করছিল। রেজা তার দিকে একবার চোখ রাঙিয়ে তাকালে সে শান্ত হয়। বেশ কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে পীর সাহেব আবার শুরু করেন,

- বাবারা শোনো! কিয়ামতের দিন যখন তামাম মানুষ নদীতে হাবু ডুবু খাইতে থাকবে আর ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী করতে থাকবে। তখন এই চিশতীয়া তরিকার বুযুর্গরা এক কিশতীতে সওয়ার হইয়া জান্নাতে রওয়ানা হইবেন। তোমরা যারা এই তরীকার মুরীদ হইছো বাবারা সেই দিন ঐ কিশতীতে জাইগা পাইবা এইটা একীন রাইখো।

এতদূর বলে পীর সাহেব আহ! বলে বিকট একটা শব্দ করলেন। আর সাথে সাথেই কিয়ামতের আলামত শুরু হয়ে গেলো,

এতক্ষণ তো মানুষ যে যার জায়গায় বসেই হাত-পা ছুড়ছিল এবার পুরা বাদর নাচ শুরু হয়ে গেলো। রেজা দেখলো পাশেই এক লোক যিকির করতে করতে একটা বাঁশ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। একজন লাঠিয়াল তাকে

নিচ থেকে টেনে ধরে নামানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সে আসলে টেনে নামাচ্ছে কি ঠেলে উঠাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কেউ বাদরের মতো মুখ ভেংচি দিচ্ছে। এক কথায় বিশ্রী কান্ড।

এরপর শুরু হলো ভয়ংকর সব কাহিনী, একজন পীর সাহেব যিকির করতে করতে তার হাত পা দেহ থেকে খুলে আলাদা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যিকির করতো। পরে যিকর শেষ হলে আবার সেসব স্বয়ংক্রীয়ভাবে জায়গা মতো সেট হয়ে যেতো .. ইত্যাদি।

রেজা ভাবে,

- এটাই কি ইসলাম?

তার মন সাই দেয় না। এই কৌতুককে মহানবীর রেখে যাওয়া ইসলাম হিসেবে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বক্তব্য শেষ করার আগে পীর সাহেব বললেন,

- বাবারা, মেরা পেয়ারা রসুল বইলাছেন, বয়াত বিহীন মৃত্যু জাহেলীয়াতের মৃত্যু। তই বাবা বয়াত হওয়া চায়। বয়াত ছাড়া ছাড়ান নাই বাবা ছাড়ান নাই।

পীর সাহেবের এই কথাটি শোনার সাথে সাথে রেজার মন মগজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তার মনে পড়ে যায় বিকালে দেখা স্বপ্নের কথা, একদল মুজাহিদের কথা।

যারা একই কথা বলেছিল। বলেছিল, বায়াত ছাড়া উম্মতের মুক্তি নেই। সেই সাথে তারা যাকে বায়াত দেওয়া হবে তার দায়িত্বের কথাও বলেছিল। পটলপুরের পীর সাহেব কি বায়াতের সেই গুরুদায়িত্বের কথা জানেন? তিনি কি সে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? নাকি কেবল শখের বশে মানুষকে বায়াত করছেন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, পীর সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে। মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে রেজা।

রাতে খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। পুরো ময়দান নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রেজার ঘুম আসে না। কীভাবে পটলপুরের পীর অটল বীরের সাথে সাক্ষাত করা যায় সেটা নিয়েই ভাবতে থাকে। সে ভাবে শাহিনকে পটিয়ে পাটিয়ে কিছু একটা জুতসই হাদীয়া কিনে পীরের সাথে একান্তে সাক্ষাত করতে হবে। তাকে বায়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে। কিন্তু কী প্রশ্ন করা যায়? বলতে হবে,

- আপনি কি জামানার ইমাম? আপনি কি জিহাদে যাবেন?

যদি পীর সাহেব বলে না, তবে বলতে হবে,

- তাহলে কেনো আপনি মিছি-মিছি বায়াত নিচ্ছেন?

আপনি একটা ধোঁকাবাজ, এক নম্বরের প্রতারক।

একটু পরই রেজার মনে হয় এভাবে বলা ঠিক হবে না। পীর সাহেব ভীষণ রেগে যাবেন। আবার অন্য কিছু ভাবতে থাকে সে। এভাবে বিভিন্ন চিন্তা তার মাথায় বাসা বাধে। এসব চিন্তা ভাবনাকে মাথা থেকে সরিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। অনেক অপেক্ষার পর এক সময় তার চোখ দুটো বুজে যায়, শরীরটা নিথর হয়ে আসে। এই অবস্থাটাকে মানুষ বলে ঘুমিয়ে পড়া, কেউ বলে বিশ্রাম নেওয়া। কিন্তু রেজার মোটেও বিশ্রাম হলোনা। বিছানায় পড়ে থাকা দেহটা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাহ্যিক সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গেছে। রেজা তখন দেখলো, সে একটা প্রকান্ড জঙ্গলে একা বসে রয়েছে। তার মাথার মধ্যে একই চিন্তা খেলা করছে,

- ইমাম মেহেদী আসবেন, তার জন্য বাহিনী তৈরী করতে হবে। এর জন্য বায়াত হওয়া দরকার। বায়াতের জন্য একজন যোগ্য লোক খুঁজে বের করতে হবে। একজন জিহাদী নেতা, জামানার ইমাম, অটল বীর।

অটল বীর কথাটা মনে হতেই তার মনে পড়ে পটলপুরের পীর অটল বীরের কথা। তার মাথায় যেনো

বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। নিজের অজান্তেই বলে ওঠে,

- এই তো পাওয়া গেছে, যেভাবেই হোক পীর সাহেবকে রাজি করাতে হবে। তিনিই পারবেন। এতগুলো যার মুরীদ সে অবশ্যই জিহাদ করতে পারবে।

কিন্তু তাকে কোথায় পাওয়া যাবে, তার সাথে কীভাবে সাক্ষাৎ করা যাবে! রেজা জঙ্গলের মধ্যে এদিক সেদিক দৌঁড়াতে থাকে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাধায় সওয়ার হয়ে একজন কীম্ভুতকিমার লোক তরবারী হাতে ছুটে আসছে। রেজা তাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। কে এই ব্যক্তি? এই কি তবে ইবলিস শয়তান?

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে লোকটা,

- ইবলীস হলো খবীস, আমি তার চেয়ে বেশি খবীস। আমি হলাম কানা দাজ্জাল।

রেজা আতকে ওঠে,

- কী সর্বনাশ! ইমাম মেহেদীর বাহিনী বের হওয়ার আগেই কানা দাজ্জাল চলে এসেছে। হাই হাই এখন কী হবে?

দাজ্জাল কিছুটা বিরক্ত হলো বলে মনে হয়, ঠোট বাঁকা করে বলে,

- আমার এখনও সময় হয়নি। যেদিন সময় হবে সেদিন তোমাদের চিবিয়ে খাবো।

কথাটি বলে হিংস্র পশুর মতো গর্জন করে ওঠে। দাজ্জাল এখনও বের হয়নি শুনে রেজা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলে,

- তবে তো কিছুটা সময় পাওয়া গেলো, এর মধ্যেই আমরা মাহদী বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলবো।

দাজ্জাল আবার হো হো করে হেসে ওঠে,

- শোনো বোকা, ব্যাপারটা অত সহজ নয়! আমি নেই তো কি হয়েছে দুনিয়াতে আমার লক্ষ-কোটি অনুসারী রয়েছে। তারা আমার জন্য বাহিনী প্রস্তুত করছে। তোমাদের মেহেদী বাহিনীকে তারা ছারখার করে দেবে। একেবারে চারা শুদ্ধ উপড়ে ফেলবে।

কথাটি বলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকে কিম্ভুতকিমার লোকটি।

এই হাসিতে রেজা মারাত্মক অপমান বোধ করে। রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে,

- আমরা বায়াত হবো, সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো একজোট হয়ে তোমার বাহিনীর সাথে জিহাদ করবো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। তোমার বাহিনী পরাজিত হবে।

এই কথাটি শুনে কানা দাজ্জালের মুখে স্পষ্ট আতংক ফুটে ওঠে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে,

- কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! বায়াত, জিহাদ এসব তো তোমার জানার কথা নয়। আমি তো এসব ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছাড়ানোর জন্য স্বয়ং ইবলীসকে আদেশ দিয়েছি। আমার একান্ত প্রিয়ভাজন আব্রাহাম লিংকনের মাধ্যমে গণতন্ত্র আবিষ্কার করে মুসলমানদের সসস্ত্র জিহাদের বদলে ভোটাভুটিতে নিমগ্ন রেখেছি। অপর দিকে আমার রুহানী সন্তান তথা ভন্ড পীরদের মাধ্যমে নকল বায়াত চালু করে আসল বায়াত তথা মানুষকে জিহাদের ময়দানে আমরণ সংগ্রাম করার দীক্ষা থেকে সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু তুমি কীভাবে এসব শিখলে!

রেজা লক্ষ্য করে রাগ আর আতঙ্কে দাজ্জালের কুৎসিৎ চেহারাটি আরও বেশি কুৎসিৎ আকার ধারন করেছে। এই অবস্থা দেখে সে ভীষণ তৃপ্তি অনুভব করে। নিজের অজান্তেই তার ঠোটের কোনে হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি দেখে কানা দাজ্জাল ভীষণ রাগান্বিত হয়ে যায়। চিৎকার করে বলে,

তোমাকে আমি হত্যা করবো, তোমাকে শেষ করে ফেলবো।

কথাটি বলে তরবারী উঁচু করে রেজার দিকে এগিয়ে

আসতে থাকে নিষ্ঠুর লোকটি। রেজা তখন প্রাণপনে পালাতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ দৌঁড়ানোর পর রেজা পটলপীরের মাহফিলে পৌঁছে যায়। সে দেখে হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। সে অবাক হয়ে ভাবে, এদের কি কোনো চিন্তা নেই! কানা দাজ্জাল বের হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, এখনও মাহদী বাহিনী প্রস্তুত হয়নি এসব নিয়ে কি এরা চিন্তা করে না! পীর সাহেব কি এদের কিছুই শেখায় না! সে চিৎকার করে বলে,

- সবাই ওঠো, কানা দাজ্জাল আসছে।

কিন্তু তার কথা কেউ শোনে না। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রেজা ভাবে, পীর সাহেবকে খুঁজে বের করতে হবে। তিনি বললে, এরা অবশ্যই শুনবে। এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে রেজা পীর সাহেবের ঘরটা পেয়ে যায়। সেখানে ঢুকে দেখে পীর সাহেব সহ দু-চারজন লোক শুয়ে বসে রয়েছে। পীর সাহেব একটা বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন আর দুজন লোক তার দু পা মর্দন করছে। মাথার কাছে একজন বাতাস করছে। পাশে একজন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। রেজা ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলে,

- দাজ্জাল আসছে, দাজ্জাল আসছে!!

তার চিৎকার শুনে, পীর সাহেব অনেক কষ্টে চোখের পাতাটা উঁচু করে আবার বুজিয়ে ফেললেন।

যে লোকটা দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল সে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে,

- কথা বলো না, বাবা ঘুমোচ্ছেন।

রেজা রাগত স্বরে বলে,

- ঘুমলে চলবে না, দাজ্জাল এসে গেছে, কানা দাজ্জাল এসে গেছে।

লোকটি এবার আগের চেয়ে বেশি রেগে গিয়ে বলে,

- দাজ্জাল এসেছে তো আমরা কি করবো? আমরা কি খুশিতে নাচানাচি করবো?

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রেজা ধমক দিয়ে বলে,

- নাচতে তো তোমরা ভালই পারো এবার অন্য কিছু করতে হবে?

কথাটা শুনে লোকটা মুখ কালো করে বলল,

- অন্য কিছু আবার কি?

- এবার বায়াত হতে হবে।

বায়াতের কথা শুনে লোকটা খুশি হলো বলে মনে হয়। এতক্ষণে তার মনে হলো, বাবাকে এবার ঘুম থেকে তোলা যায়।

পীর সাহেব চোখ মেলে তাকাতেই রেজা উত্তেজিত হয়ে বলে,

- দাজ্জালের বের হওয়ার সময় হয়ে গেছে, ইমাম মেহেদীর বাহিনী প্রস্তুত করতে হবে, বায়াত হতে হবে।

পীর সাহেব কিছু বুঝলেন কিনা বোঝা গেলো না তবে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

- নাও বাবা বায়াত হও।

রেজা লক্ষ্য করলো, কথাটা বলার পরই পীর সাহেবের চোখ দুটি স্বংয়ক্রীয় ভাবে বুজে গেলো। সে তার হাত ধরে ঝাকি দিতেই আবার তার চোক দুটো খুলে গেলো? বিরক্ত হয়ে বললেন,

- কী হলো?

রেজা এক নিশ্বাসে আবার বলে,

- কানা দাজ্জাল এসে গেছে, সবাইকে মেরে ফেলবে। এভাবে ঘুমিয়ে থাকলে আপনাকেও মেরে ফেলবে।

মরে যাওয়ার কথা শুনে পীর সাহেবের বোধ উদয় হলো বলে মনে হয়, এক লাফে উঠে বসে বললেন,

- দাজ্জাল? হাই হাই এখন কি হবে?

- বায়াত হতে হবে বায়াত।

পীর সাহেব যেনো কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

মুখটা শুকনো করে বললেন,

- হাই আল্লাহ! কপালে কি এই লেখা ছিল। এই বুড়ো বয়সে কিনা আমাকে দাজ্জালের হাতে বায়াত হতে হবে। হাই হাই।

- আহা, দাজ্জালের হাতে বায়াত হতে যাবেন কোন দুঃখে। আপনার হাতেই তো আমরা সবাই বায়াত হবো।

পীর সাহেব একটু বিভ্রান্ত হয়ে বললেন,

- সবাই তো আমার হাতে বায়াত হয়েই রয়েছে। আবার বায়াতের কি দরকার?

- আহা! সে বায়াত তো, পীর মুরীদীর বায়াত। এবার হবে জিহাদের বায়াত। সকলকে সাথে নিয়ে আপনি জিহাদ করবেন। কাফির-মুশরিকদের সাথে লড়াই করবেন। আপনি হবেন জামানার ইমাম, মাহদী বাহিনীর নেতা।

জামানার ইমাম, মাহদী বাহিনীর নেতা ইত্যাদি উপাধী শুনে পীর সাহেবের মনটা গলে গেলো। তাড়াতাড়ি করে মঞ্চে গিয়ে উঠে বসলেন। চারিদিক থেকে মুরীদরা একের পর এক স্লোগান দিচ্ছিল,

বাবা পটল পুরের অটল বীর

পীরের রাজা বড় পীর

পীর সাহেব হাত উঁচু করে তাদের থামিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

- আমি পীরের রাজা বড় পীর, আমি অটল বীর।

চারিদিক থেকে জনতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে

- বে-শাক বে-শাক

- আমি যা বলবো, তোমরা সেটা মানবে তো?

সমবেত জনতা একবাক্যে বলে উঠল,

- হ্যাঁ

পীর সাহেব তখন বললেন,

- আজ আমি তোমাদের জিহাদের বায়াত নেবো। আমরা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। দাজ্জালের বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করবো। সবাই কি রাজী?

রেজা লক্ষ্য করলো, এই কথা শোনার পর মানুষ কিছুক্ষণ নিরব হয়ে গেলো, কোথাও একচুল শব্দ নেই। তারপর হঠাৎ পিছনের দিক থেকে হৈ হট্টোগোল শোনা গেলো। খাদেমকে ডেকে তিনি বললেন, দেখো তো কি হয়েছে। একটু পর সে ফিরে এসে বলল,

- বাবা সবাই যে যে দিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের পায়ের নিচে পরে কয়েক ডজন লোক নিহত

হয়েছে। আরো কত ক্ষয় ক্ষতি হবে কে জানে।

কথাটা বলে সেও উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। পীর সাহেবের পিছনে একজন বাতাস করছিল। খাদেমের পালানো দেখে পাখাটা পীর সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেও দৌঁড় দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মাঠ ময়দান সব ফাঁকা হয়ে গেলো। পড়ে রইল কেবল, হাজার হাজার লোকের ফেলে যাওয়া মাল-সামানা। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে রেজার মনে পড়ে গেলো রসুলের একটি হাদীস।

- "এক সময় সকল কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একযোগে হামলা করবে তখন মুসলিমদের সংখ্যা হবে অনেক কিন্তু তাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ঢুকে পড়বে।"

এই ফাঁকা মাঠ দেখে পটলপুরের পীর সাহেবের বুকটাও ফাঁকা হয়ে যায়, হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন,

- আহা অটল বীর পীরানে পীর আজ রাস্তার ফকীর হয়ে গেলো রে।

রেজারও বুক ফেটে কান্না আসে। তবে তার দুঃখ পীর সাহেবের মতো ব্যক্তিগত দুঃখ নয়। তার দুঃখ হলো, পুরা উম্মতকে নিয়ে। তাদের দুর্গতি ও দুরাবস্থা নিয়ে। আসন্ন বিপদ থেকে তাদের কিভাবে রক্ষা করা যায়

সেটাই তার চিন্তা।

ঘুম ভাঙতেই রেজা বিছানায় উঠে বসে। তখনও সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। পাশেই তাকিয়ে দেখে শাহিন বেঘোর হয়ে ঘুমাচ্ছে। ময়দানের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে হাজার হাজার লোক কত নিশ্চিন্তে মৃত মানুষের মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। রেজা ভাবে, সত্যিই কি এরা মৃত কখনই কি এদের জাগানো যাবে না?

রাতের স্বপ্নটি দেখার পর পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে রেজার বিশেষ কোনো আগ্রহ থাকে না। সে বুঝতে পারে পীর সাহেব যে বায়াতের কথা বলছে সেটা নকল বায়াত। এটা আসল বায়াত নয়। তবে তার মনে হয়, এটা যে আসল বায়াত নয় সেটা পীর সাহেবকে জানানো দরকার। তার কথা হয়তো তিনি শুনবেন না কিন্তু দায়িত্ব তো আদায় হবে। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাই সে পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। শাহিনকে বিষয়টা জানাতেই সে ভীষণ খুশি হয়। দু পাটি দাঁত বিশ্রীভাবে প্রদর্শন করে বলে,

- আমি এটা আগে থেকেই জানতাম! তাই তো এতো মেহনত করে দরবার পর্যন্ত টেনে এনেছি। বাবার

দরবারে এসে বায়াত না হয়ে কেউ ফিরে যায় না।

কথাটা শুনে রেজার ঠোটের কোনে উপহাসের হাসি ফুটে ওঠে। সে ভাবে,

- পীরের উপর এদের কত আস্থা!! এমন সহজ সরল আর নির্বোধ মানুষকে ঠকিয়েই এ যুগের পীররা ব্যবসা করে।

রেজার ইচ্ছা পীর সাহেবের সাথে ঠান্ডা মেজাজে লম্বা সময় নিয়ে আলোচনা করা। সেটা কীভাবে সম্ভব করা যায় এটা প্রশ্ন করতেই শাহিন প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দিয়ে বলে,

- সেটা আমি দেখবো। পাঁচ, সাত বছর ধরে বাবার দরবারে যাওয়া-আসা করছি। এতটুকু যদি করতে না পারি তাহলে আমার নিজের কান নিজেই কেটে ফেলব।

ব্যবস্থাটা কিন্তু খুব সহজ হলো না। সেই ভোর বেলায় শাহিন বের হয়ে গেলো সকালের খাবার যে, কোথায় খেলো তা বলা মুশকিল। জোহরের নামাযের সময় যখন ফিরে আসলো তখন চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে এখনও কোনো সু-ব্যবস্থা হয় নি। নামাযের পর হাপুস-গুপুস করে এক থাল ভাত নিঃশেষ করে আবার বের হয়ে গেলো এবং ঘন্টাখানেক

পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল,

- ব্যবস্থা হয়েছে। এশার নামাযের পরপরই যেতে হবে। পীর সাহেব তখন বিশ্রামে থাকবেন। ঐ সময় তিনি কারও সাথে কথা বলেন না। তবে পীর সাহেবের খাস খাদেম ময়নাল হকের সাথে যোগাযোগ করে শেষ-মেষ পীর সাহেবকে রাজি করানো গেছে।

শাহিন বক বক করে বকতেই থাকে। এই সাক্ষাতের আয়োজন করতে তাকে কি কি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সেটাই সে শুনাতে থাকে রেজাকে। রেজা অবশ্য তার কথা শুনছে না। পীর সাহেবকে কি বলবে মনে মনে সেটাই ভাবছে সে। রেজা বুঝতে পারে কথার মধ্যে এমন কিছু বিষয় আসবে যাতে পীর সাহেব ভীষণ রেগে যাবেন। তিনি হৈ চৈ শুরু করলে মুরীদানরা উত্তেজিত হয়ে যাবে তখন জান নিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া রেজা যত কথা বলবে তার সম্পূর্ণটা শোনা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন কি না সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পীর সাহেবকে বশে এনে সম্পূর্ণ কথাটা কীভাবে শোনানো যায় রেজা সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। হঠাৎ তার মাথায় একটা প্লান আসে। শাহিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে,

- এই যে, খাস মুরীদ, আমাকে তিনটি নোট দাও তো।

শাহিন তখন একটা বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। তিনটি নোটের কথা শুনে ঠোটের কোনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,

- নোট?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি হাজার টাকার নোট, আর একটি পাঁচশ টাকার নোট, আর একটি পাঁচ টাকার নোট।

শাহিন মনে মনে হিসাব করে দেখে, সর্বোমোট এক হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা। সে বেশ খানিকটা বিব্রত হয়ে বলে,

- এতগুলো টাকা দিয়ে কি হবে?

- এটা হলো আক্কেল সেলামী তথা বোকামীর দন্ড।

- সেটা আবার কী?

- এই যে, আমাকে জোর করে পীরের দরবারে ধরে এনে, আমার সময়গুলো নষ্ট করা হচ্ছে এটা হলো তার দন্ড।

শাহিনের মনটা বেজায় খারাপ হয়ে যায়। এমনিতেই পীরের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তার বেশ মোটা অংকের খরচ হয়েছে সামনে আরও কিছু খরচ হবে। পীরের দরবারে খরচের শেষ নেই। এখন বাড়তি দেড় হাজার টাকা খরচ করা ভীষণ কষ্টকর। সে মুখটা ভার করে বলে,

- আর একটু কম নিলে হয় না?

- উহু, এর চেয়ে কম মূল্যে তিন তিনটি দিন নষ্ট করা যায় না। তবে যেহেতু তুমি আমার বন্ধু মানুষ অতএব, বিশেষ ছাড় হিসেবে পাঁচ টাকা না হয় মাফ করে দিলাম। সই সই দেড় হাজার টাকা হলেই হবে।

এই বিশেষ ছাড়ে শাহিন অশেষ খুশি হলো তা নয় তবে পকেট থেকে একটি এক হাজার আর একটি পাঁচ শ টাকার নোট বের করে দিয়ে মুখ ভার করে বসে থাকলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রেজা আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। খানিক্ষণ হেসে নিয়ে বলে,

- খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই, এক হাজার টাকার নোটটি পুরো অক্ষত অবস্থায় ফেরত আসবে, পাঁচ শ টাকার নোটটি ফেরত আসবে অর্ধেকের বেশি। বাকী টাকাটা আমি তোমার পীরের পিছনে খরচ করবো। বাড়ি ফেরা মাত্র উহাও ফেরত দেওয়া হবে। অতএব, মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই।

এই কথাটি শুনে শাহিন সত্যিই খুব খুশি হয়। দেড় হাজার টাকা পানিতে পড়ে গেছে ভেবে শাহিনের মনটা বেজায় ভার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে এক হাজার টাকা এবং বাকী পাঁচশ টাকার অর্ধেক তথা সর্বমোট বারোশ পঞ্চাশ টাকা পানি থেকে শুকনো

ডাঙায় ফিরে আসতে দেখে শাহিনের মনটা আগের চেয়ে ভাল হয়ে যায়। সে ফুরফুরে মেজাজে বলে,

- তবে আর তোর বিশেষ ছাড়ের দরকার নেই। এই নে আরও পাঁচ টাকা। বাড়ি গিয়ে কিছু ফেরত দেওয়ারও দরকার নেই। যেহেতু তুই আমার বাল্য বন্ধু, তাছাড়া একজন হাফেজে কুরআন, আমাদের ইমাম সাহেব, তাই ঐ পাঁচশ টাকার অর্ধেক আর এই পাঁচ টাকার পুরোটা আমি তোকে হাদিয়া দিলাম।

শাহিনকে ইচ্ছাকৃত দুই শত পঞ্চান্ন টাকার দাবী পরিত্যাগ করতে দেখে রেজা বেশ হকচকিয়ে যায়। হঠাৎ শাহিনের হাতে শক্ত করে চিমটি কাটে। শাহিন চেচিয়ে ওঠে,

- উহ্। এটা কি হলো?

- পুরো আড়াইশ টাকা হাদিয়া দিয়ে দিলি তো, তাই দেখলাম জেগে আছিস না ঘুমিয়ে পড়েছিস।

শাহিন কিছু বলল না কেবল অস্ফুট স্বরে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল,

- আড়াইশ নয়, দুই শ পঞ্চান্ন টাকা।

শাহিনের কথায় রেজা কান পাতল না। শুধু 'আসছি' বলে তাড়াহুড়া করে কোথায় যেনো রওয়ানা হয়ে গেল। অগণিত মানুষের ভিড় ঠেলে রেজা সাই সাই করে

সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। সময় ভীষণ অল্প। সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। পীর সাহেবকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য একটা নোটবুক কিনতে হবে, তাতে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু নোট লিখতে হবে। আবার আলোচনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ময়দান থেকে বের হওয়ার পর রাস্তা ধরে বেশ কিছুক্ষণ হেটেও ভালো কোনো লাইব্রেরী পাওয়া গেলো না। ফুটপাতে ছোট ছোট বই পুস্তক অবশ্য বিক্রি হচ্ছে। বারো আওলিয়া, তেত্রিশ আমল, মারেফতের কেরামত ইত্যাদি নামের বইগুলি সব থেকে বেশি নজরে পড়ছে। তবে নোটবুক জাতীয় কোনো কিছু ঐ সব দোকানে নেই। রেজা যে ধরণের নোকবুক চায় তা তো থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। রাস্তায় কয়েকজনকে প্রশ্ন করে অনেক চেষ্টার পর বেশ বড় একটা বই খাতার দোকান সে খুঁজে পেল। দোকানটি বড়, মাল সামানাও অনেক তবে ক্রেতা খুব বেশি নয়। দু'একজন লোক ছোট ছোট বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে, বিশেষ আগ্রহ হলে হয়তো দাম জিজ্ঞেস করছে। পাঁচ ছয় জন কর্মচারীর মধ্যে যে কোনো একজন তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। বাকীরা চেয়ারে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। রেজা দোকানের সামনে দাড়াতেই তাদেরই একজন অতিশয় ভদ্রতার সাথে বলে,

- কি লাগবে হুজুর?

নিজের প্রয়োজনের কথাটা কীভাবে বলবে, রেজা বুঝতে পারে না। কেবল পকেট থেকে হাজার টাকার নোটটা আস্তে করে বের করে সেটা দোকানদারের চোখের সামনে ধরে আমতা আমতা করতে থাকে। দোকানদার কান খাড়া করে তার কথা শোনার চেষ্টা করে কিন্তু কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারে না। তবে ভাব দেখে সে কিছু একটা অনুমান করে এবং একটু বিরক্ত হয়ে বলে,

- টাকা ভাঙতি করবেন?

রেজা বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলে,

- না, না। আমি একটা নোট বুক নেবো।

ক্রয়-বিক্রয়ের কথা শুনে লোকটি আবার আগের মতো অমায়িক ব্যবহার শুরু করে। পাশেই একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে,

- এখানে বসুন, এই পিচ্চি, এখানে কয়েকটা নোটবুক দেখা।

কয়েকটা নয়। দশ বারো বছরের ছেলেটা এক বোঝা নোট বুক এনে রেজার সামনে রাখে। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিয়েই রেজা বুঝতে পারে এর মধ্যে একটিও তার মন মতো নয়। এবার সে দোকানদারকে ব্যাপারটি

খুলেই বলে,

- নোটবুকটা এই টাকাটার মাপে হলে ভাল হয়।

রেজা ভেবেছিল কথাটা শুনে দোকানদার ভীষণ অবাক হবে। কিন্তু লোকটা একটুও অবাক হলো না। উল্টো সে যা করল, তাতে রেজাকেই অবাক হতে হলো। রেজার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে একটা স্কেল দিয়ে আড়ে দিগে মেপে চেচিয়ে বলল,

- সাড়ে ছয় বাই সাড়ে তিন পকেট নোট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটা কাছাকাছি মাপের একটা নোট বুক নিয়ে হাজির হলো। রেজা হাজার টাকার নোটটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে দেখলো তারপর মুখ তুলে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল,

- টাকাটা একেবারে গিলে ফেলেছে। ভিতরে যে টাকা আছে বোঝাই যাচ্ছে না। একেবারে টাকার মাপে হলে ভাল হয়।

কথাটি বলে, রেজা আড় চোখে দেখার চেষ্টা করল, লোকটি বিরক্ত হচ্ছে কিনা। লোকটি মুচকী হেসে তাকে নিশ্চিন্ত করল। কিন্তু পাশ থেকে পিচ্চি ছেলেটা অনেকটা রাগত স্বারে বলল,

- নোট বুকে টাকা রাখার কি দরকার? নোট বুক কি মানিব্যাগ!

ছেলেটার কথা শুনে রেজা হেসে উঠলো, তাকে হাসতে দেখে লোকটিও সামান্য হেসে উঠলো।

সবাইকে হাসতে দেখে ছেলেটা উৎসাহ পেল বলে মনে হয়। বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল,

- ঐ মাপে হবে না। অতই যদি দরকার হয়, বড় নোটবুক কেটে নিতে হবে।

কেটে নেওয়ার প্লানটা রেজার বেশ পছন্দ হয়। টাকাটা নোটবুকের উপরে রেখে বিনীতভাবে বলে,

- সামান্য একটু কাটলেই হয়ে যাবে। তবে সাইজে আরেকটু মোটা দরকার, অনেক কিছু নোট করতে হবে তো।

কথাটা বলে, রেজা নিজের দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে কতটুকু মোটা হলে ভাল হয় তা দোকানদারকে বোঝানোর চেষ্টা করে। দোকানদার হাতের স্কেলটি দিয়ে রেজার দুটি আঙ্গুলের দুরুত্ব মেপে বিড়বিড় করে বলে,

- হাফ ইঞ্চির কাছাকাছি। একশ পাতা হলেই হবে।

এরপর টাকাটা ছেলেটার হাতে দিয়ে বলে,

- একশ পাতার একটা ডায়েরী, পেজ কার্টার দিয়ে এই টাকাটার মাপে কেটে সাইজ করে দে। দেখিস টাকাটা আবার কেটে ফেলিস না।

আর কিছু বলতে হলো না, ছেলেটা টাকাটা নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর যে নোটবুকটি হাতে করে নিয়ে আসলো সেটা দেখে রেজা নিশ্চিন্ত হলো। হুবহু এমন একটা নোটবুকই তার দরকার ছিল। এই নোটবুক এবং একটা বলপয়েন্ট কলম আর একটা খাম নিয়ে দামদর করে মোট দুইশ পয়ত্রিশ টাকা পরিশোধ করার পরও রেজা দোকানের চেয়ারটির উপর বেশ কিছুক্ষণ ঠাঁই বসে থাকলো। ছোট একটা পকেট কুরআন বের করে কলম দিয়ে ঘস ঘস করে নোট বুকটিতে অনেক কিছু নোট করছিল। বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নং লিখছিল তারপর উক্ত আয়াতের আলোকে পীর সাহেবকে সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দিয়ে প্রতিটি নোট শেষ করছিল। সে খুব তাড়াহুড়া করছিল, যেনো যাতা লিখে অল্প সময়ের মধ্যে ডাইরী ভর্তি করাই তার কাজ। দোকানের কর্মচারীরা থেকে থেকে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আবার নিজেদের কাজে মন দিচ্ছিল। দোকানে এসময় তেমন একটা ভিড় নেই, অতএব রেজার কারণে তারা কোনো সমস্যা অনুভব করছিল না। রেজাকে দেখে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোট করছে, অতএব তাকে কেউ বিরক্ত করে না। কেবল পাজি ছেলেটা মাঝে মাঝে

উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল কি লেখা হচ্ছে। লেখার মধ্যে কয়েকবার পীর সাহেব কথাটি দেখে তার একটি কবিতা মনে পড়ে যায়। নিজের অজান্তেই বলে ওঠে,

পটলপুরের অটল বীর
দাবী করে মহাপীর
কিন্তু বেটা ঠগবাজ
করে নাকো কাম-কাজ
বেবাক লোকের টাকা মেরে
পেট পোকেট বোঝায় করে
বিশাল বড় পেট তার
মিথ্যা কথার ভান্ডার।

কবিতাটি শুনেই রেজা হাসি চেপে রাখতে পারে না। বেশ একটু জোরেই হেসে ওঠে। তাকে হাসতে দেখে ছেলেটা ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায়। সেই সাথে একটু ভয়ও পায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে দোকানের ভিতরে কেউ তার কথা শুনেছে কিনা। বাৎসরিক মাহফিলের সময় এই কবিতাটি পড়া একেবারে নিষেধ। অন্য সময় হালকা অনুমতি আছে। তবে সে নিশ্চিত হলো, যখন বুঝলো তার কবিতাটি কেউ শোনেনি। তবে তারা

রেজার হাসি শুনেছে তাই সবাই এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা কেউই কোনো কথা বলল না, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার নিজেদের জগতে ফিরে গেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে রেজার নোট লেখা শেষ হলো। দোকানদার লোকটিকে সালাম দিয়ে আর পিচ্চি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে সে মাহফিলের দিকে রওয়ানা হলো। আসরের নামাযের বেশ কিছুক্ষণ পর রেজা মাহফিলে পৌঁছাল। তাকে দেখেই শাহিন একগাল হেসে বলল,

- এতক্ষণ ছিলি কোথায়? চিন্তায় আমার তো জান শেষ।

রেজা তার কথায় কোনো উত্তর দিল না। কেবল হাতের নোটবুকটি তার হাতে ধরিয়ে দিল। তার উপরে ইংরেজীতে লেখা ছিল, (NoteBook)। সেই বারো পনেরো বছর আগে প্রাইমারী স্কুলে শেখা বিদ্যা-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে শাহিন লেখাটি পড়ে ফেললো। তারপর সে ভিতরে খুলে দেখলো, প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা “ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোট ”। তারপর স্টার চিহ্ন দিয়ে আলাদা আলাদা করে অনেক গুলো নোট লেখা। শাহিনের মনে পড়ে গেল, ফোর-ফাইভে যখন পড়তো

তখন আক্কাস সার তাদের বিভিন্ন বিষয় নোট করতে বলতেন। পারসন, জেন্ডার, কাল, মহাকাল এই সব। শাহিন একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলে,

- এত নোট তুই নিজে হাতে লিখলি!

- হু। ভাল করে গুনে দেখতো কয়টা হলো আমি ওজু করে আসি। নামায পড়বো।

শাহিন তখনই শুরু করে দেয়,

- এক .... দুই .... তিন ....

রেজা ওযু করে ফিরে আসতেই শাহিন তাকে বলে,

- নিরানব্বইটা হয়েছে।

মনে হয় সংখ্যাটা শুনে রেজা একটু অসন্তুষ্ট হলো। কলমটা বের করে ঘস ঘস করে আরেকটা নোট লিখে বলল,

- এবার দেখ তো কয় টা হলো।

শাহিন সহজভাবে বলে,

- কয়টা আবার হবে, নিরানব্বয়ের সাথে এক যোগ করলে একশ হবে এতো বোঝাই যাচ্ছে।

- তবু তুই আর একবার গুণে দেখ। আমি ততক্ষণে নামায পড়ে নিই।

শাহিন আগের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নোটগুলো আর একবার গুণলো। ততক্ষণে রেজার নামায শেষ হয়ে গেছে। সংখ্যা ঠিক আছে শুনে সে বেশ গম্ভীর হয়ে বলল,

- ভাল করে গুনেছিস? কোনো ভুল হয় নি তো?

কথাটি বলে রেজা বিছানায় শুয়ে পড়ে। রাতে পীরের সাথে কি আলোচনা করবে সেটা নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করে।

সংখ্যা রহস্যটি শাহিন বুঝতে পারে না। তার কাছে মনে হয় একটা নোট কম বেশি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রেজা যখন চোখ বুঝে বিশ্রাম নিচ্ছিল শাহিন তখন নোটগুলো আরও কয়েকবার গুণে দেখলো। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলো,

- যাক বাবা। ঠিকই আছে।

রেজা যখন বুঝলো, গণনার কাজ শেষ হয়েছে। শাহিনকে বলল,

- নোটবুকটা এই খামে ভরে তোর কাছেই রাখ। রাতে আলোচনার সময় সাথে রাখবি। যখনই আমি বলবো, হাদিয়াটা বের কর। অমনি বের করে আমার হাতে দিবি। ঠিক আছে?

শাহিন ভীষণ গুরুত্বসহকারে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি

জানায়।

রাতে সত্যি সত্যিই পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো। প্রশস্ত একটা ঘরে প্রায় ডজনখানেক ভক্ত মুরীদের সাথে একত্রে বিশ্রাম করছিলেন। একত্রে বিশ্রাম করছিলেন বললে ভুল হবে। আসলে তিনি বিশ্রাম করছিলেন আর মুরীদরা ব্যস্ত ছিল। বালিশে হেলান দিয়ে দুটি পা সামনে বিছিয়ে পীর সাহেব বসে ছিলেন। দু'জন লোক তার পা দুটি মর্দন করছিল। পিছনে একজন অতিশয় বড় একটা পাখা নেড়ে বাতাস করছিল। অন্যরা কেউ পানের কৌটা, কেউ পানির পাত্র ইত্যাদি হাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। পীর সাহেবের যখন যা দরকার তার যেনো কোনো ত্রুটি না হয় তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ঘরে ঢুকেই রেজা সালাম দিল। সে লক্ষ্য করল, পীর সাহেবের দুটি ঠোট মৃদুভাবে নড়ে উঠলো। অর্থাৎ তিনি সালামের উত্তর দিয়েছেন। এদিক সেদিক তাকিয়ে রেজা বসার জন্য উপযুক্ত স্থান তালাশ করছিল কিন্তু পাওয়া গেল না। পীর সাহেব ব্যাপার বুঝতে পারলেন বলে মনে হয়। হাত দিয়ে ইশারা করে তার সামনের দিকের লোকগুলোকে সরে যেতে বললেন, তারপর রেজার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় সেখানে বসতে বললেন। ফাঁকা জায়গাটায় বসতে বসতে রেজা বলে,

- আমার নাম ....

এতদূর বলতেই পীর সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন,

- হাফেজ রেজাউল করীম, এই তো?

কথাটি বলে পীর সাহেব একবার রেজার মুখের দিকে আর একবার স্বীয় ভক্ত মুরীদদের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকেন। মুরীদরাও এমন ভাব করে যেন বেশ কেরামতী হয়েছে। রেজা কিন্তু আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারে। তার মনে পড়ে প্রথম দিনের ঘটনা। সেই স্বপ্ন দেখা আর পরে লাঠিয়াল লোকটির কান্ড। সে যে কান্ড করেছিল তাতে বিষয়টি পীর সাহেবের কানে পৌঁছানো বিচিত্র নয়। তারপর স্পাই লাগিয়ে সামান্য খোঁজ খবর করলেই নিমিশে রেজার নাম পরিচয় জোগাড় করা সম্ভব। অতএব, বিষয়টিকে একটুও গুরুত্ব দেয় না রেজা।

রেজা মোটেও অবাক হয় নি দেখে পীর সাহেব আরও একটা কেরামতী প্রদর্শন করার চেষ্টা করেন। মাথা ঝাঁকিয়ে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য প্রকাশ করে বলেন,

- বাবা, তুমি আমার হাতে বয়াত হতে আইছো, তাই না?

এই কথায় রেজার সন্দেহটি সঠিক প্রমাণিত হয়। সে

বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলে,

- না, না। আমি বায়াত হতে আসি নি। আমি বয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছি।

পীর সাহেব যেনো ফাঁদে পড়ে গেলেন। লজ্জা আর অপমানে তার মুখটা লাল হয়ে গেল। ভক্ত মুরীদরাও বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে গেল। বিষয়টা হজম করার জন্য একটু হেসে নিয়ে বললেন,

- ঐ একই কথা, আলোচনার পরেই তো মানুষ বয়াত হয়, ঠিক কি না?

এই কথায় উপস্থিত সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেলো। রেজা কিছুই বলল না। পীর সাহেব বেশ আগ্রহ নিয়ে বলেন,

- বয়াত সম্পর্কে কি আলোচনা? বইলা ফেলো তো।

রেজা কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলতে শুরু করে,

- ইসলামের দৃষ্টিতে বায়াত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বায়াতে আকাবা, বায়াতে রিদওয়ান ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বায়াতের গুরুত্ব এতটাই অধিক যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ হলো বায়াত হওয়া ফরজ। কিন্তু এই বায়াত কোন বায়াত?

কোন বায়াত কথাটা পীর সাহেব ঠিক বুঝে উঠতে

পারেন না। রেজা একটু সহজ করে বলে,

- যে কোনো কাজের জন্য কি বায়াত নেওয়া জরুরী? এই যেমন ধরুন মসজিদে একটা ইমাম নিয়োগ করা হবে তার পিছনে সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, জুময়া আদায় করবে। এখানে কি বায়াত লাগবে। ধরুন ইমাম নিয়োগের দিন গ্রামের সব মুছল্লীরা একত্রিত হয়ে ইমাম সাহেবের পাগড়ি ধরে বায়াত হবে। এরপর ধরুন, একজন লোক অন্য আরেকজনকে আলীফ- বা- তা- ছা শেখায়, এটা শেখার জন্য কি বায়াত হতে হবে?

পীর সাহেব বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলেন,

- আরে না। এসব কাজে বয়াতের জরুরত নাই। খোদা না-খাস্তা, এমন ধারা বায়াত শুরু হলে তো পীর-মুরীদী লাঠে উঠবে।

রেজা এবার আসল কথাটি বলে ফেলে,

- তাহলে হুজুর আপনি বায়াত নেন কেনো? আপনার কি কাজ?

পীর সাহেব বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এদিক সেদিক তাকিয়ে নিয়ে আমতা আমতা করে বলেন,

- দেখো বাবা, শরীলের যেমন রোগ-বালাই হয় অন্তরেও হয়। শরীলের রোগ সারাতে যেমন ডাক্তার

দেখান লাগে। অন্তরের রোগ সারাতে পীর ধরন লাগে। পীর সাহেব অন্তর পরিষ্কার কইরা দেন। এইডা হইলো তাযকিয়ায়ে নাফস। এর জন্যই পীরের কাছে বয়াত হতে হয়।

রেজা একটু হেসে নিয়ে বলে,

- রোগ হলে চিকিৎসা করতে হবে এটা একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু চিকিৎসা করতে বায়াত লাগবে কেনো? রোগী কি ডাক্তারের কাছে বায়াত হয়? ধরুন, আপনার কলেরা হলো। এখন একজন ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করবেন। আপনি কি ঐ ডাক্তারের হাতে বায়াত হবেন?

পীর সাহেব কি বলবেন খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। রেজা আবার বলে,

- আচ্ছা অন্তরের রোগের চিকিৎসা তো আল্লাহর যিকির তাই না?

পীর সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। রেজা বলতে থাকে,

- ঘরে বসে জিকির করলেই তো হলো, এখানে পীরেরই বা কি দরকার, বায়াতই বা কেনো লাগবে?

এবার পীর সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেন,

- ঘরে বসে জিকির করলেই কি হবে? পীর সাহেবের

হাতে বায়াত না হলে ফায়েজ পাওয়া যাবে না, জিকিরে বরকত হবে না। অন্তর পরিষ্কার হওয়ার বদলে ময়লা জমে যাবে।

- দেখুন, বাদশা নাজ্জাশী রাসুলের হাতে সরাসরি বায়াত হতে পারেন নি, ওয়াজ করুনীও পারেন নি। দূর থেকেই আল্লাহর কালামের উপর আমল করে তারা কামিয়াব হয়ে গেছেন। আর আপনি বলছেন পীরের হাতে বায়াত না হলে, যিকির কালামে কোনো কাজ হবে না! এটা কেমন কথা!

এই কথার পীর সাহেব কোনো উত্তর দেন না। উত্তর তার কাছে আছে বলে মনেও হচ্ছে না। কেবল রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন। পীর সাহেবের মুরীদরাও ভীষণ বিব্রত ও বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এখনই তাদের ঠান্ডা করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কালবিলম্ব না করে রেজা বলে,

- এই যা! ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার জন্য সামান্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি।

কথাটি বলে নিজের হাতটি শাহিনের দিকে বাড়িয়ে দেয় রেজা। শাহিন খামে ভরা নোটবুকটি তার হাতে তুলে দেয়। সেটি নিতে নিতে রেজা বলে,

- কয়টা নোট আছে?

- পুরো একশটা।

তড়িঘড়ি করে উত্তর দেয় শাহিন।

- ভাল করে গুনেছিস তো?

- হ্যাঁ হ্যাঁ, তিন-চার বার গুনেছি। ঠিকই আছে। পুরো একশটি নোট।

খামের দিকে তাকিয়ে পীর সাহেবের চোখ চড়কগাছে উঠে পড়ে। পুরো একশটি নোট! সাইজ দেখে কত টাকার নোট অনুমান করার চেষ্টা করেন। সাইজ দেখে নোট চিনতে তিনি পাঁকা ওস্তাদ। এই অভিজ্ঞতা তার খুব কাজে লাগে। মোসাফার সময় মুরীদরা যখন হাতের মধ্যে টাকা গুজে দেয় তখন টাকার দিকে না তাকিয়েই তিনি বুঝতে পারেন কে কত টাকার নোট দিচ্ছে। সেই অনুযায়ী তিনি মানুষের সাথে মোসাফা করেন। একশ টাকা হলে, ত্রিশ সেকেন্ড, পাঁচশ টাকা হলে পুরো এক মিনিট আর এক হাজার টাকা হলে মিনিট দুয়েক মুরীদের হাতটি ধরে বিভিন্ন রকম দোয়া করেন। অতএব, খামের ভিতরে যে, হাজার টাকার নোট রয়েছে তা বুঝতে তার মোটেও সময় লাগলো না। এক হাজারকে এক শ দিয়ে গুন করে যখন বুঝতে পারলেন খামটির মধ্যে পুরো এক লক্ষ টাকা। আহলাদে পীর সাহেবের বুকটা ফেঁটে যাওয়ার উপক্রম

হলো। পীরদের কি আর সেই কদর আছে! আজ-কাল তো, মানুষ দু'দশ হাজারের বেশি হাদিয়া দেয় না। সব রাগ ভুলে, লোভাতুর দৃষ্টিতে খামটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পটলপুরের পীর সাহেব। যত দ্রুত সম্ভব খামটি হস্তগত করা উচিৎ এমন ভেবে পাশেই বসে থাকা একজন মুরীদের দিকে হাতের ইশারা করে হাদীয়াটি গ্রহণ করতে বলেন। রেজা তাকে সুযোগ দেয় না। ডান হাত দিয়ে খামটি চেপে ধরে রেখে বলে,

- উহু, দেওয়ার আগে আমি নিজেই একবার গুণে দেখবো। কম বেশি আছে কিনা।

পীর সাহেবের যেনো তর সইছে না। ঠান্ডা মেজাজে বলেন,

- দু একটা বেশ কম হলে সমস্যা কি?

- সমস্যা আছে হুজুর। পুরো একশটি নোট দেওয়ার নিয়ত ছিল তো। কম বেশি হলে নিয়তটা না আবার বানচাল হয়ে যায়।

পীর সাহেব ব্যাপারটি বুঝলেন বলেই মনে হলো। নিয়ত মানতের ব্যাপারে তারা ভালই বোঝেন। ভীষণ খুশি হয়ে মুরীদদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন,

- ছেলেটা কত জ্ঞানী দেখেছো! মানতে কম-বেশি করা মারাত্মক অন্যায়। ইহাতে ফায়েজ বরকত কিছুই হাসিল

হয় না। একটা কাহিনী বলি শোনো,

“ওলী সম্রাট বাবা মুকন্দপুরীর এক অতিশয় ধনী মুরীদ ছিল। সেই বেটা একবার নিয়ত করে পীরের জন্মদিনে একশটি ছাগল যবাই করবো। কিন্তু যবাই করার পর দেখা গেলো ছাগলের সংখ্যা একটা বেশি হয়ে গেছে। বিষয়টা পীর সাহেবকে বলা হলে তিনি বললেন, নিয়ত পুরা হয় নাই বাবা। ফিরতি একশ যবাই দাও। এই ফতোয়া শুনে লোকটি পীর সাহেবের উপর নাখোশ হলো। মনে মনে ভাবল, বেশিই তো হয়েছে কম তো আর হয় নি। ঐ দিন রাতে খাজা খিজির ফকীরের বেশে ঐ মুরীদের বাড়ি হাজির হলো। কাতর স্বরে বলল,

- আমি সারাটা দিন না খাইয়া রইছি বাবা আমাকে দুইটা রুটি দাও।

ঐ লোক ভাবল দুটো রুটি খেয়ে কি কারও পেট ভরে, তাই সে ঐ ফকীরকে তিনটি রুটি দিল। তিনটি রুটি দেখে ফকীর ভিষণ রেগে গেলো। ধনী লোকটি বলল,

- অকারণ রাগ হচ্ছেন কেন বাবা। রুটি তো আমি বেশিই দিয়েছি কম তো আর দিই নি।

একথা শুনে ফকীর তিনটি রুটিই খেয়ে নিল। খাওয়ার পর বলল,

- হে মাওলা এই ব্যক্তিকে তুমি তিন হাত ওয়ালা সন্তান দিয়ো।

তিন হাত ওয়ালা সন্তানের কথা শুনে ধনী লোকটি আঁতকে উঠে বলল,

- এটা আপনার কেমন দোয়া হলো বাবা!

ফকীরের বেশে খিজির তখন বলল,

- কেন বাবা আমি তো একটি হাত বেশি দিতে বলেছি কম তো আর দিতে বলেনি!

তখন ঐ ধনী লোক তার ভুল বুঝতে পারলো এবং আরও একশটি ছাগল জবাই দিল।

কাহিনী শুনে মুরীদরা সবাই বলে উঠলো, "হক মওলা"। রেজা কিছুই বলল না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে কাহিনীটা জাল। সে ভাবে, এত সুন্দর রসিয়ে যারা জাল কাহিনী শুনাতে পারে তাদের মুরীদের অভাব হওয়ার কথা নয়। ইতোমধ্যে পীর সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো,

- তোমার জ্ঞান দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি বাবা। ঠিক আছে তুমি নিজেই না হয় গুনে নাও।

পীর সাহেবের তাড়াহুড়া দেখে রেজার বেশ জোরে হাসতে ইচ্ছা করে কিন্তু জোর করে হাসি গোপন করে সে বলে,

- শুনতে তো বেশ সময় লাগবে। তার আগে আলোচনাটা শেষ করে নিই।

কথাটা শুনে পীর সাহেব কিছুটা নাখোশ হোন তবে মুখে সেটা প্রকাশ না করে বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। আলোচনা শেষ করো। বয়াত নিয়ে তুমি কি যেনো বলছিলে?

রেজা এবার নিশ্চিন্তে শুরু করে,

- বলছিলাম, আল্লাহর কালামের বরকত পেতে পীরের হাতে বায়াত হওয়া শর্ত নয়।

পীর সাহেব এবার মমতামাখা কণ্ঠে রেজাকে বোঝানোর চেষ্টা করে,

- দেখো বাবা, আল্লাহর কালামের বরকত তুমি পাবা। এর জন্য কোনো পীর লাগবে না। কিন্তু এই তরীকার যত বুযর্গ আছে তাদের শাফায়ত তো পাবা না। আমার বাপজান প্রায়ই বলতেন,

"বাবারা কিয়ামতের দিন সকল মানুষ যখন হাবুডুবু খাইবে। ঐ দিন আমগো তরীকার বুযুর্গরা একটা নৌকায় সওয়ার হইয়া জান্নাত যাইবে। যারা এই তরীকার মুরীদ তারা ঐ নৌকায় জায়গা পাইবে। "

রেজা মৃদু হেসে বলে,

- আপনাদের তরীকার বুযুর্গরা দেখছি আমাদের দেশের মন্ত্রী এম,পি দের মতো দলকানা।

পীর সাহেব অবাক হয়ে বলেন,

- দলকানা মানে?

- দলকানা মানে স্বজনপ্রীতি। আমাদের দেশের নেতারা যেমন ভোট না দিলে রিলিফ দেয় না। আপনাদের বুযুর্গরাও বায়াত না হলে নৌকায় জায়গা দেবে না। ধরুন একজন লোক পীরের হাতে বায়াত হলো কিন্তু আমল কম করল, আর একজন লোক বায়াত হলো না কিন্তু আমল বেশি করল, এই তরীকার বুযুর্গরা বায়াত হওয়া লোকটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলো আর অন্যজনকে ফেলে গেলো। কোনো সত্যিকার বুযুর্গ কি এমন স্বজনপ্রীতি করতে পারে!

পীর সাহেব ভীষণ বিব্রত বোধ করেন। বলার মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তিনি নিরব থাকেন। রেজা বলতে থাকে,

- তাছাড়া দেখুন, রসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কী জীবনে যে কয় বছর ছিলেন, মানুষের তাযকিয়া তথা অন্তর পরিশুদ্ধির কাজ করেছেন কিন্তু তখন বিশেষভাবে বায়াত গ্রহণ করেন নি। যখন বোঝা গেলো, আল্লাহর রসুল মদীনাতে হিজরত করলে কাফিররা একযোগে আক্রমন

করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। তখন আনসার সাহাবীরা বায়াতে আকাবাতে বিশ্বের সকল শক্তির বিপরীতে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করে। বায়াতে রিদওয়ানের ব্যাপারটিও তাই। ইসলামে যে বায়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা এধরণের গুরুতর অবস্থায় প্রযোজ্য। নামায পড়া, দ্বীনী এলেম হাসিল করা, নিজের আখলাক চরিত্র সংশোধন করা ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে বায়াতের প্রয়োজন নেই। বায়াতের প্রয়োজন হয় যখন মুসলিমরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সংঘবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। বায়াত গ্রহণ করবেন এমন একজন নেতা যিনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে অপরাধীদের দমন করবেন এবং বাইরের শত্রুদের শায়েস্তা করবেন। বায়াত একটা রাজনৈতিক বিষয়।

পীর সাহেব আমতা আমতা করে বলেন,

- তবে কি তুমি বলতে চাচ্ছো, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলোভী, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী এই সব ওলী বুযুর্গরা পীর মুরীদীর বয়াত গ্রহণ করে অন্যায় করেছেন?

- না, অন্যায় নয়। পীররা যদি জাল-হাদীস আর ভেজাল কাহিনী পরিত্যাগ করে সঠিক ইসলামের দীক্ষা দেয় তবে তাদের হাতে বায়াত হওয়া অন্যায় নয়। তবে

এই বায়াতকে আসল বায়াত মনে করা অন্যায়। এ বায়াতের ব্যাপারে “বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু” এ হাদীস প্রয়োগ করা আরও বেশি অন্যায়। তার চেয়েও বেশি অন্যায় আসল বায়াতকে ভুলে যাওয়া। সকল মুসলিমকে একজন ইমামের হাতে বায়াত হওয়া এবং তার নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যে ফরজ এটা ভুলে যাওয়া চরম অন্যায়। পীর মুরীদীর নকল বায়াতের কারণে মানুষ এই বায়াতকে ভুলে গেছে।

কথাটি শেষ করেই রেজা খামটি ছিড়ে ভিতর থেকে নোট বুকটি বের করে। সেটা পীর সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলে,

- এখানে একশটি গুরুত্বপূর্ণ নোট লেখা আছে। আশা করি একটু সময় নিয়ে দেখবেন।

পীর সাহেব নোটবুকটি হাতে নিয়ে এ পাতা সে পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে থাকেন। তিনি নোটগুলো পড়ছেন নাকি নোট বুকের মধ্যে হাজার টাকার নোট তালাশ করছেন তা বোঝা মুশকিল। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই রেজা শাহিনের হাত ধরে টানতে টানতে বের হয়ে আসে।

তাবুতে ফিরে রেজা শাহিনকে বাকী টাকা ফেরত দিয়ে

দেয়। তার মধ্যে হাজার টাকার নোটটিও ছিল। সেদিকে তাকিয়ে শাহিন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এতো হাসির কারণ কি রেজা বুঝতে পারে না। টাকা ফেরত পেয়ে শাহিন যে খুশি হবে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে হেসে কানের পর্দা ফাটিয়ে ফেলবে এমন তো হওয়ার কথা নয়। হাসির গতি কিছুটা কমিয়ে শাহিন বলল,

- সত্যিই তোর জোড়া নেই রে। এমনভাবে বেটাকে টাইট দিলি। বেটারা বলে কিনা মুরীদ দেশ বিদেশ যেখানেই থাক পীর সাহেব তার খোঁজ খবর রাখেন, দেখ-ভাল করেন। তাই তো এতদিন পীরের পিছনে এত টাকা খরচ করেছি। এখন দেখি ভন্ডটা খামের ভিতরে কি আছে সে খোঁজও রাখে না।

বলে আবারও সজোরে হেসে ওঠে শাহিন। তারপর টাকাগুলো রেজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,

- এগুলো আমি তোকে হাদীয়া দিলাম।

রেজা শাহিনের হাতটি ঠেলে ফিরিয়ে দেয়। হাদীয়া সে চায় না। শাহিনের মতো অল্প শিক্ষিত লোক যে এই ধূর্ত পীরের ভন্ডামী ধরতে পেরেছে, রেজার কথা বুঝতে পেরেছে সেটাই একটা বড় হাদীয়া।

মাহফিলের শেষের দিনে একটা মজার কান্ড ঘটল।

পীর সাহেব বায়াতের উপর কিছু আলোচনা করার পর মঞ্চ থেকে কয়েকটা পাগড়ি ফেলে দিলেন। মুরীদরা হুমড়ি খেয়ে ঐ সব পাগড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলো। আর মুরীদরা সবাই একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে বসে পড়ল। রেজা শাহিনকে বলল,

- কি হচ্ছে রে?

শাহিন ফিস ফিস করে বলে,

- বায়াত হবে, বায়াত।

আর সত্যিই পীর সাহেব মন্ত্রের মতো বায়াত পড়াতে শুরু করলেন। পীর সাহেব কি বলছে রেজা তা শুনার চেষ্টা করলো না। তার ভিতর থেকে রাগ উথলে উঠতে লাগলো। ইতোমধ্যে রেজা লক্ষ্য করলো তার পিঠে কে যেনো হাত রেখেছে। পিছন ঘুরে সে বলল,

- ভাই এখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে।

বলে নিজের ডান হাতটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করলো। শাহিনও নিজের হাতটি দেখিয়ে বলল, আমার সংযোগও বিচ্ছিন্ন। আপনি বরং পা দিয়ে ঐ সামনের লোকের পাজামা টেনে ধরুন তাতেই বায়াত হয়ে যাবে।

লোকটি চোখ কটমট করে শাহিনের দিকে তাকালো তারপর ডানে বায়ে তাকিয়ে একজনের কাঁধ খামচে

ধরলো।

মাহফিল শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ বাড়ি ফেরার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল, এতদিন তারা সবাই পরিবার-পরিজন, বাড়ি-ঘর সব কিছু ভুলে বেহুশ হয়ে ছিল। আজ হুশ ফেরার পর হঠাৎ তাদের বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়েছে। রেজা আর শাহিনের অবস্থাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। ভিড় ঠেলে কোনো রকমে পাইরাগাছি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর রঙ-চুন করা চকচকে একটা বাসে উঠে বসল দু'জন। রেজা মনে মনে ভাবছিল, আসার সময় নড়বড়ে বাসটা বেশ জ্বালিয়েছে এবার নতুন বাসে একটু আরাম করেই ভ্রমণ করা যাবে। কিন্তু বাসটা চলতে শুরু করার পরই রেজার ভুল ভাঙলো। বাসটার দেহটা নতুন হলেও ভিতরের কলকব্জাগুলো বেজাই পুরানো। গরুর গাড়ির মতো ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তো সারাক্ষণই শোনা যাচ্ছিল সেই সাথে ড্রাইভার ব্রেকে পা দিলেই বাসটি থরথর করে কেঁপে উঠছিল আর এমনভাবে ঝন ঝন করে শব্দ হচ্ছিল যে, রেজার মনে হচ্ছিল সবগুলো কলকব্জা হয়তো ভেঙে পড়লো, মেরামত না করে হয়তো আর বাসটি চালানো যাবে না। রেজার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বাসটা কিন্তু আবার স্বাভাবিক গতিতে চলছিল। রেজা ভাবে, কলকব্জাগুলো কি নিজে থেকেই

জায়গামতো জুড়ে গেলো! ঐ পীরের মতো। যিকির করতে করতে যার হাত-পা খুলে আলাদা হয়ে যেতো পরে আবার তা স্বয়ংক্রীয়ভাবে জায়গামতো জুড়ে যেতো। কথাটা মনে হতেই রেজা নিজের মনেই হেসে ওঠে।

রেজার শরীরটা নিশ্চয় ভীষণ ক্লান্ত ছিল। সে কারণেই হয়তো, তার চোখ দুটো এসব বিশ্রী আর বিকট শব্দের মাঝেও ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। বাসের সীটে শরীর এলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে নিজের অজান্তেই তার চোখ দুটো বুজে আসলো। তারপর যে অবস্থা হলো সেটাকে এক রকম ঘুমই বলা চলে। একটা কাঠের টুকরোকে পানিতে ফেললে যেমন প্রথমে সেটা পানির গভীরে ডুবে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার উপরে ভেসে ওঠে। অনুরুপ রেজা প্রায়ই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কোনো একটা শব্দ শুনে বা ঝাকুনি খেয়ে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। তখন কানে ভেসে আসছিল, মানুষের হৈ চৈ আর যানবাহনের প্যা-পু শব্দ। চোখ না খুলেই রেজা ঐ সব শব্দ শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল। এভাবে এক সময় সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর ঘুম যেনো তার কানকে অকেজো করে দিল। তাই কোনো শব্দ আর তাকে জাগাতে পারলো না। এভাবে কতক্ষণ ছিল সেটা সে জানে না। তবে

হঠাৎ বিকট একটা শব্দে রেজার ঘুম ভেঙে গেলো কিন্তু চোখ খোলার ইচ্ছা হলো না। শব্দটা কিসের সেটা নির্ণয় করার জন্য রেজাকে অবশ্য বেশিক্ষণ চিন্তা করতে হলো না। চোখ বুজেই সে অনুমান করে নিলো, শব্দটা নিশ্চয় এই ভাঙা গাড়িটা থেকেই বের হয়েছে। কোনো এক স্ট্যান্ডে থামার জন্য হয়তো ড্রাইভার ব্রেকে পা দিয়েছে অমনি গাড়িটির কলকব্জগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে। রেজা মনে মনে বলে, চিন্তা নেই এটা বুজুর্গ বাস। এর কলকব্জাগুলো আবার নিজ থেকে জোড়া লেগে যাবে। তারপর নিজেকে নিজেই ধমক দেয়, এসব কি উদ্ভট চিন্তা! কিন্তু তখনই ঘুমের ঘোরে আবার তার মাথাটা আওলিয়ে যায়। মনে হয়, যদি একটা মানুষের দেহ নিজের থেকেই জোড়া লেগে যেতে পারে তবে একটা বাসের কলকব্জা নিজে থেকেই জায়গামতো জুড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এ নিয়ে তার চিন্তার কিছু নেই। সে সময় তার কানে ভেসে আসে,

- এই দাজ্জাল, দাজ্জাল।

দাজ্জালের নাম শুনে রেজা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। সে ভাবে হয়তো স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে তো ঘুমিয়ে নেই কেবল চোখ দুটো বুজে আছে। এই যে সে বাসের সীটে বসে আছে, তার শরীর স্পর্শ করে পাশে কেউ

বসে আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করেই রেজা বুঝতে পারে পাশে যে বসে আছে সে নিশ্চয় শাহিন। তার কানে ভেসে আসছে, কেউ একজন বলছে,

- এই বাদাম।

এসবই তো বাস্তব। এগুলো তো স্বপ্ন নয়। কিন্তু এসবের মাঝে দাজ্জাল কোথা থেকে আসলো! রেজার মনে হলো, হয়তো সে ভুল শুনেছে। অতএব, এসব চিন্তা বাদ দিয়ে সে আবারও ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো, ঠিক তখন আবার শোনা গেলো,

- দাজ্জাল, দাজ্জাল।

রেজা এবার বুঝতে পারে স্বপ্নে নয়। বাস্তবেই কেউ একজন দাজ্জাল দাজ্জাল বলে চেচাচ্ছে। তার মনে হয় চোখ খুলে তাকালেই দাজ্জালের কুৎসিত চেহারাটি তার সামনে ভেসে উঠবে। সে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সকল ক্লান্তি আর ঘুমকে উপেক্ষা করে আলতো ভাবে চোখ খুলে তাকায়। বাসের মধ্যে সব কিছু স্বাভাবিক আছে। কোথাও কোনো ভেজাল নেই, দাজ্জাল জাতীয় কিছুই নজরে পড়ছে না। সুতরাং সে আবার চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে। ঠিক তখন সে শোনে ঠিক তার কানের পাশে কেউ একজন, দাজ্জাল, দাজ্জাল বলে চেচিয়ে উঠলো। শব্দটি শুনতেই স্বয়ংক্রীয়ভাবেই রেজার চোখ

দুটো খুলে গেলো। এবার সত্যিই কুৎসিৎ একটা চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মাথার উপর টাক পড়া, চুল, দাড়ি ছাড়া লোকটার চেহারা কুৎসিতই বটে। মুখে একটা মুচকি হাসি তবে বিশ্রী গোফটির কারণে সে হাসি তার শ্রী বৃদ্ধি করতে পারে নি। তার হাতে একটা বই তাতে আরও বেশি কুৎসিৎ একটা ছবি আর বেশ বড় করে লেখা "দাজ্জাল"। এক্ষণে রেজা আসল ব্যাপার বুঝতে পারে। বর্তমানে স্বঘোষিত লেখকদের স্বরচিত বইয়ের অভাব নেই। অনেকেই আছে দু'কলম শিখে পাঁচ কলম লিখে ফেলে। তারপর রাস্তা ঘাটে হকারি করে নিজের বই নিজেই বেচে বেড়ায়। অথবা কিছু ভাড়াটে লোক বা অন্ধভক্ত লাগিয়ে দেয় বেচার জন্য। এই বইটিও নিশ্চয় তেমন কিছুই হবে। রেজা বইটির দিকে বিরক্তি ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

রেজাকে তাকাতে দেখে বইটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটি সংক্ষিপ্ত বয়ান শুরু করে,

- মানুষ মনে করে দাজ্জাল হলো একটা দানব। সবাই তাই দানব দাজ্জালের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু আমাদের এমাম এই বইটা লিখে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, দাজ্জাল কোনো ব্যক্তি নয় বরং ইহুদী খৃষ্টান সভ্যতাই হলো দাজ্জাল। অতএব, দাজ্জাল নামের কোনো ব্যক্তির অপেক্ষায় যারা আছে তারা বোকা ছাড়া কিছু নয় ....

লোকটার কথা শুনে রাগে রেজার পুরো ঘুম ছুটে যায়। সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্লের সাথে বইটি ফেরত দিয়ে রেজা বলে,

- দাজ্জাল কোনো ব্যক্তি নয়!

লোকটা বেশ গর্ব করে বলে,

- না, না। যারা দাজ্জালকে ব্যক্তি মনে করে তারা বোকা। তারা হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করতেই থাকবে ব্যক্তি দাজ্জাল কখনই আসবে না।

কথাটা বলে লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে। সেই হাসিতে লোকটার কুৎসিত চেহারা আরও বেশি কুৎসিত মনে হয়। এ বিষয়ে লোকটার সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে রেজার ইচ্ছা হয় না। তবে যখন দেখলো, লোকটি পাশেই দু'একজন লোককে একই বয়ান শোনাতে শুরু করেছে তখন সে তাকে ধমক দিয়ে বলে,

- আল্লাহর রাসুল (সঃ) নিজেই তো দাজ্জালকে ব্যক্তি মনে করেছেন সেটা জানা আছে?

লোকটা বেশ অবাক হয়ে রেজার দিকে তাকিয়ে থাকে। রেজা বলতে থাকে,

- সহীহ মুসলিমে হযরত তামীম আদ-দারী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার সমুদ্রে ভ্রমণের সময় পথ হারিয়ে

একটি অজানা দ্বীপে গিয়ে ওঠেন। ঐ দ্বীপে জাসসাসা নামে এক প্রাণীর সাথে তাদের সাক্ষাত হয় পরে ঐ প্রাণীটি তাদের আরও একটা প্রাণীর নিকট নিয়ে যায় যার হাত পা শক্ত ভাবে বাঁধা ছিল। সে বলে আমি দাজ্জাল। খুব শীঘ্র আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বের হবো। এ কাহিণী শুনে আল্লাহর রসুল সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই ঘটনা শুনে আমি অবাক হয়েছি, আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে যা বলতাম এটা তার সাথে মিলে গেছে।”

সুতরাং আল্লাহর রাসূল যে দাজ্জালের কথা বলেছেন সেটা একটা ব্যক্তিই বটে। তবে ইয়াহুদী খৃষ্টান আর তাদের সভ্যতাকে দাজ্জালের বাহিনী বলা চলে, আসল দাজ্জাল নয়।

এতক্ষণ যারা টেকো লোকটার কথা শুনছিল রেজার কথা শেষ হতেই তারা সমস্বরে বলে ওঠে,

- ঠিক ঠিক। এটাই ঠিক।

জনমত ঘুরে যেতে দেখে লোকটি যেনো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। রেজার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল,

- ওসব জাল হাদীস।

কথাটা শুনে রেজার মাথা গরম হয়ে যায়। ভীষণ

উত্তেজিত হয়ে বলে,

- সহীহ মুসলিমের হাদীস জাল! বুঝে-শুনে কথা বলো, তা না হলে কিন্তু চড়িয়ে দুই গাল লাল করে দেবো।

এই কথাটা শুনে টেকো লোকটা তর্জন গর্জন করে কিছু একটা বলে যা বোঝা যায় না। তারপর নিজের মাথাটা রেজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,

- সাহস থাকে তো একবার চড়িয়েই দেখেন তেলে জলে কেমন মিশিয়ে দিই।

আর প্রায় সাথে সাথেই চটাম করে শব্দ হলো। ঘটনা কি বুঝতে রেজার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

রেজার পাশে বসে শাহিন এতক্ষণ সব কিছু নিরবে পর্যবেক্ষণ করছিল। লোকটার কথা-বার্তা যে হাদীস বিরোধী সেটা বুঝতে পারার পরই সে রেগে আগুন হয়ে রয়েছে। শুরুতেই তার মনে হচ্ছিল লোকটার নাক বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে ভাল হয়। এখন হাতের নাগালে পেয়ে তাই সে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে লোকটার গালে বেশ জোরে একটা থাপ্পর কষিয়ে দিয়েছে।

শাহিনের শক্ত হাতের থাপ্পর খেয়ে লোকটার মুখটা সত্যিই লাল হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে শাহিনের উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু

শাহিন দুহাত দিয়ে থাক্কা দিতেই লোকটা কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল। শাহিনের গায়ে যে বিকট শক্তি সেটা এখন লোকটা আন্দাজ করতে পারে। তাই কাছে না এসে দূরে দাঁড়িয়ে চেচামেচি করতে থাকে। কয়েকজন লোক চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার আহাজারি শুনতে থাকে। রেজা লক্ষ্য করে একজন বয়স্ক লোক ধমক দিয়ে বলে উঠলো,

- মেরেছে তো ঠিকই করেছে। সারা জীবন শুনে আসছি শেষ জামানায় কানা দাজ্জাল আসবে আর এই বাদর বলে কিনা দাজ্জাল বলে কেউ নেই।

বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে লোকটি যেনো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। রাগের চোটে বৃদ্ধ মানুষটাকে বিশ্রী ভাষায় গালা-গালি শুরু করলো। বয়স্ক লোকটাকে গালি দিতে দেখে সবাই উত্তেজিত হয়ে গেলো। লোকটাকে টেনে হেঁচড়ে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলো। একদল লোক একজনকে নিয়ে টানাটানি করছে দেখে রাস্তার পাশ থেকে একজন চেচিয়ে বলে,

- কী ভাই পকেট মার নাকী? লোক জন ডেকে একটা গণপিটুনি দিয়ে দেবো?

গণপিটুনীর কথা শুনে লোকটার যেনো হুশ ফিরলো। হাতের বইটি ব্যাগে ভরতে ভরতে দৌঁড়ে পালিয়ে

গেলো। চোখের আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত রেজা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে বলে,

- শয়তানের চর!

শয়তানের কথা শুনে শাহিনের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উদয় হলো, রেজার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,

- শুনেছি, যার পীর নেই তার পীর শয়তান। এখন তো আমার কোনো পীর নেই তাহলে আমার কি হবে?

শাহিনের কথা শুনে রেজা সব রাগ ভুলে শব্দ করে হাসতে হাসতে বলল,

- এইটা তো একটা শয়তানী কথা। যারা একথা বলে তারাই আসল শয়তান। তোর বাবা-মা-ই তোর আসল পীর। তাদের খিদমত করবি এতেই কামিয়াব হবি।

এই কথাটা শুনে শাহিন যেনো বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হলো। দৃঢ় ভাবে বলল,

- এটা তুই ঠিকই বলেছিস। ভন্ড পীরের পাল্লায় পড়ে যথেষ্ট টাকা পয়সা নষ্ট করেছি। এখন থেকে যতটুকু পারি বাবা-মার দেখা-শোনা করবো।

শাহিনের কথাটি শেষ হতে না হতেই প্রকান্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটি আবার চলতে শুরু করলো।

বাড়ি ফিরেই শাহিন হৈচৈ শুরু করল,

- আমার মা কই? আব্বা কই?

তার মা ঘরেই ছিলেন। তড়িঘড়ি করে বের হয়ে এসে বললেন,

- কী হয়েছে বাবা।

কোনো কথা না বলে রেজা তার পা চেপে ধরে বলল,

- মা আমি অনেক ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করো।

- ছিঃ ছিঃ এ কি করছিস। পা ছেড়ে দে। তুই কি খুনের আসামী যে, এভাবে ক্ষমা চেতে হবে।

- না, না। ক্ষমা না করলে তোমার পা আমি ছাড়বো না।

- ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম, এবার ছাড়।

ততক্ষণে শাহিনের বাবা হাজির হয়ে গেলেন। তিনি ভীষণ রসিক লোক। কৌতুক করে যে কোনো আবেগঘন পরিবেশকে হালকা করতে তার জুড়ি নেই। শাহিন ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরার আগেই তিনি তাকে থামিয়ে বললেন,

- পা জড়িয়ে ধরলে তো আসল ঘটনা ঢাকা পড়ে যাবে। তারচে বরং শুধু তাকিয়ে দেখো কি বেহাল দশা!

কথাটা বলে পরনের লুঙ্গিটা সামান্য উঁচু করে তিনি

নিজের পা দুটো পুরোপুরি প্রকাশিত করেন। শাহিন সেদিকে এক নজর তাকিয়েই ঘটনা কি বুঝতে পারে। বাবার জুতো জোড়াতে শ খানেক জোড়া-তালি দেখে লজ্জায় শাহিনের মুখটা লাল হয়ে যায়। তড়িঘড়ি করে সে বলে,

- আমি আজই নতুন এক জোড়া জুতা কিনে আনবো।

কথাটা শুনে শাহিনের বাবা যে খুব খুশি হলেন তা মনে হলো না। মুখটা ভার করে বললেন,

- ঠিক আছে বাবা। রোদ-বৃষ্টিতে গা-মাথা ভিজে পুড়ে একসা হোক পা দুটো রক্ষা পেলেই হবে।

গা-মাথা ভিজে পুড়ে একসা হওয়ার বিষয়টি শাহিন প্রথমে বুঝতে পারে না। একটু চিন্তা করতেই হঠাৎ তার মনে হয় বাবার একটা ছাতার দরকার। প্রথমে শাহিনের মুখটা কালো হয়ে যায়, পরে চিন্তা করে দেখে ভন্ড পীরের পিছনে সে যত টাকা খরচ করেছে এক জোড়া জুতা আর একটা ছাতার দাম তার চেয়ে অনেক কম। আর সাথে সাথেই সে বলে ওঠে,

- না না, গা-মাথা ভিজবে পুড়বে কেনো? আমি একটা ছাতা কিনে দেবো।

শাহিনের বাবার মুখটা তখনও ভার। নরম স্বরে তিনি বললেন,

- ঠিক আছে, আর যা যা দরকার সেগুলো না হয় থাক।

বাবাকে ওভাবে মন খারাপ করতে দেখে শাহিনের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। আর কি কি দরকার সেগুলো সে বুঝতে পারে। মাথার উপর টুপিটা ছিড়ে গিয়েছে, চশমার ডান দিকের কাচটাতে ফাটল ধরেছে। গায়ের পাঞ্জাবীটা তেল চটচটে হয়ে গেছে। এতদিন নিজের পিতা-মাতার কোনো খোঁজ-খবরই সে রাখেনি। নিজের উপর ভীষণ রাগ হয় তার। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ডান হাত দিয়ে চোখ দুটি মুছতে মুছতে শাহিন বলে,

- তোমার যা কিছু দরকার সবই আমি কিনে দেবো। আজ রাতেই বাজার থেকে সব কিনে আনবো।

ততক্ষণে শাহিনের মা হস্তক্ষেপ করেন,

- ছেলেটা বাড়ি আসতে না আসতেই তুমি এসব কি ফিরিস্তি শোনাতে শুরু করলে?

শাহিনের বাবা আবারও কৌতুক শুরু করেন,

- কেনো তোমার কি হিংসে হচ্ছে? তুমিও বলে ফেলো তোমার কি দরকার।

একথা শুনে শাহিনও বলে,

- মা। তোমার কি লাগবে বলো।

- না বাবা আমার কিছুই লাগবে না। শুধু কটা পানের পাতা এনে দিস। পান না খেলে এখন আর সময় কাঁটে না।

শুধু বাবা-মা নয়। সেদিন রাতে শাহিন পরিবারের সবার জন্য পছন্দমত জিনিস ক্রয় করে। তার অনেক টাকা খরচ হয়। কিন্তু মনে মনে সে খুব তৃপ্তি বোধ করে। এর আগে কখনও তার মনে এত তৃপ্তি অনুভব করে নি। সে নিজে নিজেই বলে, বাবা-মা ই হলো আসল পীর। যে বাবা-মা কে বাদ দিয়ে অন্য পীর ধরে তার পীরই হলো শয়তান।

দুই:

....

এরপর বেশ কিছু দিন কেটে যায়। পটলপুরের অটল বীর আর তার মাহফিলের কথা রেজার মন মগজ থেকে মুছে যায়। সব ঘটনা সে ভুলে যায়। শুধু একটা বিষয় সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। চোখ বুজলেই সে

দেখতে পায় একটা মরু প্রান্তর, একদল মুজাহিদ আর একটি কালো পতাকা। তার কানে ভেসে আসে কে যেনো বলছে,

- বায়াত ছাড়া উম্মতের মুক্তি নেই।

রেজার তখন উম্মতের দুরাবস্থার কথা স্মরণ হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের গণহারে হত্যা করা, জোরপুর্বক মুসলিম মহিলাদের বোরখা ছিনিয়ে নেওয়া, ইসলামী আইন-কানুনকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসেবে আখ্যায়িত করা, মুসলিম দেশে কাফিরদের রসম রেওয়াজ চালু করে মুসলিমদের দ্বীন-ঈমানকে হুমকীর সম্মুখীন করা, যে কেউ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করা। এসব ঘটনা এক ঝলকে তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। এসব লাঞ্চনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তি পেতে হলে, জিহাদ করতে হবে। আল্লাহর রাসুল বলেছেন, যখন মুসলিমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্চনা-গঞ্জনা চাপিয়ে দেবেন। আবার জিহাদ শুরু না করা পর্যন্ত এই লাঞ্চনা থেকে উম্মতের মুক্তি নেই।

- জিহাদ করতে হবে, কাফির-মুশরিকদের সকল ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে হবে।

রেজার চেহারায় রাগ ফুটে ওঠে, তার ডান হাতটা স্বয়ংক্রীয়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই সে নিজের মনে বলে ওঠে,

- জিহাদে বিজয়ী হতে হলে মুসলিমদের সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো একীভূত হতে হবে। বলীষ্ঠ কোনো নেতার হাতে বায়াত হতে হবে। দল-মত, ভাষা ও গোত্র, দেশ ও জাতি ইত্যাদি সব কিছু ভুলে সকল মুসলিমদের একজন নেতার আনুগত্য করতে হবে। তিনি হবেন, জামানার ইমাম মুসলিমদের খলিফা। সবটুকু শক্তি দিয়ে তিনি কাফিরদের মোকাবিলা করবেন। কত বড় পদ! কত বড় দায়িত্ব!

তখনই মুসলিমদের দলাদলি আর বিভক্তির কথা রেজার স্মরণ হয়। কাফিররা ষড়যন্ত্র করে মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন মতবাদ, ভাষা, দেশ ইত্যাদি পরিচয়ের ভিত্তিতে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলেছে। এখন আর আরব-আজম এক জাতি নয়। প্রতিটা দেশের নাগরিকরা আলাদা আলাদা জাতি। আরব বিশ্বের তেল সম্পদ কেবল তারাই ভোগ করবে। অন্য মুসলিমদের তাতে কোনো অধিকার নেই। শর্ত সাপেক্ষে তাদের দেশে গোলামী করার জন্য কেউ যেতে পারে কিন্তু সে সেখানে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে গণ্য নয়। সৌদিআরবে এখন হাজীরা পরদেশী হিসেবে গণ্য।

ভিসা ছাড়া কাউকে হজ্জ করতে দেওয়া হবে না। রেজা ভাবে,

- আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহর জমিনকে এভাবে সংকীর্ণ করার অধিকার কারও নেই। এসব সীমানাকে ভেঙে ফেলতে হবে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক নেতৃত্বে একই জাতিতে পরিণত করতে হবে। এটাই হলো খিলাফত। খিলাফতের বায়াতই হলো আসল বায়াত। এই বায়াতের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ কাফির-মুশরিকদের লাঞ্চনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে খিলাফত! কোথায় পাওয়া যাবে খলিফা?

রেজার মনটা আবেগে উত্তোলিত হয়ে যায়। নিজের মনেই সে বলে ওঠে,

- খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে হাজার হাজার আলেম-ওলামা আছে। বিশ্বব্যাপী তাদের পরিচিতি। সারা বিশ্বের মুসলিমকে এক করার চেষ্টা তারা কেন করছে না। তারা কি উম্মতের মুক্তি চাই না? নাকি তারা পটলপুরের অটলবীরের মতো কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে মত্ত! তাদের সাথে কথা বলতে হবে। খেলাফতের গুরত্ব সাধারন মানুষ বোঝে না। আলেম-ওলামারা

নিশ্চয় বুঝবে।

বড় বড় আলেম-ওলামাদের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত পাকা হওয়ার পর রেজার মনটা কিছুটা শান্ত হয়। করার মতো একটা কাজ তো তার সামনে রয়েছে। অতএব, অকারণ চিন্তা করে সময় নষ্ট না করে, এই পরিকল্পণাটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেটাই সে ভাবতে থাকে। তার মনে হয় আগে বড় বড় আলেম-ওলামাদের নাম ঠিকানা জোগাড় করতে হবে তার পর সময় সুযোগ করে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। রেজা তখনই খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ে।

দেখা গেলো, কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিলো বাস্তবে ততটা সহজ নয়। বেশ খানিক্ষণ চিন্তা করেও রেজা বড় বড় আলেমদের কোনো তালিকা প্রস্তুত করতে পারে না। আলেম তো হাজার হাজার রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট তা নির্ণয় করা বেজায় কঠিন কাজ। মাঠে ময়দানে যারা ওয়াজ নসীহত করে তাদের সবার নামের আগে লেখা হয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, কাকের মতো কা কা করে যে, তাকে বলা হয় কোকিল কণ্ঠী, বাতিলপন্থীদের ভয়ে যে নিজেই জলাতঙ্কে ভুগছে তাকে বলা হয় বাতিলের আতঙ্ক। অতএব, নাম আর উপাধীর গুরুত্ব

অনুসারে আলেমের বড়ত্ব মাপা সম্ভব নয়। রেজা এবার ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। রাস্তা-ঘাটে যেখানে যাকে পায় তাকে জিজ্ঞাসা করে,

- ভাই দেশের বড় বড় কয়েকজন আলেমের নাম বলেন তো।

রেজা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে সে যাকেই প্রশ্ন করে সে চটপট দু'তিন জন আলেমের নাম বলে দেয়। কিন্তু একজনের কথার সাথে আরেকজনের কথা মেলে না। সবাই নিজের দলের আলেমদের বড় আলেম বলে চালিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এখানেও বেশ বড় রকমের ভেজাল রয়েছে। রেজা বুঝতে পারে কারও কথার উপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কে বড় আলেম সেটা আলোচনার পরই বোঝা যাবে। অতএব, সামনে যাকে পাওয়া যায় তার সাথেই আলোচনা আরম্ভ করতে হবে। এভাবে হয়তো একদিন আসল লোক খুঁজে পাওয়া যাবে। শাহিনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে সে খুব উৎসাহী হয়ে বলে,

- দারুণ হবে! আগামী সপ্তায় পেত্নীতলায় একটা বড় ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হবে। সেখানে বিখ্যাত সব বক্তারা আসবে ওয়াজ করতে। তাদের

দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়। ঐ মাহফিলের আয়োজকদের মধ্যে একজনের নাম রকি। সে আমার খালাতো ভাইয়ের মামাতো শালা। তার সাথে কথা বলে আমি ওয়াজের পর বক্তাদের বিশ্রামের সময় আলোচনার ব্যবস্থা করে দেবো। প্রয়োজনে ওয়াজের ফান্ডে কিছু চাঁদাও দেবো। কি বলিস?

রেজা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে বলে,

- ঠিক আছে। মাহফিলের দিন দু'জন এক সাথে গেলে হবে। তুই মনে করে আমাকে ডেকে নিস। ভুলে যাস না যেনো।

শাহিন ভুলে গেলো না। এসব বিষয় সে মোটেও ভোলে না। ওয়াজের দিন সূর্য ওঠার পর থেকেই শাহিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। সকালে একবার রেজার সাথে সাক্ষাত করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। তারপর দুপুরে জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে রেজার সকল প্রস্তুতি শেষ কিনা সেটা জেনে নিল। অবশেষে আসরের পর দু'জনে পেত্নীতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। চার পাঁচ কিলো পথ। মটর বাইকে মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। মাহফিলের ময়দানে পৌঁছে রেজা বুঝতে পারে বেশ তাড়াহুড়া হয়ে গেছে। মাঠ তখনও পুরা ফাঁকা। একপাল গরু-ছাগল চরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সেসব গরু-

ছাগল সামনে নিয়েই একজন স্থানীয় তরুণ বক্তা ঝড়ের মতো বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তার সামনে হাজার হাজার শ্রোতা। কথার মাঝে মাঝেই চিৎকার করে বলছে,

- ঠিক কিনা?

মাঠের দু'একটি গরু মাঝে মাঝে তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। কে জানে হয়তো তারা তার কথা বুঝতে পারছে। কিছুক্ষণ পর যথারীতি সালাম দিয়ে লোকটি মঞ্চ থেকে নেমে আসলো। তারপর দশ-বারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, একটা গজল গাওয়ার চেষ্টা করলো। বেজায় বেসূরা গলায় সে এক নিশ্বাসে কয়েকটা কথা বারবার টেনে টেনে আবৃত্তি করতে থাকে ......

মুসলিম আমি, আল্লাহপ্রেমী
বিশ্ব আমার জন্মভূমী
তাগুতের আঁকা সীমানা প্রাচীর
ভেঙে দেবো আমি সাহসী বীর
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু
আমাজান বন, সাহারা মরু
সাতটি সাগর, সাত মহাদেশ

হবে সীমানা বিহীন একটিই দেশ।

ছেলেটার গলায় একটুও সূর নেই কিন্তু কথাগুলো কতো সুন্দর! প্রতিটা কথা রেজার হৃদয় ছুয়ে যায়। নিজেকে নিজেই শুধাই,

- এতটুকু ছেলে এত সুন্দর কথা কোথা থেকে শিখলো!

রেজার মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। হয়তো কালো পতাকা হাতে কোনো একদল মুজাহিদ গজলটি গাইতে গাইতে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাকে সকল প্রকার বিভক্তি থেকে মুক্ত করে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত করাই তাদের উদ্দেশ্য। হয়তো বাতাসে ভর করে বহু দূর থেকে কথাগুলো রেজার কানে ভেসে আসছে। রেজার চোখের সামনে এমন একদল মুজাহিদের চিত্র ভেসে ওঠে। সত্যি সত্যি যেনো তারা তার সামনে দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। রেজার কানে ভেসে আসে ঘোড়ার চি হি শব্দ। তার নজরে পড়ে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে উড়ে আসা ধুলোর ধোঁয়া। এসবই যেনো তার খুব কাছে। সে চাইলেই যেনো ছুঁয়ে দেখতে পারে। সে ভাবে, এটাই হলো ইমাম মেহেদীর বাহিনী। এদের হাতেই আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন খেলাফতের স্বর্ণযুগ। একদিন পৃথিবীর সবগুলো দেশের সীমানা উচ্ছেদ করে

এরা সারা পৃথিবীকে এক নেতার অধীনে একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত করবে। সে রাষ্ট্রের আইন হবে আল্লাহর, পতাকা হবে কালেমার। সেদিন উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু, আমাজান বন, সাহারা মরু প্রতিটি প্রান্তে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে।

রেজা কল্পণায় বিভোর হয়ে যায়। ছোট ছেলেটা কখন গজল গাওয়া শেষ করেছে এবং তারপর কতটা সময় পার হয়েছে তা সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে আজানের ধ্বণি। বাস্তবে ফিরে আসতে রেজার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। প্রথমে তার মনে হয়, আমাজান জঙ্গলের গভীর থেকে আজানের ধ্বণি ভেসে আসছে অথবা সাহারা মরুভূমির প্রশস্ত প্রান্তরে একদল মুসাফির হয়তো একত্ববাদের ঘোষণা দিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে তার সামনে মাহফিলের মাঠটি প্রকাশিত হয়। মাঠটি তখনও ফাঁকা। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে অবলা প্রাণীগুলো বাড়ি ফিরে গেছে। ইতোমধ্যে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হলো,

- উপস্থিত সবাইকে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়তে অনুরোধ করছি। মাগরিবের পর আমাদের ধর্মসভার কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে।

দু’একজন যারা মঞ্চের নিকটে পায়চারি করছিল

ঘোষনাটি শুনে তারাও মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

মাগরিবের নামাযের পর ওয়াজের মাঠে গিয়ে দেখা গেলো অল্প কিছু লোক মঞ্চের সামনে ভিড় করে বসে আছে। মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক খোশ গল্প করছে। মাহফিলের আয়োজকরা বারবার, এদিক সেদিক ঘুরাফেরা না করে মঞ্চের সামনে বসার জন্য অনুরোধ করছে। তাদের অনুরোধে কেউ গিয়ে বসছে আবার যারা বসে ছিল তাদের কেউ কেউ উঠে আসছে। অতএব, মঞ্চের সামনে লোক সংখ্যা কিছুতেই বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। মাহফিলে তিন তিন জন বক্তা। তৃতীয় বক্তাকে এখনই মঞ্চে তুলতে না পারলে মাহফিল শেষ করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠি হাতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। মানুষকে অনুরোধ করে বসানোর চেষ্টা করলো। তাদের অনুরোধে রেজা শাহিনকে নিয়ে মঞ্চের খুব নিকটে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লো। যখন মনে হলো, মঞ্চের সামনে মোটামুটি চোখে পড়ার মতো লোক জমায়েত হয়েছে। তখন তৃতীয় বক্তাকে মঞ্চায়ন করা হলো।

তরুণ বক্তা। চিকন শরীরটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক বক্তৃতা করলো। খারাপ মানের রেডিওগুলো

যেমন একেক সময় একেক চ্যানেলে ধরে সে ধরণের খাপছাড়া, প্রসঙ্গবিহীন আলোচনা। সাধারন একজন হাফেজ, পড়াশুনা খুব বেশি নয়। হেফজ পড়ার সময় বিভিন্ন উস্তাদের মুখে যেসব কাহিনী শুনেছে তার মধ্যে যখন যেটা মনে পড়ছে শ্রোতাদের শুনিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর রসুলের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কিভাবে জাতা ঘুড়িয়ে আটা পিসতেন আর তার চোখের পানিতে কিভাবে সব আটা খামির হয়ে যেতো সেই কাহিনী বেশ রসিয়ে বর্ণনা করার পরই শুরু হলো আশেকে রাসুল ওয়াজ কোরুনীর দাত ভাঙার কাহিনী। সেটা শেষ হওয়ার পর একটা বুড়ির গল্প যে আল্লাহর রসুলের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, পরে সে অসুস্থ হলে আল্লাহর রাসুল তাকে সেবা শুশ্রুষা করে সারিয়ে তোলেন। এরপর কোন বুযুর্গ ইবলীস শয়তানের সাথে বিতর্ক করেছিল। শয়তান তাকে প্রশ্ন করে আল্লাহ এক এর প্রমাণ কি? তিনি বলেন, বিনা দলীলে আল্লাহ এক। হাফেজ সাহেবও বিনা দলীলে সবগুলো কাহিনী বর্ণনা করে গেলেন। তার কাহিনী সমগ্র শুনে রেজার কান ঝালা-পালা হওয়ার উপক্রম হয়। ইচ্ছা হচ্ছিল ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে। অন্য যে কোনো সময় হলে সে তাই করতো কিন্তু আজ সে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। আজ পালানোর উপায় নেই। হাফেজ

সাহেবের বক্তব্য শেষ হলে উপস্থাপক তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ঈশার সলাতের বিরতি ঘোষণা করে। সেই ফাঁকে শাহিন চলে যায়, তার খালাতো ভাইয়ের মামাতো শালার সাথে দেখা করতে। তার সাথে কথা আগে থেকেই চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। তবু আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলে ভাল হয়। রেজার উদ্দেশ্যে শুধু বলে গেলো,

- আমি সঠিক খবর না নিয়ে ফিরবো না। নামায পড়ে তুই আগের জায়গায় বসে অপেক্ষা করবি। আমি তোকে খুঁজে নেবো।

কথাটা বলেই রেজার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে শাহিন দ্রুত হারিয়ে গেলো। ঈশার নামাযের পর রেজা আগের জায়গায় স্থান গ্রহণ করলো। কিছুক্ষণ পর শাহিন ফিরে আসলো। অনেকটা শান্তনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

- প্রধান বক্তা এখনও এসে পৌঁছায় নি। যানজটে পড়েছে। আসতে বেশ রাত হবে। এসেই মঞ্চে উঠবে। ওয়াজের শেষে খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম। তার আগে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। রকি আমাদের ঐ সময়ই যেতে বলেছে। খাওয়ার দাওয়াতও দিয়েছে।

কথাটা বলেই শাহিন রেজার দিকে তাকিয়ে হেসে

ওঠে। খাওয়ার কথা শুনলেই তার মনটা খুশিতে নেচে ওঠে। রেজা অবশ্য বিরক্তি অনুভব করে। খাওয়ার সময় কারও সামনে উপস্থিত হওয়াটা তার নিকট বেজাই বে-মানান। তবু তাকে যেতে হবে। আজ তার ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। আজ তার হাত-পা বাঁধা।

এর মধ্যে রেজা শোনে বেশ ভারি গলায় কে যেনো বলছে,

- আলহামদু লিল্লাহ্ ....

কখন যে দ্বিতীয় বক্তা মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা রেজা টের পায় নি। লম্বা একটা আরবী ভূমিকা শেষ করে কিছুক্ষণ দরুদ ও সালাম পাঠ করার পর বক্তা বাংলায় কথা বলা শুরু করলেন।

- ভাই-ব্রাদার, দোস্ত-বুযুর্গ, এই মাহফিল হলো জান্নাতের বাগান বলুন, সুবহানাল্লাহ!!

জনতা সমস্বরে বলে উঠল,

- সুবহানাল্লাহ্!!

কিন্তু উপস্থিত জনতার সংখ্যা নিতান্ত কম বিধায় উক্ত শব্দের আওয়াজে খুব একটা তেজ অনুভব করা গেলো না। বক্তা বেশ চেচিয়ে বলেন,

- আরে ভাই জোরে বলুন না, সুবহানাল্লাহ।

শ্রোতারা আগের চেয়ে বেশি জোরে সুবহানাল্লাহ বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু সংখ্যা কম হলে আওয়াজ জোরে হবে কীভাবে। বক্তা বিষয়টি বুঝতে পারে। মজলিসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেন অবস্থা জটিল। জাগায় জাগায় দু একজন জটলা পাকিয়ে বসে রয়েছে কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। সেখানে নিচে বিছানো সাদা চট রড লাইটের আলোতে চকচক করছে। অনেকটা হেড মাস্টারের টাক মাথার মতো। তিনি চিৎকার করে বলেন,

- ভায়েরা আমার, এগিয়ে আসুন মাঝখানে ফাঁকা রাখলে সে জায়গায় কে বসে ভাই?

সবাই একবাক্যে বলে,

- মিষ্টার ইবলিস। বক্তাদের মুখে শুনে শুনে উত্তরটা তাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।

প্যান্ডেলের মধ্যে যারা বসে ছিল তারা সবাই ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাতে অবস্থা আরও বেশি বেগতিক হয়ে গেলো। এতক্ষণ লোকজন প্যান্ডেলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাতে এক নজরে অনেক লোক মনে হচ্ছিল। ভাল করে খেয়াল না করলে মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলো ধরা পড়ছিল না। কিন্তু এখন মঞ্চের সামনের দু তিন লাইন ছাড়া পুরা

প্যান্ডেলটা ফাঁকা হয়ে গেলো। সেটা দেখে বক্তা আরও বেশি দুঃখিত হয়। এই কটা লোক সামনে নিয়ে লম্বা চওড়া বক্তব্য দেওয়াটা তার নিকট হাস্যকর মনে হয়। কাকুতি মিনতি করে বলে,

- যারা এদিক সেদিক ঘুরা ফিরা করছেন বা বাড়িতে বসে মাহফিল শুনছেন তারা দয়া করে প্যান্ডেলের নিচে অবস্থান নিন। আপনারা হয়তো ভাবছেন, বাড়ি বসেই তো ওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মাঠে গিয়ে কষ্ট করার কি দরকার। ওয়াজের প্যান্ডেল হলো, ডিমে তাওয়া দেওয়া মুরগীর মতো। যে ডিমটা মুরগীর কোলের মধ্যে থাকে তাতে বাচ্চা ফোটে আর যেটা বাইরে থাকে সেটা এমন পঁচা পঁচে যে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ভায়েরা আমার, যারা ওয়াজের মাঠে প্যান্ডেলের মধ্যে বসে ওয়াজ শোনে তারা সফল হয়, আর যারা প্যান্ডেলের বাইরে বসে থাকে তারা পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, সবাই প্যান্ডেলের ভিতরে বসুন।

এভাবে মিনিট কয়েক চেষ্টা করেও যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলো না তখন মওলানা সাহেব বাঁকা পথ ধরেন। উত্তেজিত হয়ে বলেন,

- যারা কুরআনের মাহফিলে আসে না তারা নবীর দুশমন আল্লাহর শত্রু আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন।

এই মাইকের আওয়াজ যে শুনতে পাচ্ছে সে যদি এখনই মাহফিলে উপস্থিত না হয় তবে সে নাস্তিক। হাশরের ময়দানে আমি তাকে দেখে নেবো ..... ইত্যাদি।

এভাবে বিশ্রী কিছু শব্দ প্রয়োগ করে গালি দিয়ে মওলানা সাহেব প্যান্ডেলের বাইরে যারা বসে আছে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে থাকেন।

রেজা ভাবছিল, এসব শুনে মানুষ চারিদিক থেকে প্রাণপণে ছুটে এসে প্যান্ডেল ভর্তি করে ফেলবে। কিন্তু এসব গালি-গালাজ অরণ্যে রোদন বলেই মনে হলো। কয়েক মিনিট ধরে এক নাগাড়ে গালিগালাজ চলতে থাকা সত্ত্বেও প্যান্ডেলের বাইরের একটা লোকও প্যান্ডেলে ঢুকলো না। মওলানা সাহেবের প্রচন্ড গালাগালি ও অভিশাপের মাঝেও তারা স্বাভাবিকভাবে যে যার কাজে লিপ্ত ছিল। কেউ বাদাম খাচ্ছে, কেউ বেঁচছে, কেউ গাছে হেলান দিয়ে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হুজুরের গালাগালিতে তারা মোটেও চিন্তিত নয়। হয়তো তারা মনে মনে বলছে,

- শকুনের দোয়ায় কি আর গরু মরে!

মওলানা সাহেবের এহেন আহাজারী দেখে আর বিশ্রী

সব ভাষা শুনে রেজার মেজাজটা গরম হয়ে যায়। সে ভাবে,

- লোক কম-বেশি হলে কি সমস্যা? দ্বীনের কথা যে বলবে, আল্লাহ তাকে পুরষ্কার দেবেন। লোক বেশি কি কম তাতে কি যায় আসে?

শাহিনকে কথাটা বলতেই সে বলে,

- ব্যাপারটা বুঝলি না? এই ব্যাটারা কি আর সওয়াবের জন্য এসব করে। করে পেটের দায়ে। ওয়াজ করে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করে। লোক কম হলে কালেকশন কম হবে। মাহফিলের আয়োজকরা টাকা দিতে গিয়ে গড়িমশি করবে। তাই আর কি।

কথাটা চট করে রেজার মাথায় ধরে যায়। প্রশংসার ভঙ্গিতে শাহিনের দিকে তাকিয়ে বলে,

- একেবারে ঠিক কথা। তাই তো বলি ওয়াজ শোনানোর জন্য মানুষকে এতো জোরাজুরি করার কারণ কি? ব্যাটা বলে কিনা প্যান্ডেলের বাইরে যারা আছে তারা রাসুলের দুশমন, আল্লাহর শত্রু, তারা নাস্তিক। একটু আগে যখন তৃতীয় বক্তা ওয়াজ করছিল তখন ঐ ব্যাটা ছিল কোথায়?

সাথে সাথেই শাহিন বলে ওঠে,

- কোথায় আবার! মিঞা সাহেবের বাড়ি। বালিশে

হেলান দিয়ে আয়েশ করছিল। আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি। আবার যখন প্রধান বক্তা মঞ্চে উঠবে তখন দেখবি ঐ বেটা প্যান্ডেল থেকে বের হয়ে মিঞা সাহেবের বাড়িতে ঢুকবে।

শাহিনের কথাটা শুনে নিয়ে রেজা বলে,

- তাহলে তো ঐ ব্যাটার কথা অনুযায়ী সে নিজেই একটা নাস্তিক, আল্লাহ-রাসুলের দুশমন।

এই যুক্তিতে শাহিন সন্তুষ্ট হয়। হালকা হেসে উঠে বলে,

- ঠিকই বলেছিস। ঐ ব্যাটাই আসল নাস্তিক।

ততক্ষণে মওলানা সাহেব গালাগালি বন্ধ করে মূল আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি কত বড় বক্তা, দেশে বিদেশে তার কত চাহিদা, তার সিরিয়াল পেতে হলে ক মাস আগে যোগাযোগ করতে হয় এবং কত টাকা অগ্রীম প্রদান করতে হয় সেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করলেন। দেশের আনাচে কানাচে তার কত ভক্ত অনুসারী আছে এবং কোথাও ওয়াজ করতে গেলে তারা কীভাবে বাস-ট্রাক নিয়ে দূর দুরান্ত থেকে এসে মাঠ ভরিয়ে ফেলে সেটা বললেন কিন্তু এই মাহফিলে তারা কেনো আসেনি সেটা বললেন না। নিজের সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। এরপরই কুরআন হাদীসের আলোচনা শুরু করলেন।

তাবুকের যুদ্ধে উমর (রাঃ) কত টাকা দান করেছিলেন, উসমান (রাঃ) কতটি উট প্রদান করেছিলেন ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,

- এখানে কি কোনো উমর-উসমান নেই? যে মাহফিলের জন্য মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দান করবে।

শাহিন রেজার দিকে তাকিয়ে বলে,

- দেখলি তো?

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে রেজা এই চিত্র দেখলো। নানা কৌশলে মানুষকে পটিয়ে পাটিয়ে হাজার হাজার টাকা জোগাড় হয়ে গেলো। রাত দশটার পর কালেকশন শেষ হলে দাতাদের উদ্দেশ্যে প্রাণ খুলে দোয়া করে বক্তা মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। এরপর কিছুক্ষণ মাহফিলের আয়োজক পেত্নীতলা রত্নমালা জনসেবা কমিটির সভাপতি জনাব চাঁন মিঞা ভাঙা ভাঙা গলায় আলোচনা করলেন। তিনি এই কমিটির জন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের বর্ণনা দিলেন। পরে মাহফিলের প্রধান অতিথি জন দরদী নেতা আল-হাজ টিকার আলী ওরফে টুকু নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। তার নাম টুকু না হয়ে টাকু হলেই অধিক সঙ্গত হতো। দুই কানের উপর দুই গুচ্ছ চুল ছাড়া পুরো মাথাটা তেলের মতো চকচক করছে। যাই হোক তিনি এই সরকারের আমলে কতটা

মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, প্রতিদিন দেশে গড়ে কয়টি ধর্ম সভার আয়োজন হচ্ছে, মন্ত্রী এম,পি রা কে কতবার হজ্জ করেছেন এসব বিষয়ে বিস্তারিত এবং বিরক্তিকর তালিকা পেশ করলেন। তারপর বললেন,

- আমি নিজেই জীবনে দুইবার হজ্জ করেছি। একটা ফরজ হজ্জ আর একটা হযরত ওমরের হজ্জ।

কথা বলার সাথে সাথে এক পাশ থেকে মৃদু একটা হাসির শব্দ শোনা গেলো। হাসি শুনে মি. টিকার আলী বুঝতে পারেন কিছু একটা ভুল হয়েছে। গত বছর রমজান মাসে, তিনি ওমরা হজ্জ করেছেন। সব কিছুতে অধিক পণ্ডিতি প্রকাশ করা তার পুরোনো অভ্যাস। ছোট বেলায় তিনি খলীফা উমরের কাহিনী পড়েছেন। তিনি মনে করেছেন তার নামেই উমরা হজ্জের নাম করণ করা হয়েছে। তাই পণ্ডিতি করে বলেছেন, হযরতে উমরের হজ্জ। সেটা শুনে মানুষ হাসাহাসি করছে। তিনি বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। অন্য প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আলোচনা শেষ করেন।

তারপর মাহফিলের মধ্যমনি প্রধান বক্তা মঞ্চ অধিকার করেন। আসন গ্রহণ করেই তিনি সুর করে গাইতে থাকেন,

এই পেয়ারা নবী, দেগার আম্বিয়া ভী।

দরুদ বোলো, সালাম বোলো ....

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ উর্দু ফার্সী বলার পর বললেন,

- পেত্নীতলার রত্নমালা কল্যাণ কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এই মহতী মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি ...

এতদূর বলেই তিনি পিছনে ঝুলানো কাপড়ের ব্যানারের দিকে এক পলক তাকিয়ে সভাপতির নামটি দেখে নেন। তারপর আবার শুরু করেন,

- জনাব চান মিঞা। প্রধান অতিথি মি. টিকার আলী ও আমার প্রাণ প্রিয় যুবক ভায়েরা, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জনতা সমস্বরে সালামের উত্তর দেওয়ার পরই প্রধান বক্তা আবার শুরু করেন,

- আপনারা সবাই আমাকে চেনেন তবু ভদ্রতার খাতিরে আরও একবার নিজের পরিচয় পেশ করছি। আমি অল হাজ্জ মওলানা মুফতী ....

এতদূর বলেই কি মনে করে তিনি আবারও পিছনের ব্যানারটির দিকে লক্ষ্য করেন। মনে হয় যেনো নিজের নামটিও ভুলে গিয়েছেন। অতগুলো উপাধী যোগ করলে কিছুটা ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ব্যানার থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি যে আচরণ করলেন তাতে বোঝা গেলো

নিজের নাম তিনি মোটেও ভোলেন নি উল্টো ব্যানারেই তার নামটি ভুলভাবে লেখা হয়েছে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন যুবকের দিকে তাকিয়ে বেজাই বাজখায় গলায় বললেন,

- আমি নিজে হাতে লিখে দিলাম, অল হাজ্জ সেটা বাদ দিয়ে ব্যানারে আমার নামের আগে আল হাজ্জ কেনো লেখা হলো?

ছেলেটা খুব মসিবতে পড়ে গেলো বলে মনে হয়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে,

- হুজুর সবাই বলল, অল হাজ্জ কথাটা ভুল, আসলে আল হাজ্জ হবে। তাই ......

প্রধান বক্তা এবার আরও রেগে যান,

- অল হাজ্জ কথাটা ভুল? অল হাজ্জ মানে জানো? হজ্জ করলেই আল হাজ্জ হওয়া যায় কিন্তু অল হাজ্জ হওয়া কঠিন ব্যাপার।

ছেলেটা বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝায় যাচ্ছে সে এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। মওলানা সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলেন,

- যে একবার হজ্জ করে সে হাজী, দু-তিনবার হজ্জ করলে বলে আল-হাজ্জ আর আমি প্রতি বছর হজ্জ করি তাই আমি অল-হাজ্জ। অল মানে সব এই টা

জানো না?

ছেলেটা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়। ইংরেজীতে অল মানে সব এটা সে জানে। অতএব আল হাজ্জ আর অল হাজ্জের পার্থক্যটা সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারে। এই ব্যাখ্যায় অত্যধিক সন্তোষ প্রকাশ করে সে বলে,

- জী হুজুর, জী হুজুর।

মওলানা সাহেব এবার শান্ত হলেন। সামনে রাখা চায়ের কাপে দুবার চুমুক দিয়ে মুল আলোচনা শুরু করলেন। তেজস্বী কণ্ঠে বলে ওঠেন,

- ঘরে বসে থাকলে হবে না। আমাদের জিহাদ করতে হবে। মসজিদে মসজিদে পিকনিক করে বেড়ালেই জান্নাত পাওয়া যাবে না। জান্নাত পেতে হলে জিহাদ করতে হবে। এরপর বদর, উহুদ, মুতা ইত্যাদি যুদ্ধের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেন। এসব শুনে রেজার মনটা ভরে যায়। প্রধান বক্তার উপর তার মনে শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। ঠিক তখনই লোকটা খোলোস ছেড়ে বের হয়ে আসে। জনতার উদ্দেশ্যে বলে,

- সাহাবারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। তারা কত কষ্ট করেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্র চালু করে আমাদের রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। এখন আর

যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো প্রয়োজন নেই। পাঁচ বছর পর পর একটু নিজের ভোটটা হকের পক্ষে দিলেই তো জিহাদ হয়ে যায়। ইসলামের জন্য এতটুকু কি আমরা করতে পারবো না। ঠিক কিনা ভাই?

জনতা চিৎকার করে বলে,

- ঠিক।

শব্দটা বেশ জোরে শোনা যায়। ততক্ষণে মাহফিলের লোক সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। বাতিলের পক্ষে এতো লোক দেখে রেজা দুঃখিত হয়। সে ভাবে,

- দাজ্জালের বাহিনী মুসলিম বিশ্বকে দেশে দেশে বিভক্ত করে এই উম্মতকে দূর্বল করে দিয়েছে। তারপর প্রতিটা দেশে নিজের মন মতো আইন কানুন চালু করেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিমরা কাফির-মুশরিকদের রাষ্ট্রীয় সীমানা মেনে নিয়ে তাদের দেখানো রাস্তায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। এটাকেই তারা জিহাদ মনে করছে।

রেজার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। প্রধান বক্তা তখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন। বলছিলেন,

- জিহাদ মানে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা। এই যেমন ধরুন আমি এখানে বসে ওয়াজ করছি আপনারা শুনছেন।

এটাও জিহাদ। ভোট ক্যাম্পে গিয়ে চাঁদ তারা মার্কায় একটা ভোট দিলেই তো জিহাদ হয়ে যায়। তাই বলে কি তরবারীর জিহাদ এখন আর নেই? না-না, সেটাও আছে। এই যেমন ধরুন কুরবানীর সময় আমরা গরু ছাগল জবাই করি। গরু-ছাগল জবাই করতে তো ছুরি-তরবারি লাগে, তাই না? অনেক কষ্ট করতে হয়। এটাও এক প্রকার জিহাদ। এই টা হলো তরবারীর জিহাদ। এদিক থেকে আমার আবার খুব সুনাম আছে। প্রতি বছর কুরবানী ঈদে আমার এলাকার বড় ঈদগা মাঠে ঈদের জামাত আমিই পড়াই। নামাযের পরই শুরু হয় কুরবানী করার পালা। বেলা বারোটা পর্যন্ত জবাই চলতে থাকে। মানুষকে কত করে বলি নিজে হাতে কুরবানী দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু তারা কিছুতেই শোনে না। সবার কোরবানী আমাকেই জবাই করতে হয়। এতো কোরবানী করার কারণে এলাকার সবাই আমাকে বলে কোরবান হুজুর।

কথাটা শুনে সবাই হেসে ওঠে। তারপর লোকটি আরও কিছু কথা বলে এবং একসময় মোনাজাতের মাধ্যমে তার বক্তব্য শেষ হয়। উপস্থিত জনতা যে যার মতো বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। রেজা আর শাহিন রওয়ানা হয় মিঞা সাহেবের বাড়ির দিকে। সেখানেই বক্তাদের পানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের সাথে

রেজা কিছু আলোচনা করতে চায়।

মিঞা সাহেবের বাড়িতে পৌছানোর সাথে সাথেই পানাহার শুরু হয়ে গেলো। খাবার-দাবার প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগেই। অন্যান্য বক্তারা আগেই খেয়ে নিয়েছেন। প্রধান বক্তা পৌঁছাতে দেরি করার কারণেই হয়তো তার খাওয়াটা পিছিয়ে গেছে। যাই হোক দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে কোরবান হুজুর বেশ আয়েশ করে খেতে বসলেন। রকি সেখানে উপস্থিত ছিল। তার নির্দেশে রেজা আর শাহিনের জন্যও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। সাথে দুজন অতিরিক্ত লোককে খেতে বসতে দেখে হুজুরের কিছুটা মন খারাপ হলো বলে মনে হয়। বোধ হয় তিনি কিছু কম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। দ্রুত সব্জিটা শেষ করেই তাই তিনি মুরগির মাংসের দিকে মনোনিবেশ করেন। রকির দিকে তাকিয়ে বলেন,

- মুরগির রান আছে তো?

উত্তর না দিয়ে রকি তাড়াহুড়া করে হুজুরের পাতে একটা রান তুলে দেয়। নিমিষে সেটা নিঃশেষ করে হুজুর বলেন,

- আরও দাও।

রকি আগের মতোই দ্রুত তার পাতে আরও একটা

রান তুলে দেয়। সমগতিতে সেটা শেষ করে হুজুর বলেন,

- আরে! একটা করে দিচ্ছো কেনো? যে কটা রান আছে দিয়ে দাও।

রকি ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

- একটা মুরগির রান তো দুটোর বেশি হয় না হুজুর।

কথাটা শুনে কোরবান হুজুর বেশ রেগে যান। কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

- কত বার করে বলে দিলাম, কচি কচি দু চারটে মুরগি জবাই করতে আর এখন বলছো, মুরগি একটা!

কথাটা শুনে রকি কিছুক্ষণ চুপ থাকে তারপর বলে,

- আপনি বললেন, কচি মুরগির কথা আর অন্য দুজন বক্তা বললেন, ডিম পাড়া মুরগির কথা। তাই .....

কোরবান হুজুর রাগে গজগজ করতে করতে অন্য বক্তাদের দিকে দৃষ্টি দেন। অন্য দু'জন বক্তা তখনও সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তাদের খাওয়া আগে হয়ে গেলেও রাতে যাওয়ার ব্যবস্থা হয় নি। রাতটা এখানে কাটিয়ে সবাই একসাথে রওয়ানা হবেন। প্রধান বক্তাকে ওভাবে তাকাতে দেখে দ্বিতীয় বক্তা হালকা হেসে উঠে বলেন,

- যেহেতু আপনি গণতন্ত্র মানেন তাই আপনার রাগ করা উচিৎ নয়। কারণ মাহফিলের তিনজন বক্তার মধ্যে দুজনের মত ছিল বড় মুরগির পক্ষে। সে হিসেবেই বড় মুরগি কেনা হয়েছে।

গণতন্ত্রের কথা শুনে কোরবান হুজুর খুশি হলেন তা নয় তবে যেহেতু মুরগির রানের ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই তাই সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ ধরেন। রকির দিকে তাকিয়ে বলেন,

- গাজরের সালাত করতে বলেছিলাম। সেটা আছে তো?

রকি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। রেজা ভাবে,

- এসব বক্তাদের কি লজ্জা শরম কিছু নেই। খাবারটাও মানুষের কাছে চেয়ে খায়। এরা কি মানুষ না কি পশু!

শাহিন বলে,

- এরা ডিজিটাল ফকীর।

খাওয়ার শেষে কোরবান হুজুর একটা পান মুখে ভরে ছাগলের মতো চিবুতে শুরু করেন। এর পরই হয়তো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন। অতএব, এটাই সঠিক সময়। ব্যাপারটা রেজার আগে শাহিন বুঝতে পারে। সে রকিকে চোখের ইশারা করতেই সে বলে,

- হুজুর এরা বহু দূর থেকে এসেছে আপনার সাথে

সাক্ষাত করতে।

মোটর বাইকে তিন-চার কিলো পথ পাড়ি দেওয়াটা অবশ্যই বহু দূর বলে গণ্য নয়। তবে রকির এই কথাটার উপর এখনই আপত্তি উত্থাপন করাও শোভনীয় নয়। তাই রেজা ও শাহিন উভয়ে নীরব থাকে। বহু দূর থেকে কেউ সাক্ষাত করতে এসেছে শুনে কোরবান হুজুর খুশি হলেন বলেই মনে হলো। সদ্য পান খেয়ে লাল করা দাঁতগুলো বের করে একটু হেসে বলেন,

- তাই নাকি? এসো, এগিয়ে এসো।

রেজা তার দিকে এগিয়ে যায় শাহিনও এগিয়ে আসে। সৌজন্য কথা-বার্তার পরই রেজা শুরু করে,

- একটা প্রশ্ন ছিল।

বহু দূর থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করতে এসেছে দেখে হুজুর বেশ গর্বিত বোধ করেন। মোটা গলায় বলেন,

- ঠিক আছে, বলে ফেলো।

কিভাবে বলবে রেজা ঠিক বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলে,

- মুসলিমদের এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি?

হুজুর যেনো ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন। কি ধরনের দুরাবস্থা তা বুঝতে পারলেন না। প্রথমে নিজের

বিশালাকার ভুড়িটির দিকে তাকালেন। সেখানে একটা গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। সেটা অবশ্য কোনো গুরুতর সমস্যা নয়। রাতের খাবারটা ওভারলোড হয়ে গেলে অমন একটু হয়। একটা পান খেয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই ওয়াজ মাহফিলে বক্তা হিসেবে দাওয়াত পান। তাতে পেট পকেট উভয়ই ভরে। একটু আগেই ভুড়িটা মনের মতো ভরিয়েছেন। এখন একটা পান চিবুচ্ছেন। অতএব তার কোনো দুরাবস্থা নেই। মাথা উঁচু করে অন্যান্যদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় বক্তার শরীরটাও মন্দ নয়। নাম করা বক্তা, ভালো মার্কেট। ইনকাম অনেক। অতএব, তার অবস্থাও ভাল। তৃতীয় বক্তা একেবারে হ্যাংলা। সবে মাত্র বক্তৃতা করা শুরু করেছে এখনও মার্কেট তৈরী হয় নি। তার অবস্থাকেই হয়তো দুরাবস্থা বলা যায়। প্রধান বক্তা সাত পাঁচ ভাবতে থাকেন। মুসলিম উম্মাহর দুরাবস্থার ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন নি দেখে রেজা একটু ব্যাখ্যা করে বলে,

- বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চলছে আমি সেটার কথা বলছি। আফগান, আরাকান, চীন, চেচেন, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশে কাফিররা সরাসরি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে। মুসলিম শাসকরা নিজেরাও কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে

হকপন্থী মুসলিমদের জেল জুলুমের শিকারে পরিণত করছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন নেই, মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই ....

এতক্ষণে হুজুর বিষয়টি বুঝতে পারেন। নিরস ভঙ্গিতে বলেন,

- কাফিররা মুসলমানদের সন্ত্রাসী মনে করে বিধাই এভাবে তাদের দমন করে। মুসলিমদের প্রমাণ করতে হবে আমরা সন্ত্রাসী নয়। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। অস্ত্র ফেলে দিতে হবে, সসস্ত্র জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে হবে ....

এতদূর বলতেই পাশ থেকে দ্বিতীয় বক্তা আপত্তি করে বলেন,

- কোনো আন্দোলনেরই দরকার নেই। গণতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলেও কাফিররা সন্দেহ করে। তাই মাঝে মাঝে তাদের উপরও হামলা-মামলা হয়। অতএব, কাফিরদের জুলুম থেকে মুক্তি পেতে হলে রাজনীতি, দলাদলী সব বাদ দিয়ে নির্দলীয় হয়ে থাকাটাই ভাল। এই দেখেন না আমরা দ্বীনের দা’ওয়াত নিয়ে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করি। কাফির-মুশরিক নাস্তিক-মুরতাদ কেউ আমাদের বাধা দেয় না। কারণ আমরা

নিরীহ আর নির্দলীয়।

কথা বলেই দ্বিতীয় বক্তা প্রধান বক্তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। হয়তো তিনি উত্তর আশা করছেন। কি উত্তর দেওয়া যায় সেটা নিয়ে প্রধান বক্তা কিছুক্ষণ ভাবলেন। কিন্তু সুরাহা করতে পারলেন না। তার অবস্থা বেগতিক দেখে রেজা বলে,

- আপনারা নির্দলীয় এটা মোটেও ঠিক কথা নয়। আপনারা হলেন সর্বদলীয়। আপনাদের মধ্যে সরকারী দল, বিরোধীদল, বামপন্থী, ডানপন্থী ইত্যাদি সব রকম লোকই আছে। সবার সাথেই আপনাদের সদ্ভাব, যাকে বলে গোল আলু।

কথাটা বলে রেজা প্রধান বক্তার দিকে তাকায়। কথাটা শুনে তার মুখে কিছুটা হাসি ফুটেছে। রেজা তার উদ্দেশ্যে বলে,

- অস্ত্র ছেড়ে দিলে, সসস্ত্র জিহাদ পরিত্যাগ করলে সব ঝামেলা মিটে যাবে?

প্রধান বক্তা বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন,

- নিশ্চই নিশ্চই।

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রেজা তাকে থামিয়ে বলে,

- মাক্কী যুগে তো জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহর রাসূল

বা তার সাহাবারা কেউ তখন অস্ত্র ধরেন নি। তাহলে তখন কাফিররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করতো কেনো?

কোরবান হুজুর কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। প্রশ্নটা তার নিকট জটিল মনে হয়। একটু ভেবে নিয়ে বলেন,

- তখনকার কাফিররা তো খারাপ ছিল। তারা মুসলমানদের দুচোখে দেখতে পারতো না। বর্তমান যুগের কাফিররা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারা অনেক ভাল।

কথাটা শুনে দ্বিতীয় বক্তা কি বুঝলেন বোঝা গেলো না তবে হি হি করে হেসে বললেন

- কাফিররা আবার ভাল! নেককার চোর আর কি!!

তার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে রেজা বলে,

- রসুলের যুগের কাফিররাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল।

কথাটা শুনে কোরবান হুজুর যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। ভীষণ অবাক হয়ে বললেন,

- তারা গণতন্ত্র শিখলো কার কাছ থেকে। তখন কি আব্রাহাম লিঙ্কন ছিল!

- তা ছিল না তবে আব্রাহাম লিঙ্কনকে যে শিখিয়েছে সে তখনও ছিল। সে-ই কুরাইশ কাফিরদের গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছিল। বলুন তো সে কে?

কোরবান হুজুর বলতে পারলেন না। ইতিহাসে তার জ্ঞান অতি সামান্য। ভীষণ কোতুহলী হয়ে বলেন,

- আব্রাহাম লিঙ্কনের শিক্ষক! কে সেই মহান ব্যক্তি!

রেজা স্বাভাবিকভাবে বলে,

- মিষ্টার ডেভিল।

- মিষ্টার ডেভিল? এর আগে তো এ নাম কখনও শুনি নি।

হালকা শব্দে হাসতে হাসতে রেজা বলে,

- শুনেছেন। ইংরেজী বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। আরবীতে বললে এক কথায় বুঝে ফেলবেন। ডেভিল মানে হলো শয়তান। সে-ই গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। দেড় হাজার বছর আগে যে শয়তান আবুজেহেল, আবু লাহাবদের গণতন্ত্র শিখিয়েছিল সেই ইবলিস শয়তানই আব্রাহাম লিঙ্কনকে ওটা শিখিয়েছে।

কোরবান হুজুর যেনো কিছুই বুঝতে পারেন না।

- আবু জেহেল, আবু লাহাব এরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল?

রেজা দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- তবে আর বলছি কি? কেনো রসুলের জীবনীতে পড়েন নি। যখন কাফিরদের সাথে মুসলামনদের সংঘর্ষ

চরমে পৌঁছালো তখন কুরাইশ কাফিররা রসুলের উদ্দেশ্যে একটা শান্তিপ্রস্তাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল, তোমার উপাস্যকে আমরা ছয় মাস ইবাদত করবো আর আমাদের ইলাহকে তোমরা ছয় মাস ইবাদত করবে। এখন কাফিররা কি বলছে? বেশিরভাগ লোক যে পক্ষকে ভোট দেবে তারাই দেশ চালাবে। ধরুন আপনারা বেশি ভোটে বিজয়ী হলেন। এখন দেশে ইসলামী আইন চালু করলেন। সারা দেশে ইসলাম কায়েম হয়ে গেলো। কিন্তু পরের ভোটে কাফিররা বিজয়ী হলো। এখন কি হবে? সাজানো সংসার ভেঙে ফেলার মতো পুরো ইসলামী রাষ্ট্রটা সসম্মানে কাফিরদের হাতে তুলে দিয়ে আপনাদের অপমানিত হয়ে নেমে আসতে হবে। তারা দেশে কুফরী আইন চালু করবে। একবার ইসলামী আইন একবার কুফরী আইন। একটু ভেবে দেখুন তো এই পালাবন্টনটা হুবহু কুরাইশ কাফিরদের প্রস্তাবের সাথে মিলে যায় কিনা?

কুরবান হুজুর একটু ভেবে দেখলেন।

- ছ’মাস আল্লাহর ইবাদত ছ’মাস মূর্তি পূজা, একবার ইসলামী আইন একবার কুফরী আইন।

এভাবে কিছুক্ষন ভাবার পরই বুঝতে পারলেন দুটো প্রস্তাবের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তবে এটা স্বীকার

করলেন না বরং নিরব থাকলেন। রেজা বলতে থাকে,

- আসল ব্যাপার আরও ভয়ংকর। কুরাইশ কাফিরদের একটা গুন ছিল। তারা সাধারনত ওয়াদা ভঙ্গ করতো না। মুসলমানরা ছয় মাস মূর্তি পূজা করলে চুক্তি মোতাবেক তারা হয়তো সত্যি সত্যিই ছয়মাস আল্লাহর ইবাদত করতো। কিন্তু বর্তমানে কাফিররা যা চুক্তি করে বিনা যুক্তিতে তা ভঙ্গ করে। ভোটে যদি কুফরী শক্তি পাস করে তাহলে তারা যতটা খুশি কুফরী আইন প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু ইসলামী শক্তি বিজয়ী হলে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম করার সুযোগ থাকবে কি? ধরুন আপনারা বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেন। তারপর চোরের হাত কেটে দেবেন, বিবাহিত জেনাকারীকে রজম করবেন, অমুসলিমদের নিকট জিজিয়া আদায় করবেন এসব করতে পারবেন?

কোরবান হুজুর ভীষণ উৎসাহিত হয়ে বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। কেনো পারবো না।

- পারবেন না কারণ এখন যাদের ভয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন সেই কাফিররা এসব করতে দেখলে আপনাদের বর্বর অসভ্য ইত্যাদি উপাধীতে আখ্যায়িত করে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করবে। তুরঙ্কের অবস্থা দেখুন সেখানে

ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে কিন্তু এসব আইন কি কার্যকর করতে পেরেছে? আর যদি কাফিরদের কথার সামান্য বিপরীতে যান তাহলে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে আপনাদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেবে যেভাবে আলজেরিয়া বা মিসরে ঘটেছে।

কুরবান হুজুর এই বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হোন। তিনি কিছুই বলতে পারেন না। কেবল নিরবে শুনতে থাকেন। রেজা বলতে থাকে,

- সুতরাং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে আপনারা যে আন্দোলন করছেন তা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকেও অগ্রহণযোগ্য। যেহেতু কুফরী আইনের পক্ষে লোক সংখ্যা বেশি হলেই কিছুদিন কুফরী আইনকে মেনে নিতে হবে এটা শরীয়ত সম্মত নয়। ছয় মাস মূর্তিপূজা করার প্রস্তাব ইসলাম কখনও গ্রহণ করে না। একইভাবে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাস্তবতা বিরোধী। যেহেতু ভোটে পাশ করলেও কাফিররা কখনই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেবে না। ইতিহাস এ কথার পক্ষে স্বাক্ষী।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এই সত্য কথাটা বুঝতে হুজুরের অসুবিধা হওয়ার কথা

নয়। কিন্তু তিনি বুঝেও না বুঝার ভান করেন। নাকি স্বরে বলেন,

- এ ছাড়া তো আর কোনো পথও নেই।

রেজার মাথায় রাগ উঠে যায়। দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- পথ অবশ্যই আছে কিন্তু আপনারা সে পথে হাটতে নারাজ। আপনারা সহজ পথ তালাশ করছেন। আপনারা কৈ-এর তেলে কৈ ভাজার চেষ্টা করছেন। নিজেরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাগুতের সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। আপনারা মনে করেছেন কেবল জনগনের ভোটটা হাসিল করলেই তাগুতের সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটা অলীক কল্পণা ছাড়া কিছু নয়। এই সেনাবাহিনী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। এরা মুত্তাকী নয়। যত ভোটই আপনারা হাসিল করুন এই সেনাবাহিনী আপনাদের ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুসলিমদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। মুমিন মুত্তাকীদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। মুসলিমদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করতে হবে। দেশ-বিদেশের সকল তাগুতী শক্তির সাথে লড়াই করতে হবে। বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশের তাগুতী শক্তি মানে ক্ষমতাসীন দল, বিশ্বের তাগুতী শক্তি মানে, আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, রাশিয়া। তাদের সাথে লড়াই করার কথা শুনে কোরবান হুজুর কুরবাণীর পশুর মতো ছটফট করতে থাকেন। ভয়ে তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে যায়। মনে হচ্ছে স্বয়ং আজরাইল তার সামনে হাজির। আতংকিত হয়ে তিনি বলেন,

- তাগুতী শক্তির সাথে লড়াই মানে তো মানুষ খুন করা। এটা জঙ্গীবাদ বিশ্বের মানুষের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত কাজ। যারা এসব করে তারা সন্ত্রাসী। আমরা এসবের মধ্যে নেই। বিশ্বের খোঁজ খবর নিয়ে কাজ নেই নিজেদের আমল আখলাকের উন্নতি করতে পারলেই হলো। সৎ পথে চলো, সদা সত্য বলো এতেই হবে।

রেজা ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

- কেবল নিজে সৎ পথে থাকলেই হবে! মুসলিমদের একজন নেতা নির্বাচন করতে হবে না? একজন খলীফার হাতে বায়াত হতে হবে না? শুনুন, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। এভাবে মৃত্যুবরণ করলে তো আপনাদের জাহেলী মৃত্যু হবে।

কুরবান হুজুর যেনো সুযোগ পেয়ে গেলেন। সহাস্যে

বললেন,

- আমাদের তো বায়াত আছে। চাঁদ-তারা পার্টির নেতা মাওলানা হারুন ওরফে হারু আমাদের নেতা। চাঁদ-তারা মার্কায় ভোট করে বারবার ভোটে হারার কারণে লোকে তাকে বলে হারা চাঁদ। আমরা সবাই তার হাতে বায়াত। অতএব, আমাদেরও বায়াত আছে। তাই আমাদের জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে না, বুঝেছো?

ভীষণভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে রেজা বলে,

- গণতন্ত্রের বায়াত! এটা তো নিজেই একটা জাহেলী বায়াত। এই বায়াতের মাধ্যমে জাহেলীয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এতে আরও বেশি জাহেলী মৃত্যু হবে।

কথাটা শুনে কুরবান হুজুর রাগে ফুসতে থাকেন। চড়া গলায় বলেন,

- গণতন্ত্রের বায়াত যদি জাহেলী বায়াত হয় তবে খেলাফতের বায়াত তো সন্ত্রাসীর বায়াত!

কথাটা শুনে রেজার মাথাটা গরম হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় লোকটার গালে জোরে একটা থাপ্পর বসিয়ে দিতে। কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করে। তার মাথায় ভিন্ন একটা প্লান আসে। চড়-থাপ্পরের চেয়ে যার প্রভাব অনেক বেশি। শাহিনের দিকে তাকিয়ে বলে,

- তোর মামা পুলিশ অফিসার না?

শাহিন ব্যাপার বুঝতে পারে না। তার মামা একজন ছোটখাট পুলিশ অফিসার এটা ঠিক কিন্তু তার সাথে এখন কি দরকার সেটাই সে বুঝতে পারে না। কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করে। রেজা আবার বলে,

- তোর কাছে তার ফোন নম্বর আছে?

শাহিন এখনও ঘটনা পুরো বুঝতে পারে না। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারে। সে বুঝতে পারে হুজুরকে ভয় দেখানোই রেজার আসল উদ্দেশ্য, পুলিশ অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা নয়। এবার সে আগ বাড়িয়ে বলে,

- নাম্বার আমার পুরো মুখস্থ আছে। কল করলে এখনই চলে আসবে। কল করবো?

এ কথা শুনে কোরবান হুজুর ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে বলেন,

- এখানে পুলিশ আসবে কেনো?

হুজুরের দিকে তাকিয়ে রেজা মোটা গলায় বলে,

- আপনার নামে অভিযোগ আছে।

- অভিযোগ?

এমনিতেই পুলিশের কথা শুনে হুজুরের মনটা আতঙ্কে

আধখানা হয়ে গিয়েছিল। এখন তার নামে অভিযোগ শুনে তো তার প্রাণটা দেহ ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। থতমত খেয়ে বলেন,

- কিসের অভিযোগ?

- আপনি নাকি জিহাদ করেন।

জিহাদ করার কথা শুনে যেনো হুজুর আকাশ থেকে পড়লেন। দেশে জিহাদ করার শাস্তি কি সেটা তিনি ভালই জানেন। হয়তো ফাসি, নয়তো যাবৎ জীবন জেল। তড়িঘড়ি করে তিনি তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন,

- জিহাদ? আমি? এটা একেবারে বানানো কথা। একদম ভুল কথা।

রেজা একটু ব্যাখ্যা করে বলে,

- কেনো নিজেই তো বললেন, কথার জিহাদ, কলমের জিহাদ আবার কুরবানীর সময় তরবারীর জিহাদ ....

কথাটা বুঝতে কোরবান হুজুরের কিছু সময় লাগলো। উত্তরে কি বলবেন সেটা ঠিক করতে সময় লাগলো আরও বেশি। তারপর বললেন,

- আহা! এটা কি আর আসল জিহাদ? এটা তো কথার কথা। এই যেমন ধরেন মানুষ জেলখানাকে বলে শশুর বাড়ি কিন্তু এটা কি আর আসল শশুর বাড়ি! জেল

খানায় যাওয়ার সময় কি কেউ মিষ্টি নিয়ে যায়?

সত্য কথাটা এত সহজে স্বীকার করার বিষয়টা রেজার নিকট উপভোগ্য মনে হয়। কণ্ঠস্বর একটু নরম করে বলে,

- ও এই ব্যাপার! তাহলে আসল জিহাদ কোনটি?

কিছুমাত্র সময় না নিয়ে হুজুর বলেন,

- আসল জিহাদ হলো, অস্ত্রের জিহাদ। কাটা-কাটি, মারা-মারি এই সব। বদর উহুদের কথা মনে নেই? পাঁকা ঈমানদাররা ঐসব করে। আমাদের ঈমান দূর্বল। কোরবানীর সময় গরু-ছাগল জবাই করতে তাই আমাদের হাত কাঁপে। আমরা অবলা মানুষ। আমরা কি ওসব পারি!

রেজা মুচকি হাসে। সে জানে এটা একেবারে সত্য কথা। তবুও বলে,

- মিথ্যা কথা নয় তো?

হুজুর বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলেন,

- না, না। মিথ্যা কথা আমি বলি না।

কথাটা শুনে রেজা যেনো বেশ মজা পায়। হালকা শব্দে হেসে বলে,

- কখনও কখনও বলেন, এই যেমন আজ মাহফিলে

বললেন।

কোরবান হুজুর অবাক হয়ে বলেন,

- মাহফিলে মিথ্যা বলেছি?

- হ্যাঁ বলেছেন। আপনি প্রথমেই বললেন, আপনি প্রতিবছর হজ্জ করেন তাই আপনার নাম অল-হাজ। আবার বললেন, আপনি প্রতি বছর নিজ এলাকায় কোরবানীর ঈদের নামাজ পড়ান। বেলা বারোটা পর্যন্ত সারা এলাকার লোকের গরু-ছাগল কুরবানী করেন। তাই লোকে আপনাকে বলে কোরবান হুজুর। কিন্তু হুজুর, হজ্জ করলে কি সে বছর কুরবানীর ঈদ দেশে পড়া যায়?

হুজুর ঘটনা বুঝতে পারেন। রেজা লক্ষ্য করে হুজুরের মুখটা লাল হয়ে গেছে। শাহিনের চড় খেয়ে টেকো লোকটার মুখ যতটা লাল হয়েছিল কোরবান হুজুরের মুখ তার চেয়ে অনেক বেশি লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে হুজুর হঠাৎ বলে উঠলেন,

- এই সহজ ব্যাপারটা বুঝলেন না। হাদিসে এসেছে, মায়ের মুখের দিকে তাকালে কবুল হজ্জের সওয়াব হয় এটা শোনেন নি? আমার বউয়ের সাথে মার বনি-বনা হয় না। তাই তাকে গ্রামের বাড়ি রেখে এসেছি। প্রতি বছরে একবার আমি তাকে দেখতে যায়। ঐ হলো

আমার কবুল হজ্জ।

কথাটা বলে হুজুর বেশ গর্ব অনুভব করেন। তিনি আশা করছেন মান-সম্মানটা হয়তো এ যাত্রা বাঁচানো যাবে। গর্ব করার খুব বেশি সময় না দিয়ে রেজা বলে,

- কিন্তু হুজুর এইটা কি আসল হজ্জ? ব্যাপারটা মিষ্টির হাড়ি নিয়ে জেল খানায় যাওয়ার মতো হলো না। এখন তো দেখছি আপনার নামের আগে আলহাজের বদলে জালহাজ লেখাই অধিক সঙ্গত।

কথাটা শুনেই উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু কোরবান হুজুরের মুখটা আবার লাল হয়ে যায়। সবার কাছে বিদায় নিয়ে রেজা আর শাহিন প্রস্থান করে।

এই ঘটনার পর, আলেম-ওলামাদের উপর রেজা বেশ খানিকটা চটে যায়। সে বুঝতে পারে বেশিরভাগ আলেম-ওলামা যে কোনো মূল্যে নিজের স্বার্থ হাসিলের চিন্তায় বিভোর। তার মনে পড়ে মহান আল্লাহর বাণী,

"নিশ্চয় বহু সংখ্যক আলেম-ওলামা ও সুফী-দরবেশ মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে আর মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

রেজা ভাবে,

- তাদের মুখোস উম্মোচন করতে হবে। এ জন্য তাকে

আরও বেশি পড়াশুনা করতে হবে। অনেক অনেক বই-পুস্তক কিনতে হবে।

বই কিনার কথা শুনে রেজার মা ধমকে ওঠেন,

- আলমারিতে সব আরবী বই ভর্তি করে রেখেছিস ওগুলো পড়ে শেষ করেছিস?

রেজা হাসে,

- এসব বই কি কেউ আগা-গোড়া শেষ করার জন্য কেনে? যখন যেটা লাগে দেখে নিতে হয়।

রেজার মা এবার চুপ করেন। যখন যেটা লাগে সেটা যে রেজা বই খুলে দেখে নেয় তা তিনি জানেন। প্রায় প্রতিদিনই দু-চারটে বই বিছিয়ে সে পড়াশুনা করে। সব আরবী বই। ওসব বইয়ের আগামাথা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। তিনি আরবী পড়তে পারেন। প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলোয়াত করেন। তিনি ভাবেন, রেজার বইগুলোতে যের-জবর থাকলে তিনিও পড়তে পারতেন। কিন্তু পড়তে পারলেও যে বুঝতে পারতেন না সেটা তার মাথায় আসে না। মায়ের অনুমতি নিয়ে রেজা রওয়ানা হয়ে যায়।

তিন:

....

রেজা যেসব বই তালাশ করছে সেগুলো আশে-পাশে কোথাও পাওয়া যায় না। গোটা দেশে হাতে গোনা পাঁচ সাতটি স্থানে এসব বই পাওয়া যায়। সেগুলোরই একটার উদ্দেশ্যে রেজা রওয়ানা হয়ে যায়। প্রায় এক-দেড়শো কিলো পথ। ট্রেনে চেপে ঘন্টা কয়েক সফরের পর রেজা গন্তব্যস্থলে পৌঁছালো। অনেক বড় দোকান। বইয়ের কাটুনগুলো একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে সাজানো। রেজা দেখলো কয়েকজন ক্রেতা দোকানটিতে ভীড় করে আছে। পোশাক-আশাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। কেউ হয়তো মওলানা পড়ছে কেউ মুফতী পড়ছে। তাদের মধ্যে কেউ আবার মাদ্রাসার শিক্ষকও হতে পারে। বয়স দেখে এদের ক্লাস নির্ণয় করা কঠিন।

বইয়ের লিস্টটা দোকানদারের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি কয়েক বান্ডিল বই নামিয়ে

ফেললেন। প্রায় বিশ হাজার টাকার বই। এতগুলো বই দেখে পাশের সবাই রেজার দিকে তাকায়। একজন বলে,

- সব আরবী? উর্দু নেই?

দোকানদার তার উত্তরে বলে,

- সবই আরবী।

সেই লোকটি এবার রেজার দিকে তাকিয়ে বলে,

- আপনার নাম কি?

রেজা স্বাভাবিক ভাবে বলে,

- রেজাউল করীম

লোকটা যেনো কিছুটা বিস্মিত হলো,

- নামের আগে মওলানা, মুফতী এসব কিছু নেই?

রেজা মাথা নাড়ে। প্রচলিত অর্থে সে মওলানা মুফতী নয়। রেজাকে না করতে দেখে লোকটা কিছুটা হতাশ হয়। একটা বই হাতে তুলে নিয়ে স্বয়ংক্রীয়ভাবে সেটা পড়তে শুরু করে। কিন্তু বিসমিল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত পড়ে থেমে যায়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরের কথাগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে না। মনে মনে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর লোকটা রেজার দিকে তাকিয়ে বইটি তার হাতে তুলে দিতে

দিতে বলে,

- এসব বইয়ের ইবারত উঠাতে পারেন?

রেজা বইটা হাতে গ্রহণ করে বলে,

- কিছু কিছু পারি।

লোকটা বেশ কৌতুহলী হয়ে ওঠে। বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে,

- একটু পড়েন তো।

একটু নয় এক দমে রেজা বেশ খানিকটা পড়ে ফেলে। তার পড়া দেখে উপস্থিত সবার চোখ কপালে উঠে যায়। ডান দিক থেকে একজন বলে,

- আপনার পড়াশুনা কতদূর?

- দশ কিলো।

কথাটা বলে রেজা মুচকি হাসে কিন্তু উপস্থিত কেউ হাসে না। কৌতুকের অর্থ না বুঝলে হাসি আসে না। তারা সবাই কৌতুহলী হয়ে বলে,

- দশ কিলো মানে?

- আমার বাড়ি থেকে দশ কিলো দূরে একটা মাদ্রাসায় হেফজী পড়েছি।

এবার দু একজন খানিকটা শব্দ করে হেসে ওঠে। প্রথম ব্যক্তিটি বলে,

- শেষ করেছেন?

রেজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় আর মুখে বলে,

- আলহামদুলিল্লাহ।

- তাহলে তো আপনি হাফেজ মানে হাফেজ রেজাউল করীম। নিজের নামের আগে হাফেজ শব্দটাতো অন্তত বলবেন।

কথাটা শুনে রেজার খুব মন খারাপ হয়। একজন মানুষ নিজেই নিজেকে কীভাবে মওলানা মুফতী ইত্যাদি নামে পরিচয় দেয় সেটা সে বুঝতে পারে না। মনে মনে সে ভীষণ রেগে যায় কিন্তু নিজেকে শান্ত করে নরম গলায় বলে,

- এটাই হলো, আমাদের মূল সমস্যা। যে যতটুকু ইলম হাসিল করি মানুষকে সেটা শোনানোর চেষ্টা করি। আল-হাজ্জ, মুফতী, মাওলানা, হাফেজ, ক্বারী নিজের নামের আগে নিজেই এসব যোগ করে বড়াই করি। এভাবে ইলমের বরকত উঠে যাচ্ছে। আলেমদের সম্মান কমে যাচ্ছে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেকে ছোট করে তাকে আল্লাহ বড় করেন। আর আমরা নিজেকে নিজে বড় মনে করছি বিধায় ছোট হয়ে যাচ্ছি।

উপস্থিত সবাই রেজার কথা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ

করেছে বলেই মনে হলো। একজন তো বলেই ফেললো,

- হযরত খুবই ঠিক কথা বলেছেন। আমরা ইলম অর্জনের চেয়ে পদবী অর্জনের দিকে মন দিচ্ছি বেশি। বেশির ভাগ যারা ইফতা পড়ে তারা ইফতা শেষ করার আগেই নিজেকে মুফতী বলে পরিচয় দেয়। এসব ঠিক নয়।

তার কথা শুনে রেজার খুব ভাল লাগে। মুচকি হেসে বলে,

- আপনার নাম কি?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে লোকটি বলে,

- মুফতী আজগর। হাশেমিয়্যাহ মাদ্রাসায় ইফতা করছি।

এই লোকটিও নিজের নামের আগে মুফতী শব্দ ব্যবহার করছে দেখে রেজা একটু অবাক হয়। এই প্রথম সে বুঝতে পারে সাধারন মানুষের ভুল শোধরানো সহজ কিন্তু মুফতী মুহাদ্দীসরা কোনো ভুল কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদের ফেরানো কঠিন। রেজাকে নিরব দেখে লোকটা আবার বলে,

- হাশেমিয়্যা মাদ্রাসার নাম শোনেন নি? অনেক বড় মাদ্রাসা, দেশের জাদরেল সব মুফতী মুহাদ্দিসরা সেখানে দারস দেয়।

কথাটা শুনে রেজা কিছুটা কৌতুহলী হয়ে ওঠে। এই সুযোগে বড় বড় মুফতী মুহাদ্দিসদের সাথে একটা সাক্ষাত করলে মন্দ হয় না। একটু উৎসাহী হয়ে বলে,

- এখান থেকে কতদূর?

- কাছেই, দু-তিন কিলো হবে। সাথে সাথেই লোকটা উত্তর দেয়,

বিষয়টা কিভাবে উপস্থাপণ করবে রেজা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলে,

- আপনাদের মুফতী মুহাদ্দিসরা নিশ্চয় অনেক জ্ঞানী? কি বলেন?

প্রশ্নটা শুনে আজগর নামের লোকটা যেনো একটু বিস্মিত হলো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল হাশেমিয়া মাদ্রাসার মুফতী মুহাদ্দিসরা জ্ঞানী কিনা এটা প্রশ্ন করাও পাপ। কণ্ঠে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলে,

- কি যে বলেন! শুধু কি জ্ঞানী তারা হলেন জ্ঞানের খনি। একদিকে তারা জাহেরী শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী অন্য দিকে তাদের আছে ইলমে লাদুন্নী আর কাশফে রব্বানী যাকে বলে বাতেনী জ্ঞান।

রেজা অবাক হয়ে বলে,

- বাতেনী জ্ঞান! এটা আবার কী?

- বাতেনী জ্ঞান মানে কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। কুরআন হাদীসে নেই এমন অনেক বিষয় তারা কাশফের জোরে জানতে পারেন।

কাশফ-ইলহামের কথা রেজা আগেও শুনেছে। অনেক সময় মনের মধ্যে হঠাৎ কোনো বিষয় উদিত হয়। হয়তো বাসে উঠতে গিয়ে মনে হলো কি যেনো বিপদ হবে তাই উঠলো না পরে দেখা গেলো ঐ বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেও হতে পারে, নিজের অন্তরের স্বাভাবিক চিন্তাও হতে পারে। তাই কখনও এটা ঠিক হয় কখনও ভুল হয়। কাশফ-ইলহাম নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নয়। এটা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদও নয়। যে কারও মনের মধ্যে এমন ধারনা উদয় হতে পারে। কিন্তু কিছু লোক নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কাশফ-ইলহামকে ব্যবহার করে। তারা এগুলোকে নিশ্চিত জ্ঞান মনে করে। এমনকি কাশফ ইলহামের উপর নির্ভর করে জাল হাদীসকে সহীহ করে ছাড়ে। একজন মওলানা একবার বললেন, পৃথিবীটা চল্লিশজন আবদাল, কয়েকজন কুতুব আর একজন গাওছ মিলে পরিচালনা করছে। রেজা তাকে জিজ্ঞাসা করে, দলিল কি? সাথে সাথেই তিনি বলেন, বুযুর্গরা এটা কাশফের মাধ্যমে জেনেছেন। এসব হাস্যকর কাহিনী রেজা অনেক শুনেছে। তাই হাশিমিয়া মাদ্রাসার

মুফতী মুহাদ্দিসরা কাশফের মাধ্যমে কি ধরণের তথ্য আবিষ্কার করেন রেজা সেটা অনুমান করতে পারে। তবু একটু কৌতুহলী হয়ে বলে,

- যেমন?

লোকটির কথা শুনে মনে হচ্ছিল তাদের উস্তাদরা হর হামেশা কাশফ ইলহামের খেল দেখিয়ে থাকেন। অতএব দু পাঁচটা উদাহরণ উল্লেখ করে দিতে তার সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেলো ব্যাপারটা খুব সহজ হলো না। রেজাকে শোনানোর মতো একটা উদাহরণ জোগাড় করতে তার বেশ কিছুটা সময় লাগলো। বেশ খানিক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর বলল,

- একবার মুফতী হুজুরের কাছে এক ছাত্র প্রশ্ন করল, ইব্রাহীম (আঃ) এর চাচার নাম কি?

এধরণের প্রশ্ন শুনে অন্য যে কেউ রেগে যেতো কিন্তু আমাদের মুফতী হুজুর মোটেও রাগ করলেন না। একটু মুচকী হেসে বললেন,

- দেখো বাবা এটা কিতাব-পত্রে আসে নি। যদি আমাকে বলতে হয় তবে ইলহাম থেকে বলতে হবে।

আমরা সবাই একত্রে হুজুরের নিকট আবদার করলে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকেন। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন,

- গাজর।

আমরা ভাবলাম হুজুর হয়তো গাজর খাবেন। কয়েক জন ছাত্র এদিক সেদিক দৌঁড়ে চলে গেলো। কেউ গেলো, মাদ্রাসার পাক ঘরের দিকে, কেউ গেলো বাজারের দিকে। দ্রুত তারা কয়েকটা গাজর নিয়ে হাজির হলো। হুজুর চোখ খুলেই তার সামনে কয়েকটা গাজর দেখে অবাক হয়ে বললেন,

- এসব কি?

একজন ছাত্র বিনীত ভাবে বলল,

- হুজুর আপনি বললেন, গাজর। আমরা ভাবলাম আপনি গাজর খাবেন। তাই এগুলো নিয়ে আসলাম।

কথাটা শুনে হুজুর শব্দ করে হেসে বললেন,

- আরে পাগল, আমি কি দারসের মজলিসে গাজর খায়? গাজর হলো ইব্রাহীম (আঃ) এর চাচার নাম।

'গাজর' নামটা শুনেই রেজার দুঠোঁট বাঁকা হয়ে যায়। মুচকি হেসে সে বলে,

- দুনিয়ায় হাজার হাজার সুস্বাদু ফল-মুল থাকতে গাজর কেনো?

তার মুখের ভাবে মুফতী আজগর বুঝতে পারে কাহিনীটা তার বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। তাকে বিশ্বাস

করানোর জন্য বলে,

- এ বিষয়ে হুজুর যে যুক্তি দেখালেন, সেটা শুনলে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন নামটা সঠিক। হুজুর বললেন, পবিত্র কুরআনে এসেছে ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার নাম আজর ভাইয়ে ভাইয়ে নামের মিল থাকে। এই যেমন ধরুন, আজিবরের ভাই তজিবার। এই হিসেবে আজরের ভাই গাজর। এবার বুঝেছেন তো?

যুক্তিটা শুনে রেজা হালকা হেসে বলে,

- এটা তো কাশফ-ইলহাম হলো না। এটা হলো কিয়াস। তাও আবার কিয়াসে মুখালেফ। মানে অযৌক্তিক কিয়াস।

আজগর নামের লোকটা যেনো চমকে উঠলো,

- কেনো? কিয়াসে মুখালেফ হবে কেনো?

- কেনো আবার। আজিবরের ভাই যদি তজিবার হয় তাহলে আজরের ভাই হবে তাজর, গাজর নয়।

কথাটা বলে রেজা আবারও হেসে ওঠে। তার সাথে তাল মিলিয়ে মুফতী আজগরও বোকার মতো হাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারে তার হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। তখন মুখটা শক্ত করে বলে,

- হুজুরের অনেক জ্ঞান। আপনি নিজে কথা বললেই বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল।

মুখের হাসিটাকে ধরে রেখেই রেজা বলে,

- কত ধানে কত চাল এটা কৃষকদের কাজ, মুফতীর কাজ হলো কত ধানে কত ওশর তা নির্ণয় করা।

মুফতি আজগর মুখটা গম্ভীর করে বলে,

- ওশর যাকাত সব হিসাবই পাবেন। একবার মাদ্রাসায় চলুন না।

এই কথাটা রেজার বেশ পছন্দ হয়। মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্যই তো সে এতক্ষণ কথা চালিয়ে যাচ্ছে। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলে,

- বইগুলো আলাদা করে বেঁধে রাখুন আমি এসে নিয়ে যাবো।

কথাটা বলেই মুফতী আজগরকে বলে,

- চলুন তাহলে। এখনই একটু ঘুরে আসি।

কোনো কথা না বলে আজগর নামের লোকটি রেজাকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। একটা রিকশা যোগে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটা পাঁচ তলা ভবনের নিকটে এসে পৌঁছালো। ভবনটির সামনে বড় করে লেখা, "জামিয়া হাশেমিয়া"। মাদ্রাসার প্রশস্ত প্রাঙ্গন আর বিশাল ভবন দেখে রেজা নিঃসন্দেহ হলো যে, এটা একটা বড় মাদ্রাসা। চারিদিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,

- বাহ্! বেশ বড় তো!

কথাটা শুনে মুফতী আজগর গর্ব অনুভব করে। উৎসাহ নিয়ে বলে,

- ভিতরে ঢুকলে আরও অবাক হবেন।

ভিতরে ঢুকে রেজা সত্যিই অবাক হলো। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো মাদ্রাসার লাইব্রেরীটি দেখে। আরবী, উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় কত যে বই সেখানে আছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। রেজা খুঁজে খুঁজে দেখলো তার কাছে যেসব বই আছে তার সবই এখানে আছে। সেগুলো ছাড়াও আরও অনেক বই আছে। এসব দেখে তার মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেলো। সে ভাবলো, এখানে নিশ্চয় সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে। এতগুলো মুফতী মওলানার মধ্যে এমন একজনকে সে অবশ্যই পাবে যে বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলিমদের দুরাবস্থা নিয়ে চিন্তিত। তিনিই হয়তো পারবেন দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে ইমাম মেহেদীর বাহিনী গঠনে করতে। যাদের এত জ্ঞান তারা না পারলে আর কে পারবে!

লাইব্রেরী দেখে রেজার তাক লেগে গিয়েছে দেখে মুফতী আজগর রেজাকে আরও কিছু দেখানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। চোখে মুখে উত্তেজনা ফুটিয়ে বলল,

- তিন তলাতে আজ একটা বাহাছ আছে। যাবেন সেখানে?

প্রচলিত অর্থে ‘বাহাছ’ মানে তর্ক-বিতর্ক। দু’পা দিয়ে ঠেলে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। এতে শেষ পর্যন্ত এমনকি মারামারি খুনোখুনিও হয়। রেজাদের এলাকায় মাজহাবী আর লা-মাযহাবীরা একবার বাহাছ করে কী বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়েছিল সেটা রেজার চোখে ভেসে ওঠে। একজন নিহত হয়েছিল আর বাকীরা হামলা-মামলার ভয়ে ঘর ছাড়া হয়েছিল। বিতর্ক দেখলেই তাই রেজা সতর্ক হয়ে যায়। একটু অনীহা প্রকাশ করে বলে,

- কাদের সাথে বাহাছ?

- নিজেরা, নিজেরা। স্কুল কলেজে বিতর্ক অনুষ্ঠান হয় দেখেন না। মাদ্রাসার ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করে একটা বিষয়ের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠান করা হয়।

রেজার প্রাণটা যেনো ধড়ে ফিরে আসে। বুকের ভিতর চেপে রাখা নিশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে বলে,

- ও এই ব্যাপার? তার মানে এটা আসল বাহাছ নয়, প্রতীকী বাহাছ।

মুফতী আজগর মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে। মাদ্রাসার ছাত্রদের বিতর্ক দেখার জন্য রেজার মনটাও

আগ্রহী হয়ে ওঠে। রেজা সম্মতি প্রকাশ করার সাথে সাথেই মুফতী আজগর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্রুত রেজাকে নিয়ে তিন তলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখা গেলো বাহাছ শুরু হয়ে গেছে। দুইপ্রান্তে দুটি দল একে অপরের মুখোমুখি বসেছে। মাঝখানে দু-তিনজন বয়ষ্ক ব্যক্তি বসে আছেন। তারা হয়তো এই মাদ্রাসার শিক্ষক এখানে বিচারক হিসেবে আছেন। বিতর্কের দুটি দল যেসব কিতাবাদি সাথে নিয়ে বসেছে তাতে মনে হচ্ছে এই বাহাছ শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। এসব আয়োজন দেখে রেজা ভাবে এরা নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। আলোচনার বিষয় কি হতে পারে সেটা নিয়ে সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। প্রথমে তার মনে হয় হয়তো ঈমান কিভাবে আনে কিভাবে ভাঙে এসব বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে অথবা নামায-রোজা হজ্জ-যাকাত এসব ফরজ বিষয়ের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। হঠাৎ তার কানে আসে ডান দিক থেকে একজন ছাত্র বলছে,

- আমরা সবাই জানি আল্লাহর রাসুলের সাহাবারা জিহাদ করতো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে রাসুলের যুগে প্রায় প্রতিবছরই দুএকটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হতো। ছোটখাট যুদ্ধের তো কোনো হিসাবই নেই।

এতদূর শুনেই রেজার মনটা যেনো আবেগে উত্তেলিত হয়ে ওঠে। এরা তো জিহাদের আলোচনা করছে। তবে কি এসব আলেম ওলামারা জিহাদের জন্য বাহিনী তৈরী করছে। এরাই কি তবে জিহাদ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। এরাই কি তবে ইমাম মাহদীর জন্য রাস্তা প্রস্তুত করবে। যদি তাই হয় তবে রেজা আজই এদের সাথে যোগ দেবে। তাদের হাতে বায়াত হবে। তাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে দাজ্জালের বাহিনীর সাথে লড়াই করবে। রেজার মনে হয়, এই মজলিসে হাজির হতে পেরে সে ভাগ্যবান। সে খুব মনোযোগ দিয়ে বক্তার কথাগুলো শুনতে থাকে। বক্তা বলেই চলেছে,

- বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধের কথা আমরা সবাই জানি। এক কথায় বলা যায়, রাসুলের যুগে সব সময় যুদ্ধ লেগে থাকতো। যুদ্ধে তখন ঘোড়া ব্যবহার করা হতো। ফাড়া পাঞ্জাবী ছেড়ে চারিদিকে ঘেরা জোব্বা পরে থাকলে ঘোড়ায় ওঠা নামা করা সম্ভব নয়। এটা প্রমাণ করে সাহাবারা সব সময় ফাড়া পাঞ্চাবী পরে থাকতেন।

আলোচনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে রেজার বুঝতে কষ্ট হয়। সে ভাবে, বক্তা বলতে চাচ্ছেন, সাহাবারা জিহাদে ফাড়া পাঞ্জাবী পরে থাকতেন। অতএব, জিহাদে গেলে আমাদেরও ফাড়া পাঞ্জাবী পড়তে হবে। রেজার মনে

হয়, এখানে যারা জিহাদে নাম লিখাতে চায় তাদের সবাইকে ফাড়া পাঞ্জাবী পরতে হবে। ফাড়া পাঞ্জাবী না পরলে কাউকে এ দলে নাম লেখানো হবে না। রেজা অনেকটা স্বয়ংক্রীয়ভাবে নিজের পাঞ্জাবীটির দিকে তাকায়। সে চারিদিকে ঘেরা একটা জোব্বা পরে আছে। তার মনটা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে যায়। তবে কি তার জিহাদ করা হবে না! সে নিজেকে শান্তনা দেয়। প্রয়োজনে পাশের দর্জির দোকান থেকে পাঞ্জাবীটা সে এখনই ফেড়ে আনবে। জিহাদে যাওয়ার জন্য সে অনেক কিছু করতে পারে।

ততক্ষণে অন্য পক্ষের বক্তা আলোচনা শুরু করেছেন।

- কিতাবে এসেছে, যাকারিয়া (আঃ) কে যখন কাফিররা হত্যা করতে চেয়েছিল তখন তিনি একটা গাছকে বলেন, ফেঁড়ে যাও। গাছটি ফেঁড়ে গেলে তিনি তার ভিতরে ঢুকে পড়েন। সাথে সাথে গাছটি আবার জোড়া লেগে যায়। কিন্তু যাকারিয়া (আঃ) ফাঁড়া পাঞ্জাবী পরে থাকার কারণে পাঞ্জাবীর একটি কোনা বাইরে থেকে যায়। ফলে কাফিররা সেটা দেখে ফেলে আর গাছটিকে করাত দিয়ে চিঁরে ফেলে। এ কারণে আমাদের ফাঁড়া পাঞ্চাবী পরা উচিৎ নয়।

এই কাহিনীটি সত্য কিনা সে বিষয়ে রেজার অনেক

সন্দেহ রয়েছে কিন্তু তার মনে হয় বক্তার যুক্তিটা হয়তো কিছুটা হলেও সঠিক। ফাড়া পাঞ্জাবীর অনেকখানি লেজ বের হয়ে থাকে। জিহাদের ময়দানে চেড়া পাঞ্জাবী পরে গেলে কখনও যদি লুকানোর দরকার হয় তবে পুরা পোশাকটি সতর্কতার সাথে গুটিয়ে না নিলে ধরা পরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে জিহাদে যাওয়ার আগে এসব ছোট-খাট বিষয় নিয়ে এত বেশি চিন্তিত হওয়ার কারণ কি সেটা রেজা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে ভাবে,

- জিহাদের ময়দানে পাঞ্জাবী পরতেই হবে এটা তো জরুরী নয়। জামা-গেঞ্জী একটা পরে নিলেই হলো। যদি তাও না জোটে তবে খালি গায়েই বের হয়ে পড়তে হবে। শহীদ হয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর জোব্বা বা ফাড়া পাঞ্জাবী একটা পরে নিলেই হবে।

এখনও পর্যন্ত রেজা মনে করছে এখানে জিহাদের আলোচনা চলছে। কিন্তু বক্তার পরের কথাগুলো শুনে রেজার ভুল ভাঙলো। তিনি বলছিলেন,

- আমি একদিন মহল্লার মসজিদে নামায পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার লুঙ্গীটা ছিড়ে গেলো। সেদিন যদি আমি ফাড়া পাঞ্জাবী পরে থাকতাম তাহলে আমার সতর আলগা হয়ে যেতো। জোব্বা পরে থাকার কারণে আমি

সেদিন বেইজ্জতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। যে জুব্বা দুনিয়াতে বেইজ্জতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে আশা করি আখিরাতেও রক্ষা করবে। আপনার সবাই সব সময় জোব্বা পরিধান করবেন। জোব্বা হলো বুযুর্গদের পোশাক। ফাড়া পাঞ্জাবী পরিত্যাগ করবেন।

কথাটি শুনেই প্রতিপক্ষের একজন বলে ওঠে,

- যারা যাকাতের লুঙ্গি পরে নামায পড়ে তারা আপনার কথা মতো জোব্বা পরতে পারে কিন্তু আমরা নিজের টাকায় লুঙ্গি কিনে পরি। আমাদের ফাঁড়া পাঞ্জাবী পরলে সমস্যা নেই।

এবার মসলিসের সবাই হেসে ওঠে। রেজা কিন্তু হাসে না। এই সতর ঢাকার কাহিনীটি রেজার মনের ভিতর জট পাকিয়ে দেয়। তার কাছে মনে হয়, সে যা ভেবেছে আলোচনা আসলে সে বিষয়ে নয়। মুফতী আজগর পাশেই বসে ছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছিল। তার দিকে তাকিয়ে রেজা বলে,

- আলোচনার বিষয়বস্তু কি?

মুখরোচক আলোচনাতে ছেদ পড়ার কারণে আজগর সাহেব বেশ বিরক্ত হলো বলে মনে হয়। মোটা গলায় বলে,

- আলোচনা হচ্ছে, ফাড়া পাঞ্জাবী বনাম ঘেরা জোব্বা। এদুটির কোনটি পরিধান করা আফজাল তা নিয়ে।

কথাটা শুনামাত্র রেজা আসল ব্যাপার বুঝতে পারে তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বলে,

- এটা জিহাদের আলোচনা নয়?

কথাটা শুনে মুফতী আজগর অজগর সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে কয়েকবার হেসে বলে,

- এখানে আপনি জিহাদ কোথায় পেলেন? আপনি তো খুব বোকা।

রেজার মনে হয় সত্যিই সে বোকা। একদল আলেম-ওলামা এক ট্রাক বই নিয়ে বসে পাঞ্জাবী ফাড়া হবে না ঘেরা হবে এমন একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বাহাছ করার মতো হাস্যকর কাজ করতে পারে সেটা যে বুঝতে পারে নি। এটাই তার বোকামী। রেজার একটা কথা মনে পড়ে যায়। শায়েখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রহঃ) সূরা তাওবার তাফসীরে লিখেছেন, দুর্ধর্ষ তাতার যোদ্ধারা ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করতো। তারা মুসলিমদের হত্যা করতো, তাদের দ্বীন ও সম্পদ ধ্বংস করতো। স্বার্থান্বেসী ওলামা-মাশায়েখরা সে সময় তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তুচ্ছ বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক

করতো। এমনকি তাতাররা যখন বাগদাদের প্রাচীরে আঘাত হানছিল। বাগদাদের আলেমরা তখন আলোচনা করছিল, যদি কখনও কোনো মহিলার দাড়ি গজায় তবে সে তা কাটতে পারবে কিনা। আলেমরা যে এমন অবিবেচকের মতো কাজ করতে পারে রেজা এতদিন তা বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এখন রেজার মনে হচ্ছে এটা সম্ভব। বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলিমদের যে দুরাবস্থা সেটা কারও অজানা নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা। ইসলামী বিধি-বিধান পালনে বাধা সৃষ্টি করা। মুসলিমদের দেশে কাফিরদের আইন-কানুন ও রসম রেওয়াজ চালু করা। এসব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাঞ্জাবীর সেলাই, টুপির ভাজ বা পাগড়ির দৈর্ঘ্য নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাটা হুবহু একই ব্যাপার। দুঃখে কষ্টে রেজার মনটা হাহাকার করে ওঠে। ঠিক তখনই সে আজগরের গলা শুনতে পায়,

- এই দেখো, চেড়া পাঞ্জাবী জিতে গেলো! কুরআন-হাদিসের মোকাবিলায় কেবল ছেড়া লুঙ্গির দোহাই দিয়ে কি আর পার পাওয়া যায়!

কুরআন হাদীস থেকে চেড়া পাঞ্জাবীর পক্ষে কি দলীল পাওয়া গেলো রেজা সেটা বুঝতে পারে না। মুফতী আজগরকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে,

- কেনো দেখলেন না। কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহর রাসুল আর তার সাহাবারা সব সময় জিহাদ করতেন। জিহাদে তো তারা ঘোড়া ব্যবহার করতেন। জোব্বা গায়ে দিয়ে কি আর ঘোড়ায় ওঠা যায়! তাই বোঝা গেলো তারা ফাঁড়া পাঞ্জাবী ব্যবহার করতেন।

মুফতী আজগর ভেবেছিল কথাটা শুনে রেজা খুব মজা পাবে কিন্তু দেখা গেলো সে মোটেও মজা পেল না। উল্টো একটু বিরক্ত হয়ে বলল,

- উদ্ভট যুক্তি!

কথাটা শুনে মুফতী আজগরের দারুণ রাগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে তার মনের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হয়। একটু উৎসাহী হয়ে বলে,

- কেনো?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেজা উত্তর দেয়,

- যুদ্ধের সময় সাহাবারা আদৌ পাঞ্জাবী পরতেন কি না এর দলীল কি? তারা তো ছোট পোশাক পরে বা এমনকি খালি গাঁয়েও যুদ্ধে যেতে পারেন।

কথাটা শুনে আজগর আলী যেনো আকাশ থেকে পড়লো। সাহাবায়ে কিরাম ছোট পোশাক পরে বা খালি গাঁয়ে যুদ্ধ করছে এটা সে কল্পণাও করতে পারে না। রেজার কথার উপর তাই সে ভীষণ আপত্তি উত্থাপন

করে,

- সাহাবারা থাকবে খালি গায়ে!

রেজা তাকে আশ্বস্ত করে,

- হযরত হানজালা (রাঃ) জিহাদের ডাক শোনার সাথে সাথেই ফরজ গোসল না করেই জিহাদে চলে গিয়েছিলেন এবং শহিদ হয়েছিলেন। পরে ফেরেস্তারা তাকে গোসল দিয়েছেন তাই তাকে বলা হয় গসীলুল মালাইকা। এ কাহিনী জানেন?

আজগর মাথা নাড়ে। এ কাহিণী সে বহু শুনেছে। ওয়াজের মাঠে বক্তারা সুযোগ পেলেই এসব কাহিনী শোনায়। রেজা বলতে থাকে,

- ফরজ গোসল ছাড়া যদি জিহাদে যাওয়া যায় তবে খালি গায়ে গেলে ক্ষতি কি? আসল কথা হলো, জিহাদ খুব বড় ইবাদত। জিহাদে যাওয়ার সুযোগ পেলে অত খুটি-নাটি বিষয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট না করে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

রেজার কথা শুনে মুফতী আজগর প্রভাবিত হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই হঠাৎ বলে ওঠে,

- ঠিক।

কথাটা সে খুব বেশি জোরে বলেনি। তবে পাশেই বসে থাকা বিচারকমন্ডলীর কান পর্যন্ত কথাটি পৌছে যায়।

তারা রেজাদের দিকে তাকিয়ে বলেন,

- কি হলো?

মুফতী আজগর তড়িঘড়ি করে বলে,

- হুজুর, এই ছেলেটা কি যেনো বলছে। একটু শুনুন না।

রেজা লক্ষ্য করে উপস্থিত সবাই তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মাদ্রাসার যে কজন মুফতী মুহাদ্দিস এই বাহাছে বিচারক হিসেবে হাজির ছিলেন। তারাও রেজাকে এক পলকে লক্ষ্য করছেন। সে কি বলতে চায় সেটা শোনার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কথা বলার এটাই সঠিক সময়। এই সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে মনে মনে সে আল্লাহর প্রসংশা করে আর মুফতী আজগরকে ধন্যবাদ দেয়। কিভাবে কথা শুরু করা যায় রেজা কিছুক্ষণ ধরে সেটা ভাবে। টুপি-পাঞ্জাবী নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে তাই সরাসরি প্রসঙ্গে কথা শুরু করাই অধিক সঙ্গত মনে হয় তার কাছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে আমতা আমতা করে বলে,

- আপনারা অনুমতি দিলে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে দু একজন মাথা নেড়ে

সম্মতি জানালে রেজা বলে,

- খলীফা কাকে বলে?

প্রশ্নটা শুনে সবাই বেশ অবাক হলো বলে মনে হয়। খলীফা শব্দটি তাদের নিকট খুবই পরিচিত কিন্তু খলীফা কাকে বলে এমন প্রশ্ন তো কেউ করে না। পাশ থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন,

- এই যে, মুফতী সাহেব।

কথাটি বলে রেজার দিকে ইশারা করেন। অর্থাৎ মুফতী সাহেবকে রেজার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছেন। মুফতী সাহেব সামান্য চিন্তা করে বললেন,

- খলীফা মানে প্রতিনিধি।

এ ধরণের উত্তর রেজা আশা করেনি। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে সে বলে,

- এটা তো হলো শাব্দিক অর্থ। আমি জানতে চাইছি, খলীফার সংজ্ঞা। মানে- খলীফা বলতে আমরা কি বুঝবো? শরীয়তের পরিভাষায় খলীফা কাকে বলে?

মুফতী সাহেব বেশ খানিকটা নিরব থাকেন। মনে হচ্ছে বিষয়টা তার কাছে খুব জটিল মনে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,

- আবু বকর, উমর, উসমান আর আলী এই চারজনকে

খলীফা বলে।

কথাটা সঠিক তবে এটা রেজার প্রশ্নের উত্তর নয়। এখানে একটা গোলমাল আছে। রেজার মনে পড়ে যায়। ছোট বেলায় মাদ্রাসার এক শিক্ষক তাদের আরবী-বাংলা পড়া শেখাতেন। বইতে লেখা ছিল, “অ-তে অন্ধ- অন্ধকে রাস্তা দেখাও”। একদিন হঠাৎ হুজুর প্রশ্ন করেন,

- বলো তো অন্ধ কাকে বলে।

কেউ কোনো উত্তর দিল না। দিনের পর দিন তারা অন্ধকে রাস্তা দেখানোর দীক্ষা নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্ধ কাকে বলে সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথমে রেজাও বিষয়টা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ তার মনে পড়ে হুজুরের আব্বা দুচোখে দেখতে পারে না। সারা এলাকার লোক তার কাছে তাবীজ করতে আসে। সবাই তাকে বলে অন্ধ হুজুর। কথাটা মনে হতেই রেজা বলে,

- হুজুর আপনার আব্বাকে অন্ধ বলে।

কথাটা শুনেই হুজুর ভীষণ রেগে গেলেন। হাতের বেতটি দিয়ে সপাৎ সপাৎ করে দু তিন ঘা রেজার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলেন,

- সারা দুনিয়ায় অন্ধ কি শুধু আমার আব্বা। আর

কোনো অন্ধ নেই?

এরপর তিনি বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,

- যে চোখে দেখে না সেই অন্ধ। এইটা হলো সংজ্ঞা আর আমার আব্বা হলেন একটা উদাহরণ মাত্র। সংজ্ঞাটি বললে সব অন্ধের পরিচয় পাওয়া যাবে আর উদাহরণ বললে কেবল নির্দিষ্ট কিছু অন্ধের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সেদিন রেজা যে ভুল করেছিল আজ মুফতী হুজুর সেই একই ভুল করছেন। খলীফার সংজ্ঞা কি সেটা না বলে তিনি চার খলীফার উদাহরণ পেশ করেছেন। কিন্তু ঐ চারজন ছাড়াও অনেক খলীফা পৃথিবীতে আসবে। হুজুরের কথার মধ্যে কেবল চার খলীফার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আর কোনো খলীফা সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। রেজা হুজুরকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করে,

- এই চারজন ছাড়া অন্য কোনো খলীফা কি পৃথিবীতে আসবে না?

- হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে না কেনো? ইমাম মেহেদী আসবেন।

উত্তরটি শুনে রেজা খুশি হতে পারে না। তৎক্ষনাৎ বলে,

- ইমাম মেহেদীর আগে কোনো খলীফা আসতে পারে

কিনা?

মুফতী হুজুর প্রায় সাথে সাথেই বলে ওঠেন,

- না, না। চার খলীফার পরে ইমাম মাহদী ছাড়া আর কোনো খলীফা আসবে না।

রেজা যেনো খেই হারিয়ে ফেলে। কীভাবে বিষয়টা হুজুরকে বোঝানো যায় সেটা নিয়ে কিছুক্ষন ভাবে। তারপর বলে,

- রসুল (সঃ) বলেছেন কিয়ামতের আগে কমপক্ষে বারো জন খলীফা আসবে। আপনার হিসেবে তো খলীফা হচ্ছে পাঁচ জন। চার খলীফা আর ইমাম মেহেদী। সাত জনই বাকী থেকে যাচ্ছে। এতে বোঝা যায় চার খলীফা এবং ইমাম মেহেদী ছাড়াও আরও অনেক খলীফা পৃথিবীতে আসবে। এদের সবার নামের লিস্ট হাদীসে বলে দেওয়া হয় নি। অতএব নাম দেখে তাদের চেনা যাবে না, চিনতে হবে কাজ দেখে। আমার প্রশ্ন হলো, খলীফার কাজ কি? খলীফা বলতে আমরা কাকে বুঝবো এবং কাকে খলীফা মনে করবো?

মুফতী হুজুর কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। তিনি কিছু বলার আগেই পাশ থেকে আরেকজন হুজুর তার দিকে তাকিয়ে বলেন,

- আমি কিছু কথা বলি।

মুফতী হুজুর তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হলেন বলে মনে হয়। আলোচনার দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে অর্পণ করে তিনি পুরো চুপ হয়ে গেলেন। পরের জন বলতে শুরু করে,

- আলা মিনহাজিন নুবুওয়া তথা নবীর তরীকা অনুযায়ী যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাকেই বলা হয় খলীফা।

কথাটা শুনে রেজা ভীষণ খুশি হয়ে যায়। আসলে এই উত্তরটিই সে তালাশ করছে। যদি কাউকে বলা হয় নামায কাকে বলে তবে এমন বলা কখনও সঠিক নয় যে, নামাজ মানে প্রার্থনা। যেহেতু এখানে নামাজের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় নি বরং সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে এটা বলাও সঠিক নয় যে, ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে নামাজ বলে। যেহেতু এগুলো নামাজের উদাহরণ, সংজ্ঞা নয়। বরং এর সঠিক উত্তর হলো, নামায হলো এমন একটা ইবাদত যা তাকবীর দিয়ে শুরু করতে হয় সালাম দিয়ে শেষ করতে হয়। এটা হলো সংজ্ঞা। এর পর উদাহরণ হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তাহাজ্জুদ নামায বা জানাযার নামাযের কথা বলা যেতে পারে। চার খলীফা হলেন খলীফার উদাহরণ, সংজ্ঞা নয়। খলীফার সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এমন একজন

শাসক। তবে সেই সাথে খলীফার আরেকটি গুণ হলো তিনি বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিমের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। একারণে পৃথিবীর বুকে একই সাথে দুটি খলীফা থাকা বৈধ নয়। দল, মত, দেশ ও জাতির উর্ধ্বে সারা বিশ্বের মুসলিমকে একই নেতার অধীনে এক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই খলীফার কাজ। যিনি বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের দাবী করেন না, তিনি কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচলানা করলেও খলীফা হিসেবে গণ্য হবেন না। তাকে নেককার শাসক বা সুলতান বলা যায়। সারা বিশ্বের মুসলিমদের এক খলীফার অধীনে একতাবদ্ধ হওয়াটা ফরজ। কিন্তু মুসলিমরা এখন এটা ভুলে গেছে। বড় বড় মুফতী মুহাদ্দিসরাও খলীফা কাকে বলে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না। কেউ কেউ অবশ্য বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন। তাদের মধ্যে হাশেমিয়া মাদ্রাসার এই শিক্ষকও রয়েছেন। এই শিক্ষকের প্রতি রেজার শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। তবে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক মাসয়ালা আছে যে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা থাকা দরকার। এই শিক্ষককে সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করা দরকার। তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রেজা বলে,

- একই যুগে কি একাধিক খলীফা থাকা বৈধ?

কথাটা শুনে মুফতী হুজুর বলে ওঠেন,

- অবশ্যই বৈধ। খলীফা ভাল জিনিস, যত বেশি হয় ততই ভাল।

কিন্তু পরের ব্যক্তি তাকে বাধা দিয়ে বলে,

- না, না। একই যুগে একাধিক খলীফা থাকা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে একজন খলীফা থাকাকালীন যদি আরেকজন খলীফা দাবী করে তবে পরের জনকে হত্যা করতে হবে। অতএব, একই যুগে পৃথিবীতে খলীফা একজনই হবে।

উত্তরটি শুনে রেজা ভীষণ সন্তুষ্ট হয়। তার মনে হয় এই ব্যক্তি নিশ্চয় হাদীসের শিক্ষক, প্রচলিত অর্থে যাকে বলে মুহাদ্দিস। তাই হয়তো এসব হাদীস সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। রেজার মনে হয় মুহাদ্দিস সাহেব হয়তো তার পরের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। হয়তো রেজার মতোই তার অন্তর একজন খলীফার হাতে বায়াত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। হয়তো আবার একজন খলীফার অধীনে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাধনা করছেন। খলীফা সম্পর্কে এত বেশি যিনি জানেন, খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তার আগ্রহ যে অত্যাধিক হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে রেজা তাকে প্রশ্ন করে,

- বর্তমানে কি কোনো খলীফা আছে?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে হুজুর বলেন,

- না, না। এখন তো কেউ আল্লাহর কিতাব বা নবীর সুন্নাত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না। অতএব, এখন মুসলিম জাহানের কোনো খলীফা নেই।

কথাটা বলে হুজুর অবলিলায় হেসে ওঠে। সে হাসি রেজার অন্তরে রেখাপাত করে। সে ভাবে, মুসলিম জাহানের কোনো খলীফা নেই এটা কি হাসির ব্যাপার! খলীফা নেই মানে, এই উম্মতের কোনো অভিভাবক নেই। খলীফা নেই মানে, এই উম্মত রাখাল বিহীন এক পাল ছাগলের মতো। যদি সবগুলো ছাগলকে বাঘে খেয়ে ফেলে তবু প্রতিবাদ করার কেউ নেই। যখন খেলাফত ছিল তখন মুসলিমদের ক্ষতি করার সাহস কারও ছিল না। সুদূর সিন্ধুতে কোনো মুসলিম নারীকে অপমান করা হয়েছে শুনে খলীফা আরবের মরুভূমী থেকে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আর এখন মুসলিমরা দেশে দেশে বিভক্ত। প্রতিটি দেশ নিজেকে আলাদা জাতি মনে করে গর্ব করে। আরব মুসলিমদের কি হলো তাতে আমাদের চিন্তা নেই। আরাকান আফগানে মুসলিমদের কি অবস্থা তাতে আরব দেশের নেতাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই।

ভাইয়ে ভাইয়ে এই বিভক্তির কারণে মুসলিমরা কাফিরদের খেলনাতে পরিণত হয়েছে। কাফিররা তাদের দিয়ে যখন যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে। একারণে আমরা দেখি সবগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক নামধারী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কাফিরদের আইন-কানুন মেনে চলছে, প্রতিটি মুসলিম দেশে কাফিরদের কর্তৃত্ব চলছে। অতএব খলীফা নেই কথাটা হাসির কথা নয়। নিজের পিতার মৃত্যুর কথা কেউ হাসতে হাসতে বলে না। মুহাদ্দিস সাহেবের হাসি দেখে রেজা তাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে, তবে কি তিনিও খলীফার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ! হুজুরের দিকে তাকিয়ে সে ভগ্ন হৃদয়ে বলে,

- খেলাফত কায়েমের জন্য আমরা কি কিছুই করবো না?

রেজার ধারণাকে সত্য প্রমাণ করে হুজুর বলেন,

- না, না। এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই।

কথাটা শুনে রেজার মনটা হতাশায় ভরে যায়। ব্যাথিত হৃদয়ে বলে,

রসুল (সঃ) বলেছেন, বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। এখন কোনো খলীফা নেই, বায়াতও নেই। এই অবস্থায় আমরা মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুটা জাহেলী মৃত্যু

হবে। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে বলেছেন, সকল মুসলিমরা একমত হয়েছেন যে একজন খলীফা নিযুক্ত করা ফরজ। আর আপনি বলছেন এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই?

খলীফা নিয়োগ করা ফরজ এ বিষয়টি হুজুর বুঝলেন কিনা বোঝা গেলো না তবে তিনি ভিন্ন লাইন ধরলেন,

- দেখো, মহান আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের তিনি পৃথীবীতে খলীফা করবেন তথা স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতএব আমরা নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধন করে নেককার বনে গেলে আল্লাহ নিজেই আমাদের খেলাফত দান করবেন। এটা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই।

কথাটা শুনে রেজার মাথা ঘুরে যায়। এত বড় ব্যক্তি এমন অযৌক্তিক কথা কিভাবে বলতে পারে! নিজেকে কিছুটা শান্ত করে রেজা বলে,

- আমল আখলাকে সংশোধন বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন?

হুজুর বলেন,

- কী আবার, ভাল আমল করা খারাপ আমল থেকে দূরে থাকা।

- ভাল আমল বলতে ফরজ কাজগুলো আদায় করা হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা এই তো?

- হ্যাঁ তা তো বটেই।

হুজুরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রেজা বলে,

- ধরুন সকল মুসলমান দাড়ি, নামাজ-রোজা হজ্জ যাকাত ইত্যাদি কাজ করতে শুরু করলো। সবাই দাড়ি-টুপি পরে, পকেটে মিসওয়াক রাখে কিন্তু সবাই একযোগে জিনা করে বা মদ পান করে বা অন্য কোন কবীরা গোনাহ করে। এটা কি সংশোধন বলে গণ্য হবে। এভাবে কি খেলাফত কায়েম হবে?

- না, না। আস্তাগফিরুল্লাহ! সুন্নত-নফলে কিছুটা কমতি হলে না হয় মানা যায় কিন্তু ফরজ ত্যাগ করে বা কবীরা গোনাহে লিপ্ত হলে সেটা সংশোধন বলে গন্য নয়। এভাবে খেলাফত হবে না। খেলাফত পেতে হলে, সকল হারাম কাজ পরিত্যাগ করতে হবে আর সকল ফরজ কাজ আদায় করতে হবে। আর যতটুকু সম্ভব সুন্নাত নফলের পাবন্ধ হতে হবে।

রেজা যেনো এবার সুযোগ পেয়ে গেলো। দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

- জিহাদ করা কি ফরজ নয়? জিহাদ পরিত্যাগ করা কি কবীরা গোনাহ নয়? মহান আল্লাহ দশ বারোটিরও বেশি

আয়াতে মুসলিমদের বলেছেন কিতাল করতে যার অর্থ যুদ্ধ করা। তাছাড়া যে শব্দ ব্যবহার করে রোজা ফরজ করা হয়েছে একই ভাষায় কিতালকে ফরজ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, কাফিরদের উপর আগে আক্রমণ করা ফরজে কিফায়া। আর যদি কাফিররা আগে আক্রমণ করে তবে সেটা প্রতিহত করা ফরজে আইন। হেদায়া, শরহে বেকায়া ইত্যাদি গ্রন্থেও হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সঃ) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে গণ্য করেছেন। এতদূর বলে রেজা হুজুরের দিকে তাকিয়ে বলে,

- আপনার কি মনে হয় এই আবশ্যক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে আর যত আমলই সংশোধণ করা হোক তাতে কাজ হবে?

হুজুর চুপ থাকেন। পাশ থেকে মুফতী হুজুর বলেন,

- জিহাদ মানে তো যে কোনো ভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। মাদ্রাসা-মসজিদ নির্মাণ করে আমরা কি জিহাদ করছি না!

রেজা এবার আগের চেয়ে বেশি ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে,

- আপনাদের মতো আলেমদের মুখে এ কথা মানায়

না। কোনো শব্দের শাব্দিক অর্থ আর পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য করা শিখতে হবে। সলাত মানে তো যে কোনো ভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করা। কিন্তু যে কোনো ভাবে দোয়া করলেই কি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় হবে? তাছাড়া হাদিস ও ফিকাহর গ্রন্থসমূহ দেখুন। সেখানে জিহাদ অধ্যায় বলে আলাদা অধ্যায় আছে। উক্ত অধ্যায়ে মাদ্রাসা মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয় নি। বরং যুদ্ধ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, ইয়াহুদী আলেমরা আল্লাহর কিতাবের শব্দের অর্থ বিকৃত করতো। দয়া করে আপনারা সেই ভূমিকা নেবেন না। জিহাদ করার হিম্মত না হলে শুয়ে বসে থাকুন কিন্তু দয়া করে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা করবেন না।

মুফতী হুজুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রেজা মুহাদ্দিস সাহেবকে আবার প্রশ্ন করে,

- আল্লাহ বলেছেন ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে তিনি মুসলিমদের খেলাফত দান করবেন। অর্থাৎ খেলাফত পেতে হলে কেবল বসে থাকলে হবে না ভাল আমল করতে হবে। খেলাফত পেতে হলে যেসব আমল করতে হবে তার মধ্যে জিহাদ তথা কাফিরদের সাথে লড়াই করাও তো অন্তর্ভূক্ত। তাই না?

মুহাদ্দিস সাহেব স্বীকার না করে পারলেন না। তিনি নিরবে মাথাটা উপর থেকে নিচে ঝাকাতে থাকেন। রেজা বলে,

- তাহলে বলুন, জিহাদ পরিত্যাগ করে অন্যান্য আমল সংশোধণ করলেই কি খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে?

হুজুর ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়েন। তারপর বলেন,

- তা তো ঠিক, কিন্তু আমরা কী করতে পারি! এমনিতেই সরকার বলে আমরা নাকি জঙ্গী তৈরী করি। এখন যদি এ দাবী প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না।

রেজা আক্ষেপ করে বলে,

- হাদীসে বলা হয়েছে জিহাদ পরিত্যাগ করলে মুসলিম উম্মাহ দুর্দশার শিকারে পরিণত হবে। পুণরায় জিহাদ শুরু না করা পর্যন্ত এই দুরাবস্থা থেকে তাদের মুক্তি নেই। কেবলমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই পৃথিবী জুড়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। দেশে দেশে যেসব তাগুতী শক্তি ক্ষমতা দখল করে আছে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না। তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইসলাম কায়েম করতে হলে জিহাদ করতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেছেন, যদি তোমরা

যুদ্ধে বের না হও তবে, তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন আর তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন। আর তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারেব না। যদি আলেম সম্প্রদায় জিহাদ না করে তবে আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন এবং তাদের বাইরে অন্য একটি দলকে জিহাদ করার তৌফিক দিয়ে সম্মানিত করবেন।

রেজার আর কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না। হতাশায় তার বুকটা হাহাকার করছে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ যাদের উপর আস্থা রাখে, বিশ্বাস করে, তারা কেউই মুসলিমদের দুরাবস্থা নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা সবাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। একজন খলীফার হাতে বায়াত হয়ে বিশ্ব ব্যাপী মুসলিমদের একত্রিত করার বিষয়ে তাদের কোনো পরিকল্পণা নেই। এদের সাথে খেলাফত বা বায়াত নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন। এই বিষয়টি রেজাকে খুব পীড়া দেয়। সে আর কোনো কথা বলে না।

মাদ্রাসার উস্তাদরাও হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। রেজার অনর্গল প্রশ্নত্তোরের মাঝে তারা একরকম মগ্ন হয়ে ছিলেন। তাকে নিরব হতে দেখে তারা সভার কাজ সমাপ্ত করে উঠে পড়েন। ঠিক তখনই একজন আধাবয়সী লোক এসে বলল,

- হুজুর একজন একটা সদকার ছাগল দিয়ে গেছে।

শিক্ষকদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি তার উত্তরে বললেন,

- এখনই হেলা করে সেটাকে জবাই করে ফেল।

হেলা করার কথা শুনে রেজার চোখ কপালে উঠে যায়। সে জানে তিন তালাকের পর আগের স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কোনো মেয়েকে দু-একদিন পর তালাক দেওয়ার শর্তে অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়াকে বলে হেলা বিয়ে। এধরণের বিবাহ যারা করে হাদীসে তাদের অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অস্থায়ী বিবাহকে ইসলামে বলা হয় মুতা বিবাহ। কেবল বিভ্রান্ত শীয়ারা ছাড়া অন্য সকল মুসলিমরা যা হারাম হিসেবেই জানে। কিন্তু বর্তমানে বিবেকভ্রষ্ট ওলামা-মাশায়েখরা এই ঘৃণিত প্রথা চালু রেখেছে। রেজা ভাবে ছাগলের হেলা করার বিষয়টিও এধরণের কোনো জঘন্য অপকর্ম নয় তো! মুফতী আজগর তখনও রেজার পাশেই ছিল। তাকে প্রশ্ন করতেই সে বলতে শুরু করে,

- মানুষ এতীম মিসকীনদের উদ্দেশ্যে মানত করা ছাগল মাদ্রাসায় দিয়ে যায়। কিতাবে আছে এতীম-মিসকিন ছাড়া অন্য কেউ এ ছাগলের মাংস খেতে পারবে না। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা সবাই তো আর এতীম মিসকীন নয়। তাই সাদকার ছাগল হেলা করে নেওয়া

হয় যাতে সবাই খেতে পারে।

রেজা কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে,

- হেলা কিভাবে করা হয়?

মুফতী আজগর বলতে থাকে,

- খুবই সহজভাবে। একজন মিসকীনকে ছাগলটা দান করে দেওয়া হয়। ধরুন ছাগলটা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দান করে দেওয়া হলো। তারপর আমি আবার সেটা মাদ্রাসার সকল ছাত্র আর শিক্ষকদের দান করে দিলাম। প্রথমে ছাগলটা ছিল শুধু মিসকিনদের জন্য এখন সেটা সবার জন্য হয়ে গেলো। এখন সবাই খেতে পারবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা বলুন তো!

রেজার কাছে ব্যবস্থাটা মোটেও সুন্দর মনে হয় না। সে বুঝতে পারে আগের হেলার সাথে এই হেলার তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা সহজে বোঝানোর জন্য মুফতী আজগরকে বলে,

- ধরুন ছাগলটি আপনাকে দিয়ে দেওয়ার পর আপনি সেটা আর দান করলেন না। এখন কি হবে?

- ওরে বাবা! তবে কি আর রক্ষা আছে, তিরষ্কার বহিষ্কার ইত্যাদি নানা মুখী বিপদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রেজা একটু মুচকি হেসে বলে,

- আপনি একজন এতীম মিসকিন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ছাগলটি আপনাকে দেওয়ার পর আপনিই হলেন সেটির মালিক আর ছাগলটি আপনার সম্পদ। এখন আপনি তিরষ্কার বা বহিষ্কারের ভয়ে নিজের ছাগলটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে দান করছেন। একজন এতীম মিসকিনের সম্পদ এভাবে হুমকী থামকি দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া বৈধ কি?

মুফতী আজগর কোনো কথা বলে না। নিরব থাকে। রেজা নিজের মনেই তেলোয়াত করে,

“নিঃসন্দেহে যারা এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করে তারা নিজেদের উদরে অগ্নি প্রবেশ করায়। দ্রুতই তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।”

রেজা আরবীতে আয়াতটি তেলোয়াত করে। মুফতী আজগর হয়তো আয়াতটির বাংলা বুঝতে পারে। দুটি ঠোঁট বাঁকা করে সে বলে,

- এখানে তো তাও হেলা করা হয়। অন্যান্য মাদ্রাসায় সরাসরি চালিয়ে দেওয়া হয়।

রেজা কোনো কথা বলে না। তার মনে হয় কুটকৌশলে হারামকে হালাল করে নেওয়ার চেয়ে সরাসরি হারাম খাওয়াই বোধ হয় বেশি নিরাপদ। তাতে তওবা করার সুযোগ থাকে। হেলা করার বিষয়টি রেজার অনেক

প্রশ্নের জট খুলে দেয়। নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার প্রয়োজনে ওলামা মাশায়েখরা শরীয়তের ফতোয়াকে কিভাবে বিকৃত করতে পারে সেটা এখন সে বুঝতে পারে। নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে উম্মতের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার মতো মহতী উদ্যোগ হয়তো তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। হয়তো এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ এসব ওলামা মাশায়েখদের গন্ডির বাইরে অন্য কোনো দল প্রস্তুত করবেন। রেজাকে সেই দলটিই খুঁজে বের করতে হবে।

মুফতী আজগরের নিকট বিদায় নিয়ে রেজা বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। যাওয়ার সময় তার নজরে পড়ে মাদ্রাসার বিশাল লাইব্রেরীর দিকে। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে,

- এসব বই স্তুপ করে রেখে কি লাভ যদি এগুলো অধ্যায়ন করার মতো সত্যান্বেষী গবেষক না থাকে!

তার মনে পড়ে, আল্লাহ বলেছেন,

যাদের তাওরাতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা সে অনুযায়ী আমল করে নি তাদের উদাহরণ হলো ঐ গাধার মতো যে তার পিঠে বইয়ের বোঝা বহন করে। অর্থাৎ কষ্ট করে বই বহন করে কিন্তু তা থেকে কোনো উপকার পায় না।

চার:

....

সেদিন রাতে রেজার কাছে সব কাহিনী শুনে শাহিন ভীষন রাগ করে। ঠোট-মুখ ফুলিয়ে বলে,

- এমন একটা মজার ঘটনা হলো আর আমাকে সাথে নিলি না!

এই ঘটনায় রেজা মোটেও মজা পায় নি বরং দুঃখ পেয়েছে। তবে শাহিনের কথাটা শুনে সে বেশ মজা পায়। হাসতে হাসতে বলে,

- চিন্তা নেই। এবার কোথাও গেলে তোকে সাথে নেবো।

রেজাকে অতগুলো বই কিনতে দেখে শাহিনও বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই এদিক সেদিক থেকে দু-একটি বই সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করে। খুব একটা জোরে পড়তে পারে না। অনেকটা বাচ্চাদের মতো বানান করে ধীরে ধীরে পড়ে। এক পাতা শেষ করতে ঘন্টা খানেক লেগে যায়।

কঠিন বানানগুলো ভালমতো উচ্চারণ করতে পারে না। তখন রেজার কাছে প্রশ্ন করে জেনে নেয়। একদিন একটা বই নিয়ে এসে বলল,

- দেখ তো এখানে সঠিক বানানটা কি হবে।

শাহিনের তর্জনি যে শব্দটিকে নির্দেশ করছিল রেজা সেটা পড়ে শোনায়।

- মস্তিস্ক।

যতটুকু খুশি হওয়ার কথা ছিল শাহিন তারচেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়ে বলে,

- সম্পূর্ণ কথাটা একটু পড়ে দেখ।

রেজা শুরু করে,

- এই বইয়ে কোনো জাল-জঈফ হাদীস নেই। এখানে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত কোনো কথা নেই।

সম্পূর্ণটা পড়ে শাহিনের দিকে তাকাতেই সে বলে,

- কী চমৎকার কথা! তাই না?

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- মিথ্যা কথা চমৎকারই হয়।

- মিথ্যা!

- নয়তো কি? বইয়ে যেসব হাদীস আছে সেগুলো সব সহীহ এটা না হয় মানলাম কিন্তু হাদীসের পর যেসব

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে সেগুলো কার কথা?

শাহিন স্বাভাবিকভাবেই বলে,

- লেখকের কথা।

রেজা আবারও হাসে। তারপর বলে,

- এসব কথা তো লেখকের মস্তিস্ক থেকেই এসেছে নাকি? তবে যদি এই লেখক মস্তিস্ক বিহীন একটা পাগল হয়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

এদুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম সেটা নিয়ে শাহিন কিছুক্ষণ ভাবে তারপর বলে,

- না, না পাগল হবে কেনো। মস্তিস্ক তো অবশ্যই আছে।

- তাহলে হাদীসের পরে যে ব্যাখ্যাগুলো এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো তো মস্তিস্কপ্রসূত নাকি!

শাহিন কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে,

- এগুলো কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা।

রেজা এবার বেশ জোরে হেসে ওঠে তারপর মুখটা গম্ভীর করে বলে,

- সবার এই একই সমস্যা। নিজের ব্যাখ্যাটাকেই সঠিক মনে করে। পীর-দরবেশরা কাশফ-ইলহামের দোহাই দিয়ে আজগুবী কাহিনী বর্ণনা করে সেগুলো সঠিক বলে

দাবী করে। আর এসব আধুনা লেখকরা নিজেদের বিকৃত মস্তিস্ক থেকে আজগুবী সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করার পর বলে এগুলো মস্তিস্কপ্রসূত নয়। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ এগুলো সবই আল্লাহর ওহী।

শাহিন একটু অবাক হয়ে বলে,

- এখানে আজগুবী ব্যাখ্যা কোথায় পেলি?

সাথে সাথে রেজা বলে

- এই যে, এখানে দেখ। লিখেছে যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া অন্য কোনো স্থানে কাফিরদের হত্যা করা বৈধ নয়। মনে করে দেখতো এই কথাটা কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে কিনা।

শাহিন কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে। প্রতিদিন রাতে রেজা তাকে সহীহ-বুখারী থেকে বাছাই করা হাদীস শোনায়। এর মধ্যে কয়েক শ হাদীস পড়া হয়ে গেছে। সেসব হাদীস সবই শাহিনের মনে আছে। কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোনটি মিলবে তা সে বুঝতে পারছে না। লাজুক ভঙ্গিতে মুচকি হেসে সে রেজাকে বলে,

- তুই বল।

কথাটা শুনে রেজা ভীষণ রেগে যায়। শাহিনের জামার কলার চেপে ধরে দু-তিন বার ঝাকিয়ে ভীষণ উত্তেজিত

হয়ে বলে,

- তোকেই বলতে হবে। সাধারন মুসলিমরা তোর মতো হাবাগোবা হয়ে আছে বলেই এসব লেখকরা ধূর্ত শেয়ালের মতো মুরগি খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে তাই ফতোয়া লিখে বলে দিচ্ছে এগুলো সবই আল্লাহর ওহী, মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত নয়!

রেজার হাতটিকে জামার কলার থেকে ছাড়ানোর কোনো চেষ্টা না করেই শাহিন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে,

- ঐ যে, কি নাম যেনো লোকটার। একজন সাহাবী তার বাড়িতে ঢুকে তাকে হত্যা করে পালিয়ে আসে। এটা তো আর যুদ্ধের ময়দান নয়।

রেজা ভীষণ খুশি হয়। শাহিনের জামার কলার থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে কাঁধে একটা থাবা দিয়ে বলে,

- এই তো পেরেছিস। তার নাম আবুল হুকাইক। এখন বল তো দেখি, যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া কাফিরদের হত্যা করা যাবে না এই কথাটা মস্তিস্কপ্রসূত কিনা?

শাহিন ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়াতে থাকে।

- না, না। এটা মোটেও মস্তিস্কপ্রসূত নয়। মস্তিস্ক থাকলে কি আর এমন উদ্ভট কাজ কেউ করে। এই বেটা একটা মস্তিস্কহীন পাগল।

রেজার মুখটা আগের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। মুখটা ভার করে বলে,

- এসব পাগলই তো যত গন্ডোগোলের মূল। দুকলম পড়াশুনা করেই পাঁচ কলম লিখে বই ছাপিয়ে ফেলে। টাকা খরচ করে এদের বই যারা কেনে আর সময় নষ্ট করে পড়ে তারা সবাই পাগল। পুরো পৃথিবীটা এখন পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে।

শাহিনের হাতে আরও একটা বই ছিল। তাতে আরও চমৎকার কথা লেখা আছে। শাহিন চেয়েছিল এই বইটাও রেজাকে দেখাবে। কিন্তু প্রথম বইটি দেখার পর যে কান্ড ঘটলো তাতে এই বইটি রেজার চোখে পড়লে আজ আর রক্ষা নেই। শাহিন যথাসাধ্য চেষ্টা করে বইটি আড়াল করতে। কিন্তু রেজার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। বইটি চোখে পড়তেই রেজা সেদিকে উঁকি দিয়ে বলল,

- এইটা আবার কি জিনিস?

শাহিন ভেবাচেকা খেয়ে বলে,

- একটা বই।

- বইতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কার বই, কিসের বই?

শাহিন প্রাণপনে চেষ্টা করে বইয়ের বিষয়টা এড়িয়ে যেতে। মুখটা লাল করে বলে,

- এটা আরেক পাগল।

শাহিনের মুখের ভাব দেখে রেজা হেসে বলে,

- দেখি না কেমন পাগল।

কোনো উপায় না দেখে শাহিন বইটা রেজার হাতে তুলে দিতে দিতে বলে,

- এই বেটা একটা গাছ পাগল, যাকে বলে বদ্ধ উম্মাদ।

বইটা হাতে নিতেই শাহিনের কথার সত্যতা পাওয়া গেলো। বইটির মোট আট দশটি পৃষ্ঠা। তার উপর মোটা কাগজের চমৎকার একটা কভার। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হওয়ার মতো। কভারের উপর বড় করে লেখা রয়েছে, " দুই ঈদের তাকবীরের সঠিক সংখ্যা- এক লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ। ভিতরে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখের পর শেষে লেখা হয়েছে, "অতএব বোঝা গেলো ঈদের তাকবীর হবে বারোটি। ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ করতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরষ্কার।

কথাটা পড়েই রেজা শাহিনের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। সাথে সাথেই মুখটা কাচুমাচু করে শাহিন বলে ওঠে,

- আমার কোনো দোষ নেই। ঐ পাড়ায় কেরামত নামে এক ছেলে আছে। কদিন হলো নামাজ-কালাম শুরু করেছে। সে-ই এসব বই আমাকে দিয়েছে।

কেরামত নামটা রেজার নিকট বেশ পরিচিত। আগে গুন্ডা টাইপের ছিল। গত রমজানে নামাজ পড়া ধরেছে। তারপর লা-মাযহাবীদের পাল্লায় পড়েছে। এখন যেখানে সেখানে মানুষের সাথে তর্ক বিতর্ক করে। তার কারণে এলাকায় প্রায়ই ঝগড়া-ফাসাদ হয়। এলাকার বিভিন্ন মসজিদ থেকে তাকে কয়েকবার বিতাড়িত করা হয়েছে। তার অবস্থা হয়েছে অনেকটা অল্প বিদ্যা ভয়ংকর টাইপের। নামটা শুনেই তাই রেজা ভ্রু কুঞ্চিত করে। রেজার ভাব দেখে শাহিন তার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারে। রেজার সাথে তাল মিলিয়ে বলে,

- কেরামত বেটা বড্ড বাড় বেড়েছে। একদিন ধরে এনে এমন টাইট দিতে হবে যাতে বাপের নাম ভুলে যায়।

শাহিনের কথায় রেজার কোনো ভাবান্তর ঘটে না। কেরামতকে টাইট দেওয়ার কোনো মানসিকতা তার মধ্যে আছে কিনা সেটাও বোঝা যায় না। আসলে কেরামতের মতো অজ্ঞ ও নির্বোধ তরুণদের সাথে আলোচনা করতে রেজার মন একেবারে সাই দেয় না। হাদীস-কুরআনের গভীর বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য যে ধরণের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার বর্তমানের অনেক আলেম-ওলামার সে জ্ঞান নেই। অতএব এসব অনভিজ্ঞ, অল্পবয়ষ্ক যুবকদের কথা আর কি বলা যাবে।

তবে শাহিনকে সে নিষেধও করে না। এই নিরবতাকে সম্মতি ভেবে শাহিন পরদিনই কেরামতের সাথে দেখা করে। তর্ক বিতর্কের গন্ধ পেলেই কেরামতের মনটা আনন্দে নেচে ওঠে কিন্তু রেজার নাম শোনার সাথে সাথেই তার সেই আনন্দ কর্পুরের মতো উবে যায়। রেজার ব্যাপারে সে অনেক কিছু জানে। অন্যান্যা হুজুরদের যতটা সহজে বোকা বানানো যায় রেজার ব্যাপারটা তত সহজ নয়। তার সাথে লাগতে তাই সহজে কেউ রাজি হয় না। শাহিনও দমবার পাত্র নয়। কেরামতের পিছনে কয়েক দিন লেগে থাকলো। বাধ্য হয়ে কেরামত এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে একজন বুঝমান লোক নিয়ে একদিন শাহিনের সাথে রেজার মসজিদে চলে আসলো। মাগরিবের পর যখন সব মুছল্লীরা বাড়ি ফিরে যায়। রেজা তখন মসজিদে একা বসে কুরআন তিলাওয়াত করে। সে সময় তারা মসজিদে হাজির হয়। সালাম-কালামের পরই কেরামত বলে,

- আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন?

রেজা শাহিনের দিকে তাকায়। শাহিন উপর থেকে নিচে মাথা ঝাকায়। অর্থাৎ একথা বলেই শাহিন তাদের নিয়ে এসেছে। যদিও রেজা তাকে এটা করতে আদেশ করেনি। শাহিনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেজা এবার

কেরামতের দিকে তাকিয়ে বলে,

- এখানে বসো।

বসতে বসতেই কেরামত বলে,

- ইনি হলেন, জনাব হুরমত আলী। বড় আলেম।

রেজা হুরমত আলীর দিকে এক নজরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। গোল-গাল চেহারা। সাইজে যে খুব বড় তা বলা যায় না তবে জ্ঞানে কেমন বড় সেটাই দেখার বিষয়। তাকে তাকাতে দেখে হুরমত আলী নিজের হাতটি রেজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,

- আমি জনাব হুরমত আলী।

রেজা তার হাতে হাত রাখতে রাখতে বলে,

- সেটা তো কেরামত বললই। আপনি যে একজন বড় আলেম সেটাও বলল।

কথাটা শুনে হুরমত আলীর দাঁতগুলো স্বয়ংক্রীয়ভাবে বের হয়ে আসে। দুঠোট দিয়ে জোর করে সেগুলো ঢেকে গম্ভীর হয়ে বলে,

- আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন।

লোকটির আত্মবিশ্বাস দেখে রেজা ভীষণ অবাক হয়। মুচকি হেসে বলে,

- আপনাদের বক্তব্য কি?

লোকটি কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলে,

- আমরা চার মাজহাব মানি না। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মতপার্থক্য করো না, দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। অতএব, চার মাযহাব মানলে আল্লাহর কথা অমান্য করা হয়। এটা হারাম। মুসলিমদের আল্লাহ এক, রাসুল এক, দল বা মতও হবে একটা। কোনো বিষয়েই কোনো দ্বিমত থাকবে না। থাকতেই পারে না।

রেজা মোটা গলায় বলে,

- কোনো দ্বিমত থাকবে না?

হুরমত আলী দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- না। থাকবে না। থাকতেই পারে না।

রেজা বলে,

- সাহাবাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না?

হুরমত আলী হালকা হেসে বলে,

- এর ব্যাখ্যা আছে।

শিকার ফাঁদের কাছাকাছি চলে এসেছে দেখে রেজার চোখ-মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে। হুমরত আলীর চোখে চোখ রেখেই বলে,

- বলুন তো ব্যাখ্যাটা কি?

হুরমত আলী যেনো পূর্ণ প্রস্তুত ছিলো, রেজার কথাটা

শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বলে ওঠে,

- অনেক সময় কোনো একজন সাহাবী কোনো একটি হাদীস জানতেন না তাই নিজের মত অনুযায়ী আমল করতেন। পরে যখন তাকে হাদীসটি শুনানো হতো তিনি সাথে সাথে নিজের মত পরিত্যাগ করতেন।

হুরমত আলী যে এই কথাটিই বলবে রেজা তা জানতো। তার কথাটি আরও একটু স্পষ্ট করার জন্য সে বলে,

- ধরুন কোনো বিষয়ে রসুলের হাদীস আছে, দুজন সাহাবীই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত এ সত্ত্বেও কি দুজনের মধ্যে দ্বিমত হতে পারে!

হুরমত আলী নিজের ডান হাতটি মুষ্টিবদ্ধ করে মসজিদের মেঝেতে আঘাত করে দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- এটা কখনও হতে পারে না। হাদীসটি দুজনেই জানে কিন্তু দুজনের দুরকম মত এটা অসম্ভব। কুরআন এক, হাদীস এক মতও হবে একটা। হাদীস থাকতে কোনো দ্বিমত হবে না।

রেজা কণ্ঠস্বরকে কিছুটা স্বাভাবিক করে বলে,

- হাদীস থাকা সত্ত্বেও এবং হাদিসটা জানা স্বত্ত্বেও দু দল সাহাবা দুরকম মত দিয়েছেন যদি আমি এটার প্রমাণ দিতে পারি।

কথাটা শুনে হুরমত আলীর চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়ার মতো জঘন্য কাজ অন্ধ মুকাল্লিদরা করতে পারে। সাহাবারা এমন কাজ কখনও করবে না। তার বিশ্বাস এ বিষয়ে রেজা কোনো দলীল প্রমাণ হাজির করতে পারবে না। ঠোট বাঁকা করে তাই সে বলে,

- জাল-যয়ীফ হাদীস ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো দলীল হাজির করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

কথাটা শুনে রেজার মাথায় রাগ চড়ে যায়। তামাশার স্বরে বলে,

- কয় টাকার চ্যালেঞ্জ?

হুরমত আলী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে,

- টাকা-পয়সা তো সাথে আনি নি। ঠিক আছে আপনি যদি এ বিষয়ে সহীহ হাদীস দেখাতে পারেন তবে আমি এখানেই নাকে খর দেবো। ঠিক আছে?

রেজা মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করে বলে,

- সহীহ বুখারীর হাদীস হলেই তো হবে, নাকি?

হুরমত আলী বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে,

- সহীহ বুখারীতে এমন গাজাখুরী গল্প থাকে না। আপনি যদি দেখাতে পারেন আমি এখুনই নাকে খর দেবো। এইটা আমার চ্যালেঞ্জ।

রেজা এবার শুরু করে,

- সহীহ বুখারীতে এসেছে রসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কেউ যেনো বনু কুরাইজার এলাকায় না পৌঁছে আসরের নামাজ আদায় না করে। কিন্তু বনু কুরাইজার এলাকায় পৌঁছানোর আগেই আসরের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলে সাহাবারা চিন্তায় পড়ে যান। তাদের মধ্যে একদল বলেন আল্লাহর রাসুল যা বলেছেন আমরা তাই করবো। ফলে তারা সূর্য ডোবার পর বনু কুরাইজায় গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করে। অন্য একটি দল বলেন, আল্লাহর রাসুল বলতে চেয়েছেন তোমরা দ্রুত যাও যাতে আসরের নামাজ বনু কুরাইজায় গিয়ে আদায় করতে পারো। ফলে তারা বনু কুরাইজায় পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় আসরের নামায আদায় করেন। আল্লাহর রাসুল এই ঘটনা শুনে কাউকে তিরষ্কার করেন নি।

হাদীসটি সম্পূর্ণ শেষ করার পরই রেজা হুরমত আলীর দিকে তাকিয়ে বলে,

- আল্লাহর রাসুল যে বনু কুরাইজায় গিয়ে সলাত

আদায় করতে বলেছেন এই হাদিস দুই দলের কোন দল জানতো না?

হুরমত আলীকে চিন্তিত মনে হয়। আল্লাহর রসুল যা বলেছেন সেটা তো সব সাহাবারাই জানতেন তবে এটার ব্যাখ্যা কি হতে পারে সেটা নির্ণয় করতে গিয়ে তারা দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছেন। একেক দল একক রকম বুঝেছেন আবার নিজেদের বুঝ মতো দুরকম আমলও করেছেন। আল্লাহর রসুল তাদের নিষেধও করেন নি। কি ভয়ংকর কথা! ইমাম বুখারী এমন কথা লিখলেন কিভাবে! হঠাৎ হুরমত আলীর মনে পড়ে যায় নাকে খর দেওয়ার কথা। নিজের অজান্তেই তার নাগের ডগায় বিলবিল করতে থাকে। সম্মান বাঁচানোর জন্য দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

- কিন্তু একই হাদীসের অর্থ তো একটাই হবে তাই না? দুয়ে দুয়ে তো চারই হবে অন্য কিছু হবে না। ঠিক কিনা?

একটু সাহস করে হুরমত আলী রেজার মুখের দিকে তাকায়। সে আশা করছিল অন্তত এ কথাটায় রেজা সম্মতি জানাবে কিন্তু রেজাকে ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়াতে দেখে তার মুখটা সংকুচিত হয়ে যায়। ঠিক সে সময় তার কানে রেজার কণ্ঠ ভেসে আসে,

- উ-হু। দুয়ে দুয়ে সব সময় চার হয় না। অন্য কিছুও হতে পারে। অনেক সময় দুয়ে দুয়ে দুধ হয়।

হুরমত আলী মুখটা কাচুমাচু করে বলে,

- ঠিক বুঝলাম না।

- বুঝলেন না। গোয়ালা যখন দুধ দুয়ে বালতি বোঝায় করার চেষ্টা করে তখন বেশ কিছু সময় ধরে দুয়ে দুয়ে তার বালতিতে কি হয়?

হুরমত আলী এবার বুঝতে পারে। বোকার মতো হেসে বলে,

- ও এই ব্যাপার। এটা তো ভিন্ন বিষয়।

- ব্যাখ্যাটা ভিন্ন কিন্তু মূল বিষয় তো একই তাই না? আরবীতেও এমন অনেক শব্দ আছে সেগুলোর বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা হয়। এই ধরুন আপনার নামটা।

হুরুমত আলী একটু অবাক হয়ে বলে,

- আমার নাম?

- হ্যাঁ। হুরমত শব্দটি এসেছে হারাম শব্দ থেকে। এটা একদিকে অবৈধ বোঝায় আবার সম্মানিত বোঝায়। আরবীতে বলে, ইবনুল হারাম মানে অবৈধ সন্তান এ অর্থে আমরা মদকে হারাম বলি। আবার বলা হয় মসজিদুল হারাম মানে সম্মানিত মসজিদ। কুরআন

হাদীসেও এরকম অনেক শব্দ এসেছে যার বিভিন্ন রকম অর্থ হয়। যেমন বলা হয়েছে তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন কুরু। কিন্তু কুরু বলতে কি বোঝায় সেটা নিয়ে দ্বিমত আছে। কেউ বলেছেন কুরু মানে হায়েজ কেউ বলেছেন কুরু মানে হায়েজের পরে যে সময়টা থাকে সেটা। তাছাড়া ইশার সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে শাফাকের কথা। কিন্তু শাফাক বলতে সাদা বা লাল উভয় প্রকার শাফাককে বোঝায়। একারণে ঈশার সলাত কখন শুরু হবে সে ব্যাপারে বিভিন্ন মাজহাবে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অংকের কথায় ধরা যাক। আপনি দুয়ে দুয়ে চার হওয়ার কথা বলছিলেন। বলছিলেন চার ছাড়া অন্য কিছু হয় না। আমি আপনাকে কুরআন থেকে প্রমাণ দিচ্ছি। আওল কি সেটা বোঝেন?

হুরমত আলী সাথে সাথে সম্মতি জানিয়ে বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা বুঝবো না। আওল ওয়াক্ত মানে নামাযের প্রথম ওয়াক্ত। হাদীসে এসেছে প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়া উত্তম। কিন্তু আমাদের দেশের মাজহাবীরা জোহরের নামাজ ওয়াক্ত হওয়ার দুই ঘন্টা পরে আদায় করে। এইটা বিদয়াত। রসুল বলেছেন কুল্লু বিদয়াতিন ....

হুরমত আলী লম্বা একটা লেকচার শুরু করার আগেই রেজা তাকে থামিয়ে বলে,

- আহা! এইটা তো আওয়াল ওয়াক্ত। আমি বলছি আওলের কথা।

এখন হুরমত আলীর মনে পড়ে। আসলে আওল ওয়াক্ত নয় বরং আওয়াল ওয়াক্ত। কিন্তু বিষয়টাকে সে বেশি গুরুত্ব দেয় না। আরবীতে তার জ্ঞান অতি সামান্য। অতএব এই ভুল তার নিকট অতি সামান্যই মনে হয়। স্বাভাবিক ভাবে বলে,

- ঐ একই কথা।

কথাটা শুনে রেজার বেশ রাগ হয়। তবু নিজেকে সংযত করে বলে,

- মোটেও একই কথা নয়। পবিত্র কুরআনে সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে কিছু আয়াত আছে। সেখানে জটিল জটিল সব হিসাব আছে। যেমন ধরুন, আল্লাহ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। এটাই কুরআনের আয়াত। কুরআনে এ ছাড়া অন্য কিছু বলা নেই। হাদীসেও ভিন্ন কিছু নেই। অর্থাৎ স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে এটাই ইসলামের অকাট্য বক্তব্য। কিন্তু রসুলের ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামের যুগে একজন ব্যক্তি

মারা যায়। আর রেখে যায় তার পিতা-মাতা, দুই মেয়ে এবং একটি স্ত্রী। কুরআনে বর্ণিত ফারায়েজের নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি বণ্টন করলে এদের সবার অংশ সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা সম্ভব হয় না। তাই সাহাবারা চিন্তা-ভাবনা করে আওলের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ হিসেবে স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে নয় ভাগের এক ভাগ পায়। সংখ্যা একটায় কিন্তু বিভিন্ন স্থানে তার ফলাফল হচ্ছে বিভিন্ন। অনেকটা দুয়ে দুয়ে চার বা দুয়ে দুয়ে তিন হওয়ার মতো। কি বুঝলেন?

হুরমত আলী কিচ্ছু বুঝলো না। এসব মাসয়ালা সে জনমে পড়ে নি। সে কেবল জানে নামাজে রফউল ইয়াদাইন করতে হয়, জোরে আমীন বলতে হয়, রোজাতে দু মিনিট আগে ইফতার করতে হয় ইত্যাদি। এসব যে করে সে-ই সহীহ হাদিসের অনুসারী। তার পরনে কাপড় থাক বা না থাক। সম্পত্তির বণ্টন বা অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের মাথাব্যাথা নেই। এইসব জটিল আলোচনা শুরু হতে দেখে তাই হুরমত আলী পালাবার ফুরসত খোঁজে। রেজার দিকে তাকিয়ে বলে,

- আমাকে এখন উঠতে হবে ভাই। আমার অনেক কাজ আছে।

কথাটা শুনে রেজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় কিন্তু

শাহিন ভীষণ রেগে যায়। মোটা গলায় বলে,

- চলে গেলে হবে না। নাকে খর দিতে হবে। মনে নেই?

নাকে খর দেওয়ার কথা শুনে হুরমত আলী ভীষণ অপমান বোধ করেন। কেরামতের দিকে করুণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

কেরামত নিজেও হুরমত আলীর উপর রেগে রয়েছে। সে তাকে এনেছিল ইমাম সাহেবকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য উল্টো ইমাম সাহেব তাকে মেরামত করে দিয়েছে দেখে সে নিরব থাকে। সেই সুযোগে শাহিন আবার বলে,

- নিজে মুখেই তো বললেন, প্রমাণ দিতে পারলে নাকে খর দেবো। জানেন না যখন, তখন এতো বড়াই করার কি দরকার ছিল?

হুরমত আলী এবার উত্তেজিত হয়ে মান বাঁচানোর চেষ্টা করে,

- আমাকে একা পেয়ে আপনারা যাচ্ছেতাই বলছেন। আগামী মাসের বারো তারিখে আমাদের একটা ওলামা-সম্মেলন আছে। সহীহ হাদীসের অনুসারী বড় বড় সব লেখক গবেষকরা সেখানে আলোচনা করতে আসবে। সেখানে আমাদের আমীরে জামাত স্বয়ং উপস্থিত

থাকবেন। আপনারা আসলে আমি নিজে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করে দেবো।

শাহিনের মনে হলো এটা একটা ভাল সুযোগ। তাই সে এ যাত্রা হুরমত আলীকে ছেড়ে দিলো। তারা বিদায় নেওয়ার সাথে সাথেই রেজাকে উদ্দেশ্য করে শাহিন বলে,

- কি রে, যাবি তো?

রেজা নিরব থাকে। যাওয়ার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ হয় না তবে বিষয়টি নাকচও করে না। সে বুঝতে পারে এসব স্বঘোষিত গবেষকদের সাথে আলোচনা করে তেমন কোনো ফায়দা হবে না। রেজার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা না করেই শাহিন নিরবতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে সম্মেলনে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে এবং যথাসময়ে ঠিকই রেজাকে নিয়ে সম্মেলনস্থলে হাজির হয়।

সম্মেলনের দিন আলোচকদের আলোচনা শুনে রেজা অধৈর্য হয়ে উঠলো। কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। ভাল একটা আলোচনা হলে কষ্ট করে বসে থাকা যায় কিন্তু ঠাঁই বসে থেকে গাধার ডাক শুনতে কে পছন্দ করে! কে কি আলোচনা করলো রেজা তা বলতে পারবে না শুধু একবার শুনলো একজন বলছে,

- বিভিন্ন স্থানে মাজহাবীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। এটা দেখে অনেক সহীহ হাদীসের অনুসারী দমে গেছেন। কিন্তু দমে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে হকের সাথে বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য। এখনও তো কিছুই হয় নি। যখন মসজিদে মসজিদে রক্তপাত হবে কেবল তখনই বলা যাবে হকের দা'ওয়াত পৌঁছে গেছে। ভাই সব। জান গেলেও দ্বীন-ঈমান ছাড়া যাবে না। মাজহাবীরা যত হামলা-মামলা করুক আমরা রফউল ইয়াদাইন ছাড়বো না, আমীন জোরে বলা বন্ধ করবো না, সহীহ হাদীস মেনে চলবোই।

রেজা ভাবে, দ্বীন ঈমান বলতে কি এরা এটাই বোঝে? যদি কেউ রফউল ইয়াদাইন না করে বা আমীন জোরে না বলে সে কি বেদ্বীন বা বেঈমান হয়ে যায়! নাকি তার কবীরা গোনাহ হয়! এরপর আরেকজন এসে বললো,

- একজন সহীহ হাদীসের অনুসারী বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা এদেশে ফিকহী আইন প্রতিষ্ঠা হতে দেবো না।

রেজা ভাবে, দেশে ইহুদী খৃষ্টানদের আইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে সেদিকে খেয়াল নেই অথচ ফিকহী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে এতো কঠোর আপত্তি। রেজা

সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে, ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চর না হলেও এরা যে শয়তানের অনুচর তাতে সন্দেহ নেই। দ্বীন-ঈমানের আসল শত্রু যারা তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সাধারন মুসলিমদের খুটিনাটি দোষ বের করে তাদের সাথে সংঘর্ষ বাধাতে যারা অভ্যস্ত তাদের আর কিই বা বলা যেতে পারে!

অনেক কষ্টে রেজা সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর হুরমত আলী আলোচকদের সাথে আলোচনা করার ব্যবস্থা করে দেয়। সে তাদের নিয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে কয়েকজন বিভিন্ন আকৃতির লোক বিক্ষিপ্তভাবে বসে ছিল। এনারাই হয়তো বড় মাপের লেখক ও গবেষক। রেজা ভালভাবে লক্ষ্য করে কয়েজনকে চিনতে পারে। তারা সবাই টিভি চ্যানেলের আলোচক। ঘরে ঢুকেই হুরমত আলী বলে ওঠে,

- ইনিই হলেন সেই ব্যক্তি।

বোঝা গেলো রেজার পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের আগেই অবগত করা হয়েছে। তাই কেউ সেসব প্রশ্ন করে না। ডান দিক থেকে একজন বলে,

- বলুন আপনি কি বলতে চান?

রেজা লক্ষ্য করে লোকটি অল্পবয়ষ্ক। হালকা পাতলা

শরীর। গায়ে ছোট জামা। একটু আগেই মঞ্চে আলোচনা করছিল। যে কোনো মূল্যে ফিকহী আইন প্রতিষ্ঠা হতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছিল। রেজার যতদূর বিশ্বাস এসব গবেষকদের মধ্যে এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নির্বোধ। তাই প্রথমেই তার সাথে আলোচনা শুরু করতে তার মন সাই দেয় না। তাকে নিবৃত করার জন্য বলে,

- কাজটা হাদীস বিরুদ্ধ হয়ে গেলো না!

কোন কাজটা হাদীসের বিরুদ্ধে হয়ে গেলো লোকটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। দ্রুত পকেট থেকে একটা ছোট আয়না বের করে দেখে নিল গোফের সাইজটা ঠিক আছে কিনা। সেটা ঠিকই আছে। তিনি প্রায়ই টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করেন। টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করাটা অনেকটা সিনেমাতে অভিনয় করার মতো। তাই পুরা শরীরটাকে সাইজ রাখতে হয়, সাজ-গোজ করতে হয়। এমনকি অনেক সময় নায়ক-নায়িকাদের মতো মেকাপ করতে হয়। অতএব, চুল-দাড়ি বা গোফে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে লোকটা বোকার মতো রেজার দিকে তাকিয়ে থাকে। রেজা বলে,

- বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ

(সঃ) এর নিকট দুজন লোক কোনো একটা বিষয়ে কথা বলতে আসে। তাদের মধ্যে বয়সে যে ছোট সে প্রথমে কথা বলা শুরু করলে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, বড়কে সম্মান দাও। ফলে সে চুপ করে আর অধিক বয়ষ্ক ব্যক্তিটি কথা বলা শুরু করে। এখানে আপনার চেয়ে বয়স এবং জ্ঞান উভয় দিক থেকে বড় এমন লোক যদি থাকে তবে তাদের আগে শুরু করা উচিৎ।

রেজার কথা শুনে লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তড়িঘড়ি করে বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে অনেক জ্ঞানী গুণি ব্যক্তি আছে। এই যে, ইনি হলেন আমাদের আমীর সাহেব। বয়সে বড়, জ্ঞানেও বড়। দক্ষ আলেম। দিনের মধ্যে দশ-বারো ঘন্টা পড়াশুনা করেন। আমাকে পছন্দ না হলে, তার সাথেই কথা বলুন।

রেজা লক্ষ্য করে লোকটার কথা শুনে আমীর সাহেব গর্বে ফুলতে শুরু করেছেন। আর আমীর সাহেবের ঠিক পাশে বসে থাকা লোকটার মুখ কালো হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি বলতে চাচ্ছেন আমিই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ। এসব দেখে রেজা মুচকি হেসে বলে,

- আহা! আবারও হাদীস বিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেলো!

চিকন লোকটা এবার চমকে উঠলো। সারা জীবন সহীহ হাদীসের অনুসারী বলে পরিচয় দিয়ে এখন কিনা তার কার্যকলাপ বারংবার হাদীসের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। বেজায় বিরক্ত হয়ে সে বলে,

- আবার কি হলো!

রেজা খুব স্বাভাবিকভাবে বলে,

- দেখুন, হাদীসে মানুষের মুখের সামনে প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিজ কানে নিজের প্রশংসা শুনলে মানুষ ফিতনায় পড়ে যায়, অহংকার সৃষ্টি হয়। তবে আমীর সাহেব যদি বদ্ধ কালা হয়ে থাকেন, কানে শুনতে না পান সেটা ভিন্ন কথা।

কথাটা বলেই রেজা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমীর সাহেবের দিকে তাকাতেই আমীর সাহেব ভীষণ অপমানবোধ করেন। কেউ তাকে বদ্ধ কালা মনে করুক এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না। তড়িঘড়ি করে বলেন,

- না, না। আমি কানে শুনতে পায়। খুবই স্পষ্ট শুনতে পায়।

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে রেজা বলে,

- তাহলে এই ব্যক্তি যে আপনার মুখের সামনে প্রশংসা করেছে সেটা শুনতে পেয়েছেন?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে আমীর সাহেব বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছি মানে। পুরো মুখস্থ করে ফেলেছি। আপনি ইচ্ছা করলে আমি আগা-গোড়া শুনিয়ে দিতে পারি। সে বলেছে ...

রেজা তাকে থামিয়ে বলে,

- না, না। আমাকে শোনানোর দরকার নেই। আপনি শুনেছেন এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনাকে তো এবার একটা সহীহ হাদীস মানতে হবে। পারবেন তো?

- হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই পারবো। কেনো পারবো না। সহীহ হাদীসের জন্য আমরা জান প্রাণ উভয়ই দিতে পারি।

কথাটা বলে আমীর সাহেব ডান হাতটি উঁচু করে দুটি আঙ্গুল প্রদর্শন করলেন। তার দিকে তাকিয়ে রেজা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে,

- জান-প্রাণ উভয় নয় একই জিনিস।

কথাটা বলতেই আমীর সাহেব একটি আঙ্গুল নামিয়ে ফেলেন এবং মুচকি হেসে রেজার দিকে দৃষ্টি দেন। যেনো তিনি বলতে চাচ্ছেন এবার ঠিক আছে তো?

উত্তরে রেজাও মুচকি হাসে তারপর বলে,

যাই হোক সেটা কোনো বিষয় নয় তবে আমার মনে হচ্ছে এ যাত্রা আপনি সহীহ হাদীসের উপর আমল

করতে পারবেন না।

কথাটা শুনে আমীর সাহেব মনে মনে আতংকিত হয়ে ওঠেন। ছেলেটা এমন কি সহীহ হাদীস শোনাবে যে, তিনি আমল করতে পারবেন না! জিহাদের হাদীস নয়তো! সারা দুনিয়ায় যত হাদীস আছে তার মধ্যে জিহাদের হাদীসগুলোই দারুণ কঠিন। তাই আগে থেকেই ঐসব হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঠিক করে রেখেছেন। তিনি একটা বই লিখে প্রমাণ করেছেন অমুসলিম হোক বা মুসলিম হোক যে কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের নীতি নয়। অতএব, তার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বেশ দৃঢ়ভাবে বলেন,

- সহীহ হাদীসের উপর আমল আমি অবশ্যই করবো। আপনি শুধু বলেই দেখেন।

রেজা বলতে শুরু করে,

- সহীহ মুসলিমে এসেছে হযরত মিকদাদ বলেন, যারা প্রশংসা করে আল্লাহর রসুল তাদের মুখে মাটি ভরে দিতে আদেশ করেছেন। একজন উঠে কোনো এক সুলতানের প্রশংসা করলে মিকদাদ (রাঃ) তার মুখে মাটি ভরে দিলেন। এখন আপনাকে এই হাদীসটির উপর আমল করতে হবে। এই ব্যক্তির মুখে মাটি ভরে

দিতে হবে।

হাদীসটি শুনেই আমীর সাহেবের মুখটা তেতো হয়ে গেলো। ব্যাপারটা যে এদিকে গড়াবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। দু-তিন বার ঢোক গিলে বললেন,

- মুখে মাটি ভরে দিতে হবে!

রেজা সাথে সাথেই বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। হাদীসে এমনই বলা হয়েছে। আপনি হাদীসটা জানেন না?

আমীর সাহেব হাদীসটা পড়েছেন তবে এটার উপর আমল করার কথা তার কখনও মনে হয় নি। তার সামনে কত লোক কত রকম প্রশংসা করে। তার মনটা তখন গর্বে ভরে যায়। মাটি ভরার হাদীসটা মনে থাকে না। বাম দিকে একজন লোক এতক্ষণ গোমড়া মুখে বসে ছিল। এ পর্যায়ে তিনি মুখ খোলেন। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেন,

- আমি হাদীসটির ব্যাখ্যা পড়েছি। মিকদাদ (রাঃ) এবং অন্য একদল বলেছেন সত্যি সত্যিই মুখে মাটি ভরে দিতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছে, মাটি বলতে এখানে আসলে মাটি উদ্দেশ্য নয় বরং ধমক দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যাটা শুনে রেজা প্রথমে হুরমত আলীর দিকে

তাকিয়ে বলে,

- দেখলেন তো এক হাদীসের দুরকম ব্যাখ্যা হয় কিনা?

রেজার কথা শুনে হুরমত আলীর মুখটা লাল হয়ে যায়। তার নাকের ডগায় বিলবিল করতে থাকে। তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রেজা উপহাস করে বলে,

- খুব যে বড় গলায় বলে বেড়ান এক হাদীসের দুরকম ব্যাখ্যা হয় না। এখন তো দেখি নিজেরাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা শুরু করেছেন। ওসব ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করুন। এখনই কেউ গিয়ে বাইরে থেকে মাটি নিয়ে আসুন, আমীর সাহেব নিজে হাতে এই ব্যক্তির মুখে সেটা ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়ে দিক। হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে।

রেজার কথা শুনে লোকটার মুখটা আবারও গোমড়া হয়ে যায়। এই চেষ্টা ব্যার্থ হয়েছে দেখে আমীর সাহেব বলেন,

- অন্য কোন উপায় কি নেই?

হালকা হেসে রেজা বলে,

- উপায় একটা আছে।

উপায় আছে শুনে আমীর সাহেবের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। উৎসাহী হয়ে বলেন,

- সেটা কী?

রেজা বলতে থাকে,

- হেলা করতে হবে।

আমীর সাহেব যেনো আকাশ থেকে পড়লেন।

- হেলা? এখানে হেলা কীভাবে হবে?

- এই যেমন ধরুন বাজার থেকে এক কেজি আটা কিনলেন। তার মধ্যে এক চিমটি মাটি মিশিয়ে খামীর করে রুটি তৈরী করলেন। সেই রুটি জামাই আদর করে এই লোকের মুখে ভরে দিলেন। কি বলেন?

সমাধানটি আমীর সাহেবের নিকট উত্তমই মনে হচ্ছিল। তবে রেজার মুখের হাসি দেখে আমীর সাহেব বুঝতে পারেন সে উপহাস করছে। এ প্রসঙ্গে তাই তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে বিনীত ভাবে বললেন,

- দয়া করে এবারের মতো আমাদের একটু ছাড় দিন। এতো কঠিন করবেন না।

রেজা এবার ভীষণ রেগে যায়। উত্তেজিত হয়ে বলে,

- ছাড় দেবো! কিন্তু আপনারা তো কাউকে ছাড় দেন না। কোনটি ফরজ কোনটি নফল, কোন হাদীসের কি ব্যাখ্যা এসব লক্ষ্য না করে অন্যদের কার্যকলাপ সামান্য হাদীস বিরোধী মনে হলেই তার পিছনে জমের মতো

লেগে যান। শিরক-বিদয়াতের অপবাদ দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। আর এখন বলছেন আপনাদের ছাড় দিতে!

রেজার কথায় কেউ কোনো উত্তর দেয় না। সবাই চুপ থাকে। কিছুক্ষণ নিরব থেকে রেজাও নিজেকে শান্ত করে নেয়। তারপর বলে,

- ঠিক আছে এখন ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কথাটা শুনে উপস্থিত সবাই ভীষণ খুশি হয়। আমীর সাহেব আগ বাড়িয়ে বলেন,

- ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে রেজা বলে,

- সারা বিশ্বে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত ও নিপীড়িত। কাফির মুশরিকদের হাতে লাঞ্চনা গঞ্জনার শিকার। এক সময় যারা সারা বিশ্ব শাসন করেছে তারাই আজ কাফির মুশরিকদের গোলামে পরিণত হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য মসজিদে মসজিদে দোয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ আলেম-ওলামা ও লেখক-গবেষক প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন সমাধান পেশ করছে। তবু এ দুরাবস্থা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না কেনো?

আমীর সাহেব কিছুমাত্র বিলম্ব না করে বলেন,

- এর কারণ তো স্পষ্ট। আজ মুসলিমরা সহীহ আক্বীদা

থেকে দূরে সরে গেছে। তারা শিরক-বিদয়াতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাই তো শতবার দোয়া করলেও আল্লাহ তাদের সাহায্য করছেন না।

শিরক বিদয়াতের প্রসঙ্গ উঠতে দেখে রেজা সামান্য কৌতুহলী হয়ে বলে,

- শিরক বিদয়াত বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন?

- এই যেমন ধরুন তাবীজ ব্যবহার করা শিরক আর প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর মোনাজাত করা বিদয়াত ইত্যাদি।

কথাটা শুনে রেজার মনটা হেসে ওঠে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এসব ওলামা ও গবেষকরা বোকা বনে গেছে। তাই তো ইসলামের বড় বড় সব বিষয় পরিত্যাগ করে তাদের কেউ পড়ে আছে টুপি-পাঞ্জাবী নিয়ে আর কেউ পড়ে আছে তাবীজ ও মোনাজাত নিয়ে। এদের বাড়াবাড়ির কারণে অনেক সময় ইসলামের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। শায়েখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রহঃ) উল্লেখ করেন, আফগানিস্তানে যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছিল সৌদি আরবের কেউ কেউ বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে সেখানে যায় সহায়তা করার জন্য। কিন্তু আফগান মুসলিমদের হাতে তাবীজ দেখে তারা বলে, এরা তো মুশরিক। এখানে

মুশরিকদের সাথে নাস্তিকদের যুদ্ধ হচ্ছে। ফলে অর্থ সাহায্য না করে তারা ফিরে যায় এবং আমোদ-ফুর্তি করে সেসব সম্পদ নিঃশেষ করে। এসব খুটি-নাটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহকে এভাবে খন্ড-বিখন্ড করাই কাফিরদের উদ্দেশ্য। একারণে দেখা যায় তথাকথিত সহীহ হাদীসের অনুসারীরা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও তাদের অনুসারী মুসলিম শাসকদের নিকট বিশেষ প্রিয়ভাজন হিসেবে গণ্য। নিজের অজান্তেই রেজার চেহারায় বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। সে উপহাস করে বলে,

- আপনি বলতে চাচ্ছেন মুসলিমদের সাহায্য করার সব ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহর কালামকে সম্মান করে গলায় ঝুলায় আর নামাজের পর হাত তুলে দোয়া কালাম পড়ে এই জঘন্য অপরাধের কারণে আল্লাহ সাহায্য করছেন না?

আমীর সাহেব এবং তার দলবল আসলে এই কথাটিই বলতে চায়। অন্য লোক যা-ই বলুক তাদের মতে তাবীজ তুমার আর দোয়া মোনাজাতের বিষয়টা অতি জঘন্য অপরাধ। তবে রেজার কথা বলার ভঙ্গি দেখে তিনি আরও কিছু উদাহরণ পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেন,

- এছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে। যেমন, রফউল ইয়াদাইন না করা, জোরে আমীন না বলা, পায়ে পা না মিলানো, বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া, ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়া ইত্যাদি।

এই লম্বা ফিরিস্তি শুনে রেজা নিচের ঠোঁটটি যথাসম্ভব বাঁকা করে বলে,

- এই সব!

রেজাকে এভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে দেখে আমীর সাহেব মর্মাহত হন। আক্ষেপ করে বলেন,

- এটা মোটেও সহজ বিষয় নয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে উল্লেখিত আছে। যে কোনো মূল্যে আমাদের সহীহ হাদীস মেনে চলা উচিৎ। জান গেলেও সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করা যাবে না। আপনাকে একটা কাহিনী বলছি শোনেন, মুসলমানরা একবার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উক্ত যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হয়। মোয়াজ্জেম সর্দার এবং ইদু বিশ্বাস নামে দুজন ব্যক্তি যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেন। তারা ছিলেন সহীহ হাদীসের অনুসারী। কিন্তু পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে, কোনো এক মসজিদে তারা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করেন। ইদু বিশ্বাস তখন বলে, আমরা রফউল ইয়াদাইন করলে ইংরেজ সরকার বুঝে

ফেলবে আমরা মুজাহিদ তাই আজকের মতো আমরা মাজহাবী স্টাইলে নামাজ পড়বো। কিন্তু মোয়াজ্জেম সর্দার উত্তেজিত হয়ে বলেন, “এই ইদু বিশ্বাস! তুমি কি মনে করেছো মানুষের ভয়ে আমি রফউল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করবো! জান গেলেও আমি সহীহ হাদীসের উপর টিকে থাকবো”। ফলে ইদু বিশ্বাস রফউল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করেন কিন্তু মোয়াজ্জেম সর্দার রফউল ইয়াদাইন করেন। ইংরেজরা এটা দেখে বুঝতে পারে তিনি জিহাদে শরীক ছিলেন। ফলে মোয়াজ্জেম সর্দারকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা ফাঁসিতে ঝুলালেন। কিন্তু ফাঁসির দড়ি ছিড়ে গেলো। এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করেও তারা ফাঁসি দিতে পারলো না। প্রতিবারই দড়ি ছিড়ে গেলো। শেষে তারা তাকে ছেড়ে দিলে তিনি পায়ে হেটে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে আসলেন। দেশে এসে তিনি একটা বড় মাহফিল করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার-হাজার লোক উক্ত মাহফিলে হাজির হয়। একজন ব্যক্তি মোয়াজ্জেম সর্দারর জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। তিনি মোয়াজ্জেম সর্দারকে বলেন, হুজুর এত লোকের খাবারের ব্যবস্থা তো আমি করতে পারবো না। মোয়াজ্জেম সর্দার তাকে বলেন, আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা তো করেছো? সেটা নিয়ে এসো। সেই

খাবার নিয়ে আসা হলে তিনি তাতে চামচ ঢুকিয়ে খাবার বের করছিলেন আর মানুষকে খাওয়াচ্ছিলেন। এভাবে ঐ সামান্য খাবার হাজার হাজার মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা শেষ হতেই পাশ থেকে কয়েকজন বলে ওঠে,

- সুবহানাল্লাহ!

সবাইকে ভড়কে দিয়ে রেজা বলে ওঠে,

- নাউজু বিল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ!

কথাটি শুনে সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রেজার দিকে দৃষ্টি ফেলে। রেজা মুচকি হেসে বলে,

- আপনারাও দেখছি ভন্ডপীরদের মতো কেরামতীর কাহিনী বলেন!

আমীর সাহেব মুখটা ভার করে বলেন,

- কেরামতের কথা শুনলেই কি নাউযু বিল্লাহ বলতে হবে!

রেজা আবারও হেসে বলে,

- কেরামতের কথা শুনে নয়, আপনাদের বুযুর্গের হাদীসবিরোধী কাজ দেখে নাউযু বিল্লাহ পড়লাম।

কথাটা শুনে আমীর সাহেব চমকে ওঠেন। ভেবেছিলেন কাহিনীটি শুনিয়ে ছেলেটাকে বাজিমাত করে দেবেন।

উল্টো সে বলে কিনা কাহিনীটা হাদীসবিরোধী! সহীহ হাদীসের অনুসারীদের মান-সম্মান এবার নিঃশেষ হয়ে গেলো। তবে একেবারে হতাশ হলেন না। নিজের মনকে বললেন,

- হাদীসটা বুখারী মুসলিমের না হলে হয়। আপাতত জাল-জয়ীফ একটা বলে মান রক্ষা করা যাবে।

তারপর কিছুটা ভয়, কিছুটা আশা নিয়ে তিনি বলেন,

- কাহিনীটা কোন হাদীসের বিরুদ্ধে?

আমীর সাহেবের উদ্দেশ্য রেজা বুঝতে পারে। মাথাটা ডান থেকে বায়ে নাড়িয়ে বলে,

- না, না। শুধু হাদীসবিরোধী নয় কুরআন-হাদীস উভয়ের বিরোধী।

আমীর সাহেব এবার পুরোমাত্রায় হতাশ হয়ে যান। হাদীস বিরোধী হলে জাল-জয়ীফ একটা কিছু বলে মান রক্ষা করা যায় কিন্তু কুরআন বিরোধী হলে তো আজ আর রক্ষা নেই। তাছাড়া রেজার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার কাছে শক্ত দলীল রয়েছে। এ পর্যায়ে আমীর সাহেব নিজেকে খুব অসহায় বোধ করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন এ আলোচনার শেষটা না শোনাই অধিক কল্যাণকর। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বিনীত স্বরে বলেন,

- শুনলাম আপনি কুরআনের হাফেজ। কুরআন মুখস্থ করা সত্যিই বড় ফজিলতের ব্যাপার!

রেজা বুঝতে পারে লোকটা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। তাকে কিছুটা সুযোগ দেওয়ার জন্য সে বলে,

- আপনার কতটুকু মুখস্থ আছে?

রেজা টোপ গিলেছে দেখে আমীর সাহেব কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করেন। প্রশ্নটির যতটুকু সম্ভব লম্বা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

- সুরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত, আয়াতুল কুরসী আর তার পরের আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ....

আমীর সাহেব যতদূর স্মরণ হয় বলতে থাকেন,

এক পর্যায়ে তিনি কিছুটা বিরতি নেওয়ার জন্য থামলে রেজা বলে,

- সূরা নামলের কোনো আয়াত কি আপনার মুখস্থ আছে?

আমীর সাহেব কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করেন। তারপর তেলোয়াত করেন,

- বলুন, আকাশ পৃথিবীর কেউ গায়েব সম্পর্কে অবহিত নয় কেবল আল্লাহ ছাড়া।

সাথে সাথেই রেজা বলে,

- যদি কেউ গায়েবের জ্ঞান দাবী করে তবে তার বিধান কি?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে আমীর সাহেব বলেন,

- কাফের হয়ে যাবে, বেইমান হয়ে যাবে।

- ধরুন, আপনি দাবী করলেন, আমার পকেটে কয় টাকা আছে সেটা আপনি বলে দিতে পারেন। অথবা, ঢাকনা না খুলেই হাড়িতে কতটুকু রুটি-গোশতো আছে সেটা আপনি বলে দিচ্ছেন।

আমীর সাহেব বলেন,

- তাহলে ঈমান শেষ। কেল্লা খতম।

রেজা আবার বলে,

- তাহলে একজন ব্যক্তি কিভাবে আগে থেকে বুঝে ফেললো যে আমি হাত ঢুকালেই হাড়ি থেকে এক হাজার লোকের খাবার বের হবে। এটা তো পুরো গায়েবী ব্যাপার। এটা কি কুফরী নয়!

নিজের অজান্তেই আমীর সাহেব কিছুক্ষণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন,

- এটা তো স্পষ্ট কুফরী। পীর-ফকীররা এসব উদ্ভট কাহিনী বর্ণনা করে।

রেজা অনুভব করে আমীর সাহেবকে খুব নিশ্চিন্ত মনে

হচ্ছে। রেজা কোথায় আঘাত করেছে বেচারা এখনও তা বুঝতে পারে নি। তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলে,

- আপনি নিজেই কিন্তু এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

আমীর সাহেব বোকার মতো বলে,

- আমি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ যে, মোয়াজ্জেম সর্দার বলল, যতটুকু খাবার রান্না করেছো তা আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর হাজার হাজার লোককে খাইয়ে দিলো। ঐ বেটা কোন সাহসে হাজার হাজার লোকের সামনে এক হাড়ি খাবার নিয়ে হাজির হলো! সে কিভাবে জানলো যে তার হাতে এই অল্প খাবার বেড়ে গিয়ে হাজার হাজার লোকের আহার যুগাবে। এটা গায়েবী জ্ঞান হয়ে গেলো না?

আমীর সাহেবের মুখটা আবার ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তিনি ফেসে গেছেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রেজা কৃত্রিম গাম্ভীর্য প্রকাশ করে বলে,

- এ বিষয়টা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলি কি বলেন?

কথাটা শুনে আমীর সাহেব প্রথমে কিছুটা খুশি হোন কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভীত হয়ে পড়েন। তার মনে হচ্ছে পরের কথাটাও তার বিরুদ্ধেই যাবে। তাই তিনি

সম্পূর্ণ নিরাবতা অবলম্বন করেন। রেজা বলে,

- বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- "পরনে কাপড় নেই মাথায় পাগড়ী" এটা শুনেছেন?

আমীর সাহেব কথাটার আগা-মাথা কিছুই বুঝলেন না। কার পরনের কাপড় নেই সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবেন। আড়চোখে দেখে নিলেন তার পরনের কাপড় ঠিকই আছে। তবে কি মোয়াজ্জেম সর্দারের পরনের কাপড় ছিল না? হতেও পারে। কয়েকবার ফাসির দড়ি ছিড়ে পড়ে গেলে পরনের কাপড়টা খুলে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এর মধ্যে রেজার গলা শোনা যায়,

- অনেক বুযুর্গ সারা রাত নফল নামায পড়ে ফজরের নামায ফওত করে ফেলে। আপনাদের মোয়াজ্জেম সর্দারের কাজটা অনেকটা সেরকম।

আমীর সাহেব ভাল করে স্মরণ করে দেখেন মোয়াজ্জেম সর্দারের ঘটনার মধ্যে সারা রাত নফল পড়ে ফজর নামাজ ফওত করে ফেলার মতো কোনো কাহিনী আছে কিনা। কিন্তু মনে করতে পারেন না। অবাক হয়ে বলেন,

- কীভাবে?

রেজা বলতে থাকে,

- দেখুন, পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যুদ্ধের

ময়দান থেকে যে পলায়ন করে সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসে। সহীহ হাদীসে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসাকে সাতটি সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রফউল ইয়াদাইনের ব্যাপারে কিন্তু এরকম কিছু বলা নেই। কিন্তু মোয়াজ্জেম সর্দার এসব আয়াত ও হাদীস ভুলে প্রাণের ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েছে কিন্তু প্রাণ গেলেও রফউল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করতে রাজি হয় নি। বিষয়টা পরনের কাপড় খুলে মাথায় পাগড়ি বাঁধার মতো নয় কি?

আমীর সাহেব নিরব থাকেন। তিনি বুঝতে পারছেন তার ধারনাটাই ঠিক। আসলেই মোয়াজ্জেম সর্দারের পরনে কোনো কাপড় ছিল না। ঐ বেটা একটা গাছ পাগল। এখন মনে হচ্ছে ওর কাহিনী বলাটাই ঠিক হয় নি। রেজা বলতে থাকে,

- আপনারা যেসব বিষয় সংশোধন করার জন্য জোর গলায় দাবী জানাচ্ছেন সেসব বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে দলীল প্রমাণ আছে। আলেম-ওলামাদের দুটি মতও আছে। হযরত আয়েশা বলেছেন, আল্লাহর রাসুল রমজান বা রমজানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি কিয়াম করেন নি। কিন্তু ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ থেকে সহীহ বুখারী মুসলিম প্রমাণ

আছে আল্লাহর রাসুল তেরো রাকাত পড়েছেন তারপর আবার দু'রাকাত ফজরের সুন্নাত আদায় করেছেন। অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (সঃ) রাতের বেলা দুই দুই করে যত খুশি নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। এটাও সহীহ হাদীস। সুতরাং বিশ রাকাত তারাবী পড়লে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এটা সঠিক কথা নয়। ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে ইমাম তবারানী ইবনে মাসউদ থেকে ছয় তাকবীরের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-হাইছামী তার রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন। তাছাড়া আবু দাউদ শরীফে দু জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে আল্লাহর রাসুল ঈদের তাকবীর দিতেন জানাযার তাকবীরের মতো। অর্থাৎ জানাযাতে যেমন তাকবীরে তাহরীমা বাদে তিন তাকবীর দেওয়া হয়। ঈদের সলাতে প্রতি রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা বাদে তিন তাকবীর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মোট ছয় তাকবীর হবে। এই হাদীসটিও সহীহ। কুরআনের তাবীজ গ্রহণ করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে খোদ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত ছিল। স্বয়ং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব কিতাব-আত-তাওহীদে এটা উল্লেখ করেছেন। নামাজের শেষে মোনাজাতের ব্যাপারেও ওলামায়ে কিরামের মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে মতামত রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের যে কোনো একটা মত

মেনে চললে গোনাহ হবে না। অতএব দয়া করে আপনারা এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা বন্ধ করুন। এমনিতেই মুসলিম উম্মাহ শতদা বিভক্ত। খুটি-নাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহকে আরও বিভক্ত করবেন না।

এতক্ষণে আমীর সাহেব কিছু বলার সুযোগ পেলেন। বললেন,

- আমরা কি মুসলিমদের বিভক্ত করছি? আমরা তো এক করার চেষ্টা করছি। মুসলিমরা চার মাজহাবে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি সকল মুসলিমকে একটা মতের উপর নিয়ে আসতে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জাতিকে এক দল আর এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই তো আমরা এতো চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছি।

কথাটা শুনে রেজার মাথায় রাগ চড়ে যায়। শেয়াল যদি মুরগি পাহাড়া দেওয়ার দাবী করে তবে যে কারও রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। যারা খুটি-নাটি বিষয় নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা যদি বলে আমরা মুসলিমদের একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করছি তবে এটা তো অবশ্যই হাস্যকর দাবী বলে গণ্য হবে। কথাটা শুনে তাই রেজা বেশ জোরে হেসে ওঠে। তার হাসি

দেখে আমীর সাহেবের মুখটা কালো হয়ে যায়। মনে মনে ভাবেন, আবারো কি হাদীসবিরোধী কথা হয়ে গেলো! কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে রেজা বলে,

- একতার অর্থ বোঝেন?

আমীর সাহেব দ্রুত মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- একতা মানে একমত।

- উ-হু। হলো না। একতা মানে একমত নয়। একতা মানে এক মাথা।

আমীর সাহেব রেজার কথার আগা-মাথা কিচ্ছু বুঝলেন না। নিচের ঠোঁটটা ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন,

- মাথা তো সবার একটা করেই থাকে।

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- একটা করে নয় মুসলিমদের একটাই মাথা হতে হবে। একজন নেতা থাকবে সবাই তার আনুগত্য করবে। সবার ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু মুসলিম উম্মাহর নেতা হবে একটাই। যাকে বলা হবে খলীফা। এর নামই হলো একতা।

আমীর সাহেব ভীষণ অবাক হয়ে বলেন,

- ভিন্ন মত থাকবে!

রেজা তাকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করে।

- দেখুন হযরত উমর যখন খলীফা ছিলেন তখন সাহাবাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল। এমনকি খোদ খলীফা উমরের সাথেও অনেকের দ্বিমত ছিল। হযরত উমর বলতেন, তামাত্তু হজ্জ করা যাবে না অন্য সকল সাহাবারা বলতেন করা যাবে। এমন কি তারা উমর (রাঃ) এর কথার বিরুদ্ধে আমলও করতেন। হযরত উমর বলতেন, গোসল ফরজ হলে যদি কেউ পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করা যাবে না। দু একজন ছাড়া অন্য সকল সাহাবার মত ছিল এর বিরুদ্ধে। হযরত উসমানের যুগে যাকাতের মাসয়ালায় আবু জার (রাঃ) তার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে মুসলিম উম্মাহ চারটি ভিন্ন ভিন্ন মাজহাব বা মতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সবাই এক খলীফার অধীনে একতাবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল কিন্তু তাদের মাথা একই ছিল, খলীফা একজনই ছিল। আপনাদের মতো কেউ এমন মনে করে নি যে একতাবদ্ধ হতে হলে খুটি-নাটি সব বিষয়ে পুরা মুসলিম উম্মাহকে একমত হতে হবে। উপোরন্তু খলীফা হারুন অর রশীদ ইমাম মালিকের মুয়াত্তা পাঠ করে খুশি হয়ে বলেন। আমি কা'বা শরীফে আপনার মুয়াত্তা ঝুলিয়ে দেবো আর সবাইকে সেই অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য করবো। ইমাম মালিক তখন যে

কথা বলেছিলেন, সেটা আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন, একেক এলাকায় একেক জন দক্ষ ও যোগ্য আলেম রয়েছেন। ঐ এলাকার মানুষ তাকে অনুসরণ করে। মানুষকে এভাবে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দেন। অর্থাৎ খুটি-নাটি বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে জোর করে একমত করানোর চেষ্টা করা ইমাম মালিক পছন্দ করেন নি। অন্য কোনো আলেমও এটা পছন্দ করেন নি। তারা এসব বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন। ছাড় দিয়েছেন বলেই বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও তারা এক খলীফার অধীনে একতাবদ্ধ হতে পেরেছেন। একতার অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক স্বাধীনতাটুকু হরণ করতে হবে। কিন্তু আপনারা প্রতিটি খুটি-নাটি বিষয়ে সকল মুসলিমকে একমত করতে চাচ্ছেন। কোনো একটি বিষয়ে দ্বিমত হলেই মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন। এধরণের চরমপন্থা অবলম্বনের কারণে মুসলিমরা একতার বদলে শতদা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এমন কি আপনারা যারা নিজেদের সহীহ হাদীসের অনুসারী বলে দাবী করেন তারাও দু'একটি মাসয়ালায় দ্বিমত হলে নিজেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এভাবে চারটি মাজহাবকে এক করতে গিয়ে নিজেরা তার চেয়ে বেশি দলে ভাগ হয়ে গেছেন। লা-মাজহাবীরা নিজেরাই আজ লাজ-লজ্জা ভুলে নিজেদের

মধ্যে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। একজন আরেকজনকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত মনে করছে। চার মাজহাবের অনুসারীরা কিন্তু চারটি মাজহাবকেই সঠিক পথ মনে করে। ফলে কেউ কাউকে পথভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দেয় না। তাহলে কারা একতা বজায় রেখেছে আর কারা শতদা বিভক্ত হয়েছে বলুন!

আমীর সাহেব মুখে কিছুই বলেন না। তবে মনে মনে এই বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হোন। মুখটা ভার করে বলেন,

- তাহলে মুসলিমরা আজ এক হতে পারছে না কেনো?

রেজা মুখটা গম্ভীর করে বলে,

- এটা একটা ভাল প্রশ্ন। দেখুন মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার জন্য কাফিররা ষড়যন্ত্র করে মুসলিম দেশ গুলোকে বিভিন্ন সীমানায় বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রতিটা দেশে নিজেদের ইচ্ছামত মুনাফিক শাসকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুফরী আইন-কানুন চালু করেছে। প্রতিটা মুসলিম দেশ নিজের উপর হামলা হলে প্রতিরোধ করছে। অন্য কোনো মুসলিম দেশের উপর কাফিররা হামলা করলে প্রতিরোধ তো দুরের কথা উল্টো তেল দিয়ে সহায়তা করছে। এটাই হলো আসল বিভক্তি। এই বিভক্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা

করতে হবে। এই সব সীমানাকে ভেঙে দিতে হবে। মুসলিম নামধারী এসব তাগুতী শাসকদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে পুরো মুসলিম উম্মাকে এক খলীফার অধীনে এক দেশ এক জাতিতে পরিণত করতে হবে। আরবে আজমে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। পৃথিবীর উত্তর মেরুতে কোনো মুসলিমের উপর অত্যাচার করা হলে দক্ষিন প্রান্তের মুসলিমরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। এটাই হলো সেই একতা কুরআন হাদীসে যার কথা বলা হয়েছে।

তাগুতী শক্তির সাথে যুদ্ধের কথা শুনে আমীর সাহেবের মন-মগজ প্রকম্পিত হয়। তিনি আতংকিত হয়ে বলেন,

- ওরে বাবা! এসব করতে গেলে তো রাষ্ট্রদ্রোহীতা হয়ে যাবে। হাদীসে শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সে হিসেবে প্রতিটা দেশের মুসলিমদের তাদের নিজ নিজ ভুখন্ডের শাসকদের আনুগত্য করে যেতে হবে। যদিও তারা জালেম হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, শাসক জালেম হলেও তার বায়াত ভঙ্গ করা যাবে না।

কথাটা শুনে রেজা বেশ জোরে হেসে ওঠে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে,

- বায়াত? তাগুতের হাতে বায়াত? শয়তানী শক্তির

হাতে বায়াত? তাগুতী আইন দিয়ে যে শাসক রাষ্ট্র চালায় আপনারা তার হাতে বায়াতের কথা বলছেন?

আমীর সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। হাদীসে মুসলিম শাসকদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে তাই আমরা এসব শাসকদগের আনুগত্য করে যাচ্ছি। তারা কি করে বা কোন আইনে দেশ চালায় সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

রেজা কৌতুকের স্বরে বলে,

- এখানেই তো আসল মজা। আপনাকে একটা গল্প বলি। একজন লোক রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাটুতে জখম হলো। ডাক্তার তাকে একটা মলম দিয়ে বলল,

- যেখানে লেগেছে সেখানে সকাল বিকাল মলমটা লাগাবেন।

ঐ লোক কি করলো? প্রতিদিন সকালে বিকালে রাস্তার যেখানে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গিয়েছিল সেখানে মলম লাগাতে থাকলো। এভাবে কি ব্যাথা ভাল হবে?

আমীর সাহেব সহাস্যে মাথা নেড়ে বলেন,

- তাই কি আর হয়। এই লোকটা একটা আস্ত পাগল।

কথাটা বলে আমীর সাহেব হাসতে থাকেন। তখনই

তার কানে আসে রেজা বলছে,

- আপনারাও কিন্তু একই পাগলামী করছেন। হাটুর বদলে রাস্তায় মলম লাগাচ্ছেন।

আমীর সাহেবের মুখটা আবার কালো হয়ে যায়। আজ সারাটা দিন তিনি কেবল অপমানিতই হচ্ছেন। মুখটা লাল করে বলেন,

- কেনো?

- কেনো আবার। খুটি-নাটি বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী ইত্যাদি বরেণ্য ব্যক্তিদের আমল থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে। ঐ সকল মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই চার মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চারটি মাজহাবে আপনি এমন কোনো মত পাবেন না যেটা কোনো না কোনো বরেণ্য সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে বর্ণিত নেই। তাছাড়া যুগের পর যুগ সকল সনামধন্য সব ফকীহ মুহাদ্দিস এই চারটি মাজহাবকে সমর্থন করেছেন। মোট কথা, এসব মাজহাব কাফির মুশরিকরা আবিষ্কার করেনি। বরং সাহাবায়ে কিরামের মতামতই এর উৎস আর বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের নিকট এগুলো সমর্থিত। অথচ বোকামী বশত আপনারা চার মাজহাবকে বিচ্ছেদ মনে করে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন। বিপরীত দিকে কাফির মুশরিকদের রচিত

সীমানাকে দেশ হিসেবে মেনে নিয়ে তার বিরুদ্ধাচারণ করাটা দেশদ্রোহীতা হিসেবে গণ্য করছেন। আর কাফিরদের সমর্থিত সরকারকে বৈধ শাসক হিসেবে গণ্য করে তাদের আনুগত্য করে যাওয়ার ফতোয়া দিচ্ছেন। এ বিষয়ে বায়াত পূর্ণ করার হাদীস প্রয়োগ করছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী যুগের বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীনের মতামত ও বাখ্যা বিশ্লেষণকে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত কথা হিসেবে আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করছেন। কিন্তু কাফির-মুশরিকদের মস্তিস্কপ্রসূত চিন্তাধারাগুলোকে ঠিকই মেনে চলছেন। এ ধরণের কথা যারা বলে তারা গবেষক নাকি গো-শাবক সেটাই ভাববার বিষয়।

গবেষক আর গো-শাবক এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কি পার্থক্য সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবার পর আমীর সাহেব বলেন,

- কিন্তু সহীহ হাদীসে তো শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে নাকি?

আমীর সাহেবের পাশের লোকটি এবার হাদীসটির আরবী ইবারত মুখস্ত বলেন। তারপর বলেন,

- এই হাদীসে শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এমন কি শাসক যদি অন্যায় অবিচার করে তবু ধৈর্য

অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যতক্ষণ না তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরী পাওয়া যায় ততক্ষণ তার বায়াত ভঙ্গ করা যাবে না।

প্রশ্নটির জন্য রেজা প্রস্তুত ছিল। কথাটা শেষ হতেই সে বলে,

- বর্তমান যুগের নামধারী মুসলিম শাসকদের মধ্যে কোনো কুফরী আপনারা খুঁজে পান নি?

লোকটি ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়ে। তাকে মাথা নাড়তে দেখে আমীর সাহেবও মাথা নাড়েন। রেজা উপহাস করে বলে,

- তাবীজ ঝুলালে শিরক হয় আর ইসলামবিরোধী আইন-কানুন চালু করলে শিরক হয় না!

আমীর সাহেব বলেন,

- দেখুন, কেবল ইসলামবিরোধী আইন-কানুন চালু করার কারণে কেউ কাফির হবে না। তবে এসব আইনকে যদি কেউ সঠিক মনে করে সে কাফির হবে।

রেজা বলে,

- বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী শাসকরা ইসলামবিরোধী আইনকে সঠিক মনে করে, নাকি বাতিল মনে করে?

- সেটা তাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হবে।

- যদি জিজ্ঞাসা না করতেই কেউ জবাব দেয় তাকে জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? তারা কি ইসলাম বিরোধী সংবিধানকে সম্মান করার কথা বলে না? কুফরী আইনে যেসব বিচার-আচার হয় সেগুলোকে ন্যায় বিচার বলে না? ইসলাম বিরোধী আইনকে ন্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা কি সেটাকে বৈধ মনে করা নয়!

আমীর সাহেব এই কথার কোনো উত্তর দিতে পারেন না। শুধু মুখটা কালো করে বলেন,

- মুসলমানদের কাফির বলা খারেজীদের অভ্যাস।

রেজা বলে,

- আর যে কুফরী করে তাকে কাফির না বলাটা কাদের অভ্যাস! যদি কেউ আবু জেহেল বা আবু লাহাবকে কাফির না বলে তবে কেমন হবে?

আমীর সাহেব এবার পুরো চুপ হয়ে যান। রেজা বলতে থাকে,

- তাছাড়া শাসক মুসলিম হলেই সে যা খুশি তাই করবে আর সেটা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে এমন নয়। ইমাম হুছাইন তার সময়ের শাসক ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কুফাতে গমন করেছিলেন সেটা কি জানেন?

আমীর সাহেব মাথা নাড়েন। তিনি জানেন। রেজা বলতে থাকে,

- আবু বকর আল-জাসসাস তার আহকামে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একাধিক ব্যক্তিকে তার সময়কার শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অর্থ সম্পদ ও সমর্থন দিয়ে সহায়তা করেছেন। এটা জানেন?

আমীর সাহেব ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়তে থাকেন। এটা তিনি জানেন না। তিনি সহজভাবে বলেন,

- রসুলের হাদীস থাকতে কারো মতামতের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। রসুল বলেছেন, শাসক যতক্ষণ মুসলিম থাকবে তার আনুগত্য করতে হবে।

রেজা উত্তেজিত হয়ে বলে,

- আপনি কি মনে করেন এই হাদীসের অর্থ একজন মুসলিম শাসক যত মারাত্মক অপকর্মই করুক যতক্ষণ না সে কাফির হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না?

আমীর সাহেব দাত-মুখ শক্ত করে বলেন,

- হ্যাঁ, ঠিক তাই। যত অপকর্মই করুক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। এটাই তো হাদীসের কথা।

- আপনার কথা কতদূর পৌঁছায় সেটা কি ভেবে

দেখেছেন?

- অবশ্যই দেখেছি।

- আমি কি একটু ব্যাখ্যা করে শোনাবো?

আমীর সাহেব মাথা নেড়ে বলেন,

- হু।

রেজা শুরু করে,

- ধরুন একজন মুসলিম শাসক রাজ্যের প্রতিটা মুসলিম রমণীকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি অমুসলিমদের সাথে জিনা করে জিনার সন্তান পেটে ধারন করতে বাধ্য করে। প্রতিটি মুসলিম যুবককে পরস্পরের মধ্যে সমকামীতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে। পোশাক পরিধান করার সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারন করে পয়তাল্লিশ বছর। অর্থাৎ পয়তাল্লিশ বছরের নিচে সকল মুসলিম যুবক-যুবতীদের রাস্তাঘাটে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য করে। তবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিটি এলাকাতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদে ওযু খানার পাশাপাশি একটা করে পোশাক খানা থাকবে। মানুষ উলঙ্গ হয়ে মসজিদে এসে পোশাক খানা থেকে পোশাক গ্রহণ করে এবং ওজু খানা থেকে ওজু করে নামাজ পড়বে। কিন্তু নামাজের পর পোশাকগুলো খুলে আবার উলঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। রোজা রাখা

সম্পূর্ণরুপে নিষেধ। মাজহাবী বা লা-মাজহাবী উভয় প্রকার মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুরআন-হাদীসের উপর অধিক সময় ব্যয় করলে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়বে এই যুক্তিতে কুরআন মুখস্ত করা বা হাদীস চর্চা করা নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু সূরা ফাতিহাটা আর ছোট ছোট দু-চারটে সূরা মুখস্ত করা বৈধ করা হয়। সালামের বদলে দেখা হলেই একে অপরকে থাপ্পর মারার আইন পাশ করা হয়। নিয়ম করা হয় বাপ মারা যাওয়ার পর মা-কে ছেলে বিবাহ করবে, মেয়েকে বাবা বিবাহ করবে ...

আমীর সাহেব আর সহ্য করতে পারেন না। মুখে ভীষণ বিরুক্তি ফুটিয়ে তুলে বলেন,

- আহা! এসব কি হচ্ছে? ছিঃ ছিঃ

রেজা তাকে থামিয়ে বলে,

- না, না। অধৈর্য হবেন না। শাসকের অত্যাচার-অবিচার, এসব দেখে ধৈর্য অবলম্বন করার শিক্ষায় তো সারা জীবন মানুষকে দিয়েছেন নাকি! তাছাড়া এই শাসক তো কাফির নয়। সে স্বীকার করে যে এসব পাপের কাজ। কিন্তু যেহেতু তখনকার সময় বিশ্বের পরাশক্তি হলো আফ্রিকা জঙ্গলের জংলী জাতি। এসব আইন পাশ না করলে তারা আক্রমণ করে যে কটা

মসজিদ আছে তা ধ্বংস করে দেবে। তাই বাধ্য হয়ে ঐ শাসককে এসব আইন পাশ করতে হচ্ছে। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করুন।

আমীর সাহেব যেনো দোটানায় পড়ে গেলেন। এই পরিবেশে কি করা যায় সেটা নিয়ে মনে মনে ভাবেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তিনি এধরণের পরিবেশে ধৈর্য অবলম্বন করতে পারবেন। কাপড় চোপড় বাদেই না হয় রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করবেন। তবে জান গেলেও রফউল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করবেন না। আর রোজা রাখতে না পারলেও ইফতারটা ঠিকই দু-মিনিট আগে করবেন। বর্তমান যুগেও তো শাসকদের অনেক অনাচার তারা সহ্য করছেন। অতএব, তিনি ঠিকই এধরণের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবেন। সেই সাথে তখনও যারা শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চাই তাদের বিরুদ্ধে উতাল পাতাল ফতোয়া দিয়ে আর খারেজী আখ্যায়িত করে ন্যাংটা নাচ করবেন। তবে এসব কথা তিনি মুখে বলেন না। তাকে নিরব দেখে রেজা বলে,

- আপনারা কেবল একটা হাদীসের দিকে লক্ষ্য রেখে যে কোনো অবস্থায় মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না এমন ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ অন্য রেওয়ায়েতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যতক্ষণ তারা সলাত

কায়েম করে। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে যতক্ষণ তারা আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠা করে। এসব হাদীস প্রমাণ করে কেবল কুফরী নয় বরং ইসলামের বড় বড় বিষয় পরিত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন সলাত কায়েম করা বা হুদুদ প্রয়োগ করা ইত্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করলে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কাজী ইয়াদ, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম ইজমা উল্লেখ করেছেন। মোট কথা, যে শাসক সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা রেখেছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে জুলুম-নির্যাতন করে বা কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়। যেহেতু সে মোটামুটিভাবে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত রেখেছে সেই খাতিরে তার জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে হবে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। আর যে শাসক মুসলিম নাম ব্যবহার করে কিন্তু কাফিরদের সাথে আতাত করে ইসলামকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে। ইসলামী আইন-কানুনকে মধ্যযুগীয় আখ্যায়িত করে মানব রচিত কুফরী আইন প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিম যুবক-যুবতীদের কাফিরদের হাতে তুলে দেয়। মুসলিমদের হত্যা করার জন্য কাফিরদের তেল সহায়তা করে। সে মুসলিমদের শাসক হিসেবে গণ্য নয়। এই হাদীসে তাকে আনুগত্য

করতে বলা হচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধও করা হচ্ছে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক। তাদের কোনো বায়াত নেই। বায়াত তো হতে হবে এমন আমীরের হাতে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। হুদুদ কায়েম করবে, মুসলিমদের নিরাপত্ত দেবে এবং তাদের সম্মানিত করবে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া আদায় করতে বাধ্য করবে।

আমীর সাহেব বুঝতে পারছেন এসব শাসকদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়টি বৈধ এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তবে কি শেষে তাকে যুদ্ধ করতেই হবে! না, তিনি এটা করতে পারবেন না। ভিন্ন কোনো যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা থেকে বাঁচা যায় কিনা তিনি সেটা ভেবে দেখেন। তারপর বলেন,

- কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া যুদ্ধ করা হারাম। আমাদের তো রাষ্ট্র ক্ষমতা নেই, অতএব আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কথাটা বলেই আমীর সাহেব উঠে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রেজা হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে বলে,

- রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না এটা একটা বিদয়াত। এর স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। উল্টো এর

বিপরীতে বহু সংখ্যক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আপনি যে, হাদীসটি উল্লেখ করলেন সেটির কথায় একবার ভাবুন! রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তবে ঐ রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম নাব্বী কাজী ইয়াদ থেকে উল্লেখ করেন, এ অবস্থায় রাষ্ট্র প্রধানের সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু ঐ কাফির রাষ্ট্র প্রধানের হাতে, তার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের হাতে নয়। তবু তাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে ...

এতদূর বলতেই আমীর সাহেব উঠে পড়েন। তিনি আর কিছু শুনতে চান না। তার ঘাড়ে যে শয়তানটি বসে আছে সত্য কথাগুলো সে তাকে আর শুনতে দিলো না। খুঁচিয়ে তুলে দিল। যাওয়ার সময় শুধু বলল,

- আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। বাকী কথা পরে শুনবো।

কথাটা বলে মুচকি হেসে রেজাকে খুশি করার চেষ্টা করেন। প্রতি উত্তরে রেজা মাথাটা বার কয়েক উপর থেকে নিচে ঝাঁকিয়ে প্রস্থান করে।

পাঁচ:

....

গত কয়েক দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর বড় বড় সব ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে রেজা বুঝতে পেরেছে তারা কেউই ইসলামের জন্য কিছু করতে প্রস্তুত নয়। উল্টো ইসলামকে ভাঙিয়ে নিজের জন্য কতটুকু করা যায় সেটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। হাজার হাজার স্বার্থপরের মধ্যে দু-একজন সত্যিকার দ্বীন-দরদী লোক খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর। নিজেকে রেজার ভীষণ অসহায় মনে হয়। মুসলিম জাতির এই দুর্বলতা ও দুরাবস্থা সে সহ্য করতে পারে না। নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিমদের জন্য সে কিছুই করতে পারছে না। ইসলামের বিধি-বিধান গুলো অবহেলিত ও পরিত্যাক্ত হতে দেখেও সে কিছু করতে পারছে না। এই অক্ষমতা তাকে দ্বিগুণ ব্যথিত করে। নিজের অজান্তেই তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে।

রেজার মন-মানসিকতা এখন অনেক বদলে গেছে।

আলেম-ওলামা, মোল্লাহ-মৌলোভী কারও সাথে মন খুলে কথা বলে না। তার মনে হয় এরা সবাই ঠগবাজ। মুসলমানের বেশটা কেবল ধারন করে আছে কিন্তু মুসলমানিত্বের লেশমাত্র এদের মধ্যে নেই। বেশিরভাগ সময়ই এখন সে একাকী থাকে। নির্জনে বসে শুধু কাঁদে। তার এই অবস্থা দেখে একদিন শাহিন বলে,

- কি হয়েছে তোর? কোথাও যাস না, কারও সাথে কথা বলিস না। সারাদিন একা বসে কান্না-কাটি করিস!

প্রশ্নটি শুনে রেজা বেশ কিছুক্ষণ শাহিনের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে,

- করার মতো তো এই একটা কাজই রয়েছে।

পরিবেশটা হালকা করার জন্য শাহিন তামাশা করে বলে,

- এই টা কোনো কাজ হলো?

কথাটা বলার পর শাহিনের মনে হলো রেজা হয়তো রেগে যাবে। তাই আড়চোখে তার চেহারাটা দেখার চেষ্টা করলো। রেজা তখনও শাহিনের দিকে তাকিয়ে ছিল। চেহারায় দুঃখের ছাপ আগের মতোই স্পষ্ট। শাহিনের কথাটা শুনে তার মুখে কোনো প্রভাব পড়ে নি। খুশি না হলেও হয়তো নাখোশও হয়নি। রেজা রাগান্বিত হয়নি দেখে শাহিন কিছুটা সাহস সঞ্চার করে

বলে,

- কান্না-কাটি করা মেয়েদের কাজ। পুরুষ মানুষের নয়।

এই কথাটা শুনে রেজার মুখটা আগের চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। মুখটা নামিয়ে বলে,

- যে পুরুষ মানুষ নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারে না তার সাথে মেয়েদের পার্থক্য কি? আল্লাহ পুরুষদের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন, যদি তারা সেটা করতে রাজি না হয় তবে তারা কি আর পুরুষ থাকে!

কথাটা বলে, রেজা আবারও কেঁদে ওঠে। এ অবস্থায় কি বলা যায় শাহিন বুঝে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ নিরব থেকে শান্তনা দিয়ে বলে,

- কিন্তু কাঁদলেই কি জিহাদ হয়ে যাবে!

দুটি চোখ মুছে শাহিনের দিকে তাকিয়ে রেজা বলে,

- হতেও তো পারে। রাসুল (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সত্যি সত্যিই শাহাদাত কামনা করে, সে যদি বিছানায় মৃত্যুবরণ করে তবু শহীদের মর্যাদা পেয়ে যায়।

রেজার মুখ থেকে শাহিন এর আগেও হাদীসটা শুনেছে। কিন্তু এর সাথে কান্নার সম্পর্ক কি সেটা সে বুঝতে পারে না। কৌতূহলী হয়ে বলে,

- ঠিকই তো। তাহলে জিহাদে যেতে না পারলে কান্নার কি আছে। বিনা কষ্টে যদি শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায় তবে তো সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না। ঠিক না?

কথাটা শুনেই রেজা হালকা শব্দে হেসে উঠে বলে,

- বোকা।

তাকে হাসতে দেখে শাহিনের মনটা খুশি হয়ে যায়। রেজাকে হাসানোর জন্যই শাহিন এই এমন বোকামী করেছে। আসলে সে অতো বোকা নয়। সেটা রেজাও জানে তবু তার কৃত্রিম বোকামীটা শুধরে দেওয়ার জন্য বলে,

- বেশির ভাগ মানুষ তোর মতো চিন্তা করে। তারা বলে, আমরা তো জিহাদে যেতে চায়, শহীদ হতে চায় কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না, এখনও সময় হয় নি ইত্যাদি। তারা এসব হাদীস দেখিয়ে বলে, আমরা ঘরে বসেই জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবো। এমন কিছু লোক যে আছে রাসুল সেটা আগে থেকেই জানতেন। তাই বলেছেন, শুধু মুখে শাহাদাত চাই এমন বললে হবে না বরং এ দাবীটা সত্য হতে হবে। কে অন্তর থেকে শাহাদাত চাই আর কে মুখে দাবী করে সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। তবে সব কিছুর একটা বাহ্যিক আলামত থাকে। যে ব্যক্তি কোনো কিছু তীব্রভাবে কামনা করে

সেটার জন্য তার মনটা উতাল-পাতাল করে। আমি জিহাদে গিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হতে চাই কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছি না। এ অবস্থায় আমার মনটা কি দুঃখ পাবে না, ব্যথিত হবে না?

শাহিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। অবশ্যই হবে।

- অন্তরে যদি কেউ সত্যিই দুঃখ পায় তবে চোখ দিয়ে অশ্রু তো এমনিই পড়বে। ইচ্ছা করলে কি তা ঠেকানো যাবে? পবিত্র কুরআনে একদল লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা জিহাদে যাওয়ার জন্য রাসুলের দরবারে আসে কিন্তু বাহনের অভাবে রাসুল তাদের ফিরিয়ে দেন। তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। এটাই হলো প্রকৃত জিহাদের আকাঙ্খা, শাহাদাতের তামান্না। ঘরে বসে থেকে জিহাদের সওয়াব ও শহীদের মর্যাদা পেতে হলে জিহাদে যেতে না পারার দুঃখে ব্যাথিত হতে হবে। কাঁদতে হবে। কান্নার লাভ অনেক।

শাহিন এবার বুঝতে পারে। এখন আর সে রেজাকে কাঁদতে বারণ করে না। উল্টো তার নিজেরই কাঁদতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তার চোখ দিয়ে তো পানি বের হচ্ছে না। তবে কি তার অন্তরে জিহাদের আকাঙ্খা নেই! কি সর্বনাশ! রসুল বলেছেন, যে জিহাদ

করে না, জিহাদের আকাঙ্খাও রাখে না এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে নিফাকীর একটা অংশের উপর মৃত্যুবরণ করে। শাহিনের মনটা আতংকিত হয়ে যায়। সে মুনাফিক হতে চায় না। সে কাঁদতে চায়। এখন সে বুঝতে পারে বেশিরভাগ মানুষ জিহাদের কথা মুখে বললেও তাদের অন্তরে প্রকৃত জিহাদের আকাঙ্খা নেই, শাহাদাতের তামান্না নেই। তাই তারা জিহাদে যেতে না পারার কারণে দুঃখিত হয় না, কাঁদে না। শাহিন নিজেও কি তবে তাদেরই একজন! না, না। শাহিন কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারে না। আক্ষেপ করে বলে,

- হায় আল্লাহ! আমার কান্না আসছে না কেনো?

রেজা তার মনের অবস্থা বুঝতে পারে। মুখটা ভার করে বলে,

- কি জন্য কাঁদছিস, কেনো কাঁদছিস সেটা না জানলে কান্না আসবে কিভাবে!

শাহিন কিছু বুঝতে পারে না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে রেজার দিকে তাকিয়ে থাকে। রেজা বলতে থাকে,

- কত বড় সম্মান হারিয়ে যাচ্ছে। কত বড় সম্পদ ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে সেটা না জানলে তুই কিভাবে বুঝবি, জিহাদ কি জিনিস!

এরপর কিছুক্ষন নিরব থেকে রেজা নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে শাহিন বুঝতে পারে আজ সে এমন কিছু বলবে যা তার মুখ থেকে সে কখনও শোনে নি। তখনই শাহিনের কানে আসে,

- তুই কখনও প্রেম করেছিস?

শাহিনের মুখটা লাল হয়ে যায়। এমন প্রশ্ন সে আশা করে নি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে,

- না।

- প্রেমের গল্প তো শুনেছিস!

- দু-একটা শুনেছি। এই যেমন ধর, ভানুমতির কাহিনী।

কথাটা বলেই শাহিন স্বয়ংক্রীয়ভাবে গাইতে থাকে,

শোনেন শোনেন ভাই ব্রাদার * শোনেন দিয়া মন
ভানুমতির প্রেম কাহিনী * করিব বর্ণন
এক যে ছিল ভানুমতি * অপরুপা রুপবতী
চেহারাতে আলোর জ্যোতি * দাঁতগুলো তার হীরা-মতি

এতদূর বলতেই রেজা তাকে থামিয়ে বলে,

- আমি কি তোকে গান গাইতে বলেছি!

শাহিনও লজ্জা পেয়ে যায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে অন্য কেউ শুনেছে কিনা, তারপর রেজার দিকে

তাকায়। রেজা বলে,

- নামটা একটু ভাল দেওয়া যায় না! এই যেমন ধর, হিমেল। হিমালয় পাহাড় থেকে আসা শীতল হাওয়ার মতো হৃদয় জুড়ানো যার কণ্ঠস্বর আর হিম শীতল হাতের স্পর্শ। অথবা হেলেন, লাউয়ের ডগার মতো নরম শরীরটা নিয়ে বাতাসে দোলা ধান ক্ষেতের মতো হেলে-দুলে যে চলে। অথবা শিউলী বা বেলী। পাপড়ি মেলা ফুলের মতো অপরুপ যার চেহারা।

কথাগুলো শুনে শাহিন যেনো মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে যায়। কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চল মূর্তির মতো রেজার দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকে। রেজা বলতে থাকে,

- পরীদের কথা শুনেছিস?

- হু। ডানা কাটা পরী।

- উহু। ডানা কাটা নয় একেবারে ডানা সহ পরী। কেউ তাদের দেখেনি তবে কল্পণা করেছে। সাহিত্যিকরা তাদের নিয়ে গল্প লিখেছে, চিত্রকররা ছবি এঁকেছে। কত যুবক হয়তো পরীদের সাথে প্রেম করার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে কেউই তাদের দেখেনি। এমন একজন পরী যদি তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তোর কেমন লাগবে!

শাহিন দ্রুত বলে ওঠে,

- ওরে বাবা! আমার ভীষণ ভয় করবে। দৌড়ে পালিয়ে আসবো।

- আরে বোকা ভয় করবে কেনো? সেকি আর তোকে খেয়ে ফেলবে! তোর সাথে প্রেম করবে।

শাহিন এখনও বিষয়টা মেনে নিতে পারে না। মানুষের সাথে ঘর সংসার করতে গিয়ে তাই নাকাল হতে হচ্ছে। আর কোথায় জিন পরী!

তার মনের ভাব বুঝতে পেরে রেজা বলে,

- আচ্ছা ঠিক আছে জিন পরীদের কথা না হয় বাদ দিলাম। হুরপরীদের কথা তো শুনেছিস।

শাহিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। এবার সে পরিপূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করে। হুরপরীদের সে ভয় পায় না। তাদের কথা সে কত শুনেছে। তাদের সৌন্দর্য আর স্বামী ভক্তির কাহিনী শুনে শাহিন মুগ্ধ হয়েছে। মনে মনে তাই সে এখনও তাদের নিয়ে ভাবে। তার স্ত্রী যখনই তর সাথে খারাপ আচরণ করে সে মনে মনে জান্নাতের হুরদের নিয়ে ভাবে। রেজা বলতে থাকে,

- হাদীসে বলা হয়েছে, একজন হুর তার স্বামীকে দেখে যখন হেসে উঠবে তার দাঁত থেকে আলোর ঝিলিক নির্গত হয়ে পুরো জান্নাতটাকে বিদ্যুৎ চমকের মতো আলোকিত করে দেবে। যদি কোনো হুর পৃথিবীর দিকে

উঁকি দিতো তবে তার সৌন্দর্যে আকাশ ও পৃথিবী আলোকিত হয়ে যেতো আর সুগন্ধে ভরে যেতো। আল্লাহ বলেছেন, তারা লুকানো মুক্তার মতো। হাদীসে তাদের সৌন্দর্যকে তুলনা করা হয়েছে ঐ হীরার সাথে যার মধ্যে সুতা পরানো হলে সেটা বাইরে থেকে দেখা যায়। তারা সত্তর পর্দা কাপড় পরিধান করে থাকবে। ঐ সত্তর পর্দা কাপড় ভেদ করে তাদের শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

রেজার কথাগুলো শুনে শাহিনের মনটা ভরে যায়। হুরদের প্রতি তার অন্তরে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সে কৌতুহলী হয়ে বলে,

- ওদের তো কিয়ামতের পর সৃষ্টি করা হবে তাই না!

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- না, না। যখন জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে তখন থেকেই জান্নাতের হুরও সৃষ্টি করা হয়েছে। দিনের পর দিন তারা সেখানে নিসঙ্গ জীবিন-যাপন করছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে তার স্বামী এসে পৌছাবে। দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কে কার স্বামী হবে হুরদের সেটা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। অদৃশ্য থেকে তারা ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করতে থাকে। যদি তার দুনিয়ার স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয় তবে আকাশের হুর তাকে

তিরষ্কার করে বলে,

- ওকে কষ্ট দিস নে, সে তো তোর কাছে দুদিনের মেহমান। শীঘ্রই সে আমার কাছে চলে আসবে।

শাহিন স্বয়ংক্রীয়ভাবে বলে ওঠে,

- আহ! তার অন্তরে কত ভালবাসা! কত মায়া!

রেজা বলতে থাকে,

- তোর কথা সে সারাক্ষণ ভাবে কিন্তু তার কথা কি তুই কখনও ভাবিস?

শাহিন বেশ জোরে মাথা ঝাকায়। সে প্রায়ই হুরদের কথা ভাবে। তাকে ওভাবে মাথা ঝাকাতে দেখে রেজা বলে,

- তোর স্ত্রী যখন তোকে কষ্ট দেয় তখন তারা কষ্ট পায়। তোকে যে তারা এতো ভালবাসে বিমিনয়ে তাদের কিভাবে খুশি করা যায় সেটা নিয়ে ভাবিস?

- আমি তাদের কিভাবে খুশি করবো? আমার কি পাখা আছে যে উড়ে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করে কিছু একটা উপহার দিয়ে আসবো?

- পাখা লাগিয়ে উড়ে গেলেও তাদের সাক্ষাত পাওয়া যাবে না। আর দুনিয়ার কোনো উপহার তাদের দরকার নেই। জান্নাতে আল্লাহ যা নেয়ামত রেখেছেন দুনিয়ার

কোনো কিছু তার সমকক্ষ হতে পারে না। শুধু একটি জিনিস ছাড়া।

রেজার কথা শুনে শাহিন অবাক হয়ে বলে,

- এমন কি জিনিস যা দুনিয়াতে আছে, জান্নাতে নেই?

- আমি বা তুই। আমরাই সেই জিনিস। জান্নাতে কোনো যুবক নেই। হুরদের কোনো স্বামী নেই। যারা ভাল কাজ করে জান্নাতী হবে। তাদের সাথে হুরদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। চিরটা কাল তারা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের কাছে সবচেয়ে খুশির বিষয় কি হতে পারে সেটা কি বুঝতে পারছিস?

শাহিন কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলে,

- আমাদের সাথে সাক্ষাত করা।

- এই তো ঠিক কথা বলেছিস। কিন্তু সাক্ষাত তো হবে মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর আগে আমাদের কোন কাজটা হুরদের নিকট সর্বাধিক আনন্দের বিষয় সেটা কি বুঝতে পারছিস!

শাহিন মাথা নাড়ে। সে বুঝতে পারছে না। রেজা তাকে বুঝানোর জন্য বলে,

- মনে কর তুই তোর স্ত্রীকে রেখে বিদেশে গেলি। মাঝে মাঝে মোবাইলে স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলিস। এ অবস্থায় কোন কথাটা শুনে তোর স্ত্রী

সবচেয়ে বেশি খুশি হবে বল তো।

শাহিন এক গাল হেসে বলে,

- এ তো সহজ কথা। টাকা পাঠানোর কথা শুনলেই খুশি হবে।

শাহিনের সাথে রেজাও হেসে ওঠে। তারপর বলে,

- তুই একটা আস্ত গাধা। মনে কর তোর স্ত্রীর টাকা পয়সার অভাব নেই। সে কেবল তোকেই চায়। তাহলে কোন খবরটা তার কাছে ভাল লাগবে।

শাহিন একটু ভেবে নিয়ে বলে,

- যখন জানতে পারবে আমি ফিরে আসছি তখন।

- ঠিক বলেছিস। যদি একটা ক্যামেরা দিয়ে দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আর তোর স্ত্রী দেখে তুই এয়ারপোর্টে চলে এসেছিস, প্লেনের টিকিটও হাতে নিয়েছিস। তাহলে কেমন হবে?

শাহিন এবার বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারে,

- তাহলে তো আহলাদে আটখানা হয়ে যাবে।

- জান্নাতের হুররা দুনিয়াতে তার স্বামী কখন কি অবস্থায় আছে সেটা দেখতে পায়। দুনিয়াতে তার স্বামীর কোন অবস্থা দেখে তারা আহলাদে আটখানা হয় বলতো?

শাহিন বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। জান্নাতের হুরদের কোনো কিছুর অভাব নেই। তারা কেবল তাদের স্বামীদের সাথে সাক্ষাত করতে চায়। পাখা লাগিয়ে আকাশে উড়ে গেলেই হুরদের সাথে সাক্ষাত করা সম্ভব নয়। তাদের সাথে সাক্ষাত হবে মৃত্যুর পর। অতএব যখন কোনো হুর দেখে দুনিয়াতে তার স্বামী মারা যাচ্ছে তখন সে খুশিতে আটখানা হয়ে যায়। এটা তো সোজা হিসাব। দুই যোগ দুই সমান চার। কথাটা রেজাকে বলতেই সে বলে,

- হিসাবটা মোটামুটি ঠিকই আছে তবে সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে। এই মনে কর দুই যোগ দুই সমান সাড়ে চার কি শোয়া চার মতো হয়ে গেছে।

- কীভাবে?

- মনে কর তোর ঐ ধনী স্ত্রী যে ক্যামেরার মাধ্যমে তোকে টিকিট হাতে এয়ারপোর্টে দেখে আহলাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিল। যদি সে দেখে তুই টাকার অভাবে প্লেনের টিকিট কাটতে না পেরে হাজার হাজার মাইল দুর থেকে হেঁটে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিস। হাঁটতে হাঁটতে আর না পেরে শেষে মাটিতে শুয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে শুরু করেছিস। এ অবস্থা দেখে সে কি আহলাদে আট খানা হবে না কি বিষাদে

তার মুখখানা কালো হয়ে যাবে!

শাহিন বলে,

- সে খুব কষ্ট পাবে।

রেজা বলতে থাকে,

- কেবল দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে হবে না। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে যাত্রাটা হতে হবে প্লেনে। কেবল ছটফট করে মারা গেলে হবে না। এয়ারপোর্টে গিয়ে মারা যেতে হবে। প্লেনের টিকিটটা হাতে নিয়ে মারা যেতে হবে। এয়ারপোর্ট হলো জিহাদের ময়দান আর প্লেনের টিকিটটা হলো তরবারী। বুঝতে পেরেছিস?

শাহিন ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। তাকে আর না বুঝালেও হবে। তবু রেজা বলতে থাকে,

- যখন জিহাদ শুরু হয়। হুরদের বৌ সাজিয়ে প্রথম আসমানে নিয়ে আসা হয়। তারা আড়াল থেকে জিহাদের ময়দানের দিকে তাকিয়ে নিজ নিজ স্বামীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যদি দেখে তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে তবে খুশি হয়ে তাদের জন্য দোয়া করে। আর যদি দেখে তারা শত্রুর ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে তবে নাখোশ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। যখন তাদের মধ্যে কেউ নিহত হয়, হুরদের মধ্যে তার স্ত্রী আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে স্বাগত জানায়। তার গায়ে মাথায় যেসব ধুলোবালি লেগে থাকে সেগুলো মুছে দেয় আর বলে, আজ আমাদের মিলনের সময় হয়েছে।

কথাগুলো শুনে শাহিনের অন্তরটা বিগলিত হয়। তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছা করে এখনই তরবারী হাতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করতে। তখনই তার কানে ভেসে আসে রেজার কণ্ঠ,

শাহাদাত হলো অমুল্য দান
সম্মান তার আকাশ সমান
মৃত্যু নয় সে নতুন জীবন
প্রেমিকার সাথে মধুর মিলন

....

শাহিনের হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার কি যেনো কাজ আছে। রেজার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে যায়। যাওয়ার পথে রেজা তাকে বার বার চোখ মুছতে দেখে। তার যাওয়ার পথের দিকে দৃষ্টি রেখে রেজা ভাবতে থাকে,

- সত্যিই কি কান্না ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার!

তার মনে পড়ে পবিত্র কুরআনে কিছু দূর্বল নর-নারী আর বাচ্চাদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর কাফিররা নির্যাতন করে কিন্তু তারা কোনোভাবেই তা প্রতিহত করতে পারে না। তারা দোয়া করে, “হে আমাদের রব আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করুন”। আজ মুসলিম জাতি দূর্বল, তাদের কোনো অভিভাবক নেই। কাফিরদের মোকাবিলায় তাই তারা কিছুই করতে পারছে না। রেজার মনে হয় করতে পারছে না এটা পুরো সঠিক কথা নয়। সঠিক কথা হলো তারা যতটুকু করতে পারে ততটুকুও করছে না। তারা তো অন্তত দোয়া করতে পারে। বলতে পারে, হে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করার জন্য একজন শক্তিশালী নেতা প্রেরণ করো। মুসলিম জাহানের একজন খলীফা একজন অভিভাবক দান করো। এটাও তো কেউ করে না।

রেজা মনে মনে বলে,

- দোয়া করতে হবে। আল্লাহর নিকট কেঁদে-কেঁদে দোয়া করতে হবে। কিন্তু এতেই কি দায়িত্ব শেষ হবে! কিয়ামতের ময়দানে যখন মহান রব্বুল আলামীন বলবেন, আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা কেনো করো নি?” তখন আমি কি বলবো?

রেজা নিজেকে নিজে শান্তনা দিয়ে বলে,

- আমি বলব, আলেম-ওলামা, লেখক-গবেষক, বক্তা ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে আমি কথা বলেছি তারা কেউই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি হয় নি। আমি একা কি করবো?

- আলেম-ওলামা লেখক, গবেষক এরা ছাড়া কি আর কোনো মানুষ ছিল না! তাদের সাথে কি কথা বলেছো? তাদের দাওয়াত দিয়েছো। আল্লাহ বলেছেন একদল জিহাদ পরিত্যাগ করলে তাদের পরিবর্তে অন্য দলকে তিনি এ কাজের জন্য বাছাই করবেন। রসুল বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। পুরো মুসলিম উম্মাহ একসাথে জিহাদ পরিত্যাগ করতে পারে না। তোমাকে সেই দলটিকে খুঁজে বের করতে হবে। আলেম-ওলামারা যদি রাজি না হয় তবে সাধারন মুসলিমদের সাথে কথা বলো, তাদের এ কাজে উৎসাহিত করো।

রেজার হঠাৎ মনে পড়ে যায় আল্লাহর বাণী,

হে নবী আপনি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করুন। আপনার উপর কেবল আপনার নিজের দায়িত্ব (অন্য কেউ কি করলো সেটা আপনার দেখার বিষয় নয়)। আর

মুমিনদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের পরাস্ত করবেন।

রেজা মনে মনে বলে,

- এটাই আমার কাজ। সাধারন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেউ না কেউ অবশ্যই আমার ডাকে সাড়া দেবে। হাজারে একজন হলেও কোটি কোটি মুসলিমদের মধ্যে হাজার হাজার মুজাহিদ অবশ্যই পাওয়া যাবে। আল্লাহ চাইলে কাফিরদের পরাস্ত করার জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে।

এরপর থেকে রেজা সাধারন মানুষের সামনে কথা বলা শুরু করে। মসজিদে জুমুয়ার খুতবায় মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের কি করণীয় সেটা নিয়ে আলোচনা করে। শ্রোতারা নিরবে তার কথা শোনে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোনো মন্তব্য করে না। তারা কেবল এতটুকু জানে যে দ্বীনের কথা শুনলে সওয়াব হয় কিন্তু কথাগুলো বাস্তবে পরিণত করাটা দায়িত্ব কিনা সেটা নিয়ে ভাবে না। দিনগুলো এভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

একদিন জুমুয়ার পর রেজা নিজের জায়গায় বসে ছিল। হঠাৎ মুছল্লীদের মধ্যে একজন উঠে এসে সালাম দিয়ে

রেজার পাশে বসে ডান হাতটি রেজার দিকে বাড়িয়ে দিলো। সালামের উত্তর দিয়ে তার হাতে নিজের হাত রেখে রেজা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এই ব্যক্তিকে সে এর আগে কখনও দেখেনি। একটু কৌতূহলী হয়ে রেজা বলল,

- আপনাকে তো ঠিক ......

- চিনলে না, এই তো?

কথাটা বলে লোকটি হেসে ওঠে। তারপর বলে,

- আমার নাম মুফতী আতিয়ার। মুফতী রবিউলকে চেনো?

রেজা মাথা নাড়ে। মুফতী রবিউলের বাড়ি তাদের এলাকায়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এক সময় রেজার সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে রেজার কাছে প্রশ্ন করতো। কিন্তু মুফতী সার্টিফিকেট পাওয়ার পর থেকে তার মন-মানসিকতা বদলে গেছে। মাস খানেক হলো বিয়ে করেছে। এই ব্যক্তি হয়তো তার শশুরপক্ষের আত্মীয় হবে। তখনই রেজার কানে আসে,

- আমি ওর চাচা শশুর। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ের সাথে ওর বিয়ে হয়েছে। তোমার বয়ান শুনে ভাল লাগলো।

ততক্ষণে শাহিন হাজির হয়ে যায়। অভ্যাসমত অতি উৎসাহী হয়ে বলে,

- ইনি একজন মুজাহিদ।

মুজাহিদ শব্দটা শুনে রেজা মোটেও অবাক হয় না। মনে মনে ভাবে, এখন কত রকম সব নয়া মুজাহিদ বের হয়েছে তার হিসাব নেই। পীরের মুরীদরা নিজেদের মুজাহিদ বলে পরিচয় দেয়। পান খাওয়া আর পীরের নামে গান গাওয়া ছাড়া অন্য কোনো জিহাদ তারা করে কিনা সেটা রেজা জানে না। রেজার মনের ভাব শাহিন বুঝতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলে,

- ইনি আফগান ফেরত মুজাহিদ। রাশিয়ার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন।

এবার রেজা সত্যিই অবাক হয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদরা রক্তক্ষয়ী লড়াই করেছিল সেটা সে জানে। সে যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। অনেক আগেই রেজা সেসব বই পড়েছে। সেসব বই পড়ে তার মনে বেশ কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব বিষয়ে আলোচনা করার মতো সুযোগ কখনও হয় নি। এখন একজন আফগান ফেরত মুজাহিদ তার সামনে স্বয়ং হাজির। প্রশ্ন গুলো নিয়ে

তার সাথে আলোচনা করা যায়। ভীষণ উৎসাহী হয়ে সে বলে,

- আপনি সত্যিকারের মুজাহিদ! আপনার সাক্ষাত পেয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

কথাটা বলতে বলতে রেজা আরও একবার নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ভীষণ উৎসাহী হয়ে বলে,

- একটু বসুন না। আপনার সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করি। আফগান জিহাদ সম্পর্কে আমার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে।

রেজার হাতটি স্বযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে মুফতী সাহেব মাথা উঁচু করে মসজিদের ঘড়িটির দিকে দৃষ্টি ফেলেন। তারপর বলেন, বসলে দেরি হয়ে যাবে। এখন বরং যায়। এশার নামাযের পর রবিউলদের বাড়িতে এসো সেখানেই যত খুশি গল্প করা যাবে।

কথাটি বলে মুফতী আতিয়ার বিদায় নেন। এশার নামাযের পর রাতের খাওয়াটা সেরে নিয়ে শাহিন আর রেজা মুফতী রবিউলের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

বাড়ির সামনে গিয়ে কি নামে ডাকা যায় সেটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মুফতী রবিউল রেজার সহপাঠী। তারা একসাথে হেফজ শেষ করেছে। এতদিন সে তার

নাম ধরেই ডেকে আসছে। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। মুফতী হওয়ার পর থেকে গ্রামের সবাই তাকে বলে, মুফতী সাহেব। তাছাড়া সে একজন নামকরা বক্তা এবং মাদ্রাসার দক্ষ শিক্ষক। সব মিলিয়ে অনেক নাম ডাক। রেজা লক্ষ্য করেছে এখন নাম ধরে ডাকলে বেচারার মুখটা কালো হয়ে যায়। কারো বাড়ি এসে কালো মুখ দর্শন করা অনেকটা অপমানিত হওয়ার মতো। আবার নিজের সহপাঠীকে মুফতী সাহেব বলে সম্বোধন করাটাও বেমানান। এসব কারণে, কি নামে ডাকা যায় সেটা রেজা বুঝতে পারে না। অগত্যা শাহিনকে যাচ্ছেতাই কিছু একটা বলে ডাকা-ডাকি করতে আদেশ করে। সাথে সাথেই শাহিন শুরু করে দেয়,

- মুফতী সাহেব আছেন নাকি?

কিছুক্ষন এভাবে হাক-ডাকের পর মুফতী রবিউল বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। তাকে দেখেই শাহিন বলে ওঠে,

- আরে রবিউল যে, কেমন আছিস?

মুফতি রবিউল শাহিনের চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোটই হবে। ছেলে বেলায় তারা এক সাথে খেলা-ধূলা করেছে। অতএব তাকে সে তুই-করে বলবে এটাই

স্বাভাবিক। কিন্তু মুফতি রবিউল বিষয়টাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করলো বলে মনে হয় না। মুখটা ভীষণ কালো করে বলল,

- আমাকে ডাকছো?

শাহিন বেশ জোরে মাথা নাড়ে,

- না, না। আমরা মুফতী সাহেবকে ডাকছি।

এই কথা শুনে মুফতী রবিউল মুখটা আরও বেশি কালো করে বলে,

- আমিই তো মুফতী সাহেব।

কথাটা শুনে শাহিন যেনো অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে,

- ও তাই নাকি? আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপর কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলে,

- আমরা বড় মুফতিকে চাচ্ছিলাম।

কথাটা শুনে মুফতী রবিউল রাগে গজ গজ করতে থাকে। সে হয়তো বলতে চাচ্ছে আমিই তো বড় মুফতী। শাহিন তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে,

- না মানে, ঠিক বড় নয়। আমরা বুড়ো মুফতীকে চাচ্ছি।

ততক্ষণে রেজা হস্তক্ষেপ করে।

- তোমার চাচা শশুর কি এখন বাড়িতে আছেন?

রবিউল কোনো কথা বলে না। কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

- উনি আমাদের আসতে বলেছিলেন।

মুফতী রবিউল এমন ভাব করে যেনো বিষয়টা অসম্ভব। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে,

- একটু দাড়াও আমি আসছি।

বেশ খানিক্ষণ পর মুফতী রবিউল ফিরে এসে বলে,

- আমার সাথে এসো।

মুফতী আতিয়ার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। রেজাদের ঘরে ঢুকতে দেখে তড়িঘড়ি করে উঠে বসেন। রেজা লজ্জিত হয়ে বলে,

- ঘুমোচ্ছিলেন মনে হচ্ছে!

- না, না। আমি তোমাদের অপেক্ষায়ই ছিলাম। এসো বসো।

পাশেই রাখা গদি চেয়ারে সবাই বসে পড়ে। কি হয় দেখার কৌতূহলে মুফতী রবিউলও সেখানে জেঁকে বসে থাকে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। কিভাবে শুরু করা যায় সেটাই হয়তো কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। মুফতী আতিয়ার নিজেই নিরবতা ভঙ্গ করলেন,

- তোমাদের আমার জিহাদের কাহিনী শোনাবো ভাবছি।

রেজা বলে,

- আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি মুফতী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে কেনো গেলেন?

মুফতী আতিয়ার এমন প্রশ্ন আশা করেন নি। রেজাকে তার বুদ্ধিমান যুবক বলেই মনে হয়েছিল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,

- এটা তুমি কেমন কথা বলছো, বাবা। মুফতীদের জন্য কি জিহাদ মাফ নাকি! আলেম-ওলামা যারা আছে তাদেরই তো আগে আগে জিহাদে যাওয়া দরকার।

- সেটা তো নির্ঘাত সত্য কথা কিন্তু বর্তমান যুগের আলেম-ওলামা আর মুফতী-মুহাদ্দিসরা তো জিহাদে যাওয়ার কথা শুনলেই ভুত দেখার মতো চমকে ওঠে, তাই কথাটা বললাম। আপনার এই জামাতাকেই না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখুন জিহাদে যেতে রাজি হয় কিনা?

রেজা কথাটা বলতেই উপস্থিত সবাই মুফতী রবিউলের দিকে তাকায়। তার মুখটা তখন আমাবশ্যা রাতের মতো অন্ধকার হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জিহাদে যাওয়ার কোনো মন-মানসিকতা তার নেই। এতক্ষনে মুফতী সাহেব বুঝতে পারেন রেজার প্রশ্নটার আসল গুরুত্ব কি। নরম সূরে বলেন,

- এটা তুমি ঠিকই বলেছো বাবা। এখনকার মোল্লাহ-মৌলোভীরা ইসলামটাকে নিজের বাবার সম্পত্তি মনে করে। অন্যদের দান-সাদকা, কলমাখানী, কুরবানী ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করে কিন্তু নিজেরা কখনও করে না। জিহাদের ব্যাপার তো আরও ভয়াবহ। আলেমরা জিহাদ করতে ভয় পায়। উল্টো যারা জিহাদ করে তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করে। কিন্তু বাবা, আমাদের আমলে অবস্থা অন্যরকম ছিল। বিশ্বের সব আলেম-ওলামা আর পীর-মাশায়েখ জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন। মুসলিমদের আফগানিস্তানে গিয়ে নাস্তিকদের সাথে জিহাদ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। অনেক মাদ্রাসার শিক্ষক বা ছাত্র সেখানে স্বশরীরে গিয়ে জিহাদ করেছেন।

মুফতী সাহেবের কথা রেজার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু তার মনে হচ্ছে কথাটা পুরো সত্য নয়। তখনকার যুগের আলেম ওলামা আর বর্তমান যুগের আলেম ওলামাদের স্বভাব-চরিত্রে খুব বেশি ফারাক থাকার কথা নয়। সেটা তো খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। মাঝখানে একটি প্রজন্মও অতিবাহিত হয় নি। তখন যেসব আলেম ওলামা ছিলেন তাদের অনেকেই আজ পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। যারা মারা গেছেন তাদের ছাত্র ও সন্তানরা রয়েছে। এত কম সময়ের মধ্যে সারা

বিশ্বের আলেম-ওলামারা একযোগে পাল্টে গেলো এটা বোধগম্য নয়। তাহলে তখন সবাই জিহাদের পক্ষে রায় দিলো আর এখন জিহাদের বিপক্ষে রায় দিচ্ছে কেনো! রহস্যটা কোন জায়গায়। এই রহস্যের জট খোলা রেজার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সে ভাবে কারণ উদঘাটন করা গেলে হয়তো আবারও জিহাদে আলেম-ওলামাদের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু কীভাবে এই রহস্যের সমাধান করা যাবে! প্রথমেই সে মুফতী সাহেবকে প্রশ্ন করে,

- তখনকার আলেমরা জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দেওয়ার কারন কি?

- আহা! কারণ আবার কি? আল্লাহ-রাসুল জিহাদের আদেশ করেছেন সাধারণ মানুষকে এটা শুনিয়ে দেওয়াটা কি আলেম-মুফতীদের দায়িত্ব নয়! মুসলমানদের দেশ কাফিররা দখল করে নিয়েছিল, কিতাবে এসেছে মুসলমানদের দেশ কাফিররা দখল করে নিলে সেটা উদ্ধার করা ফরজে আইন।

- দেখুন, এটা তো নতুন নয়। স্পেন মুসলিমদের দেশ ছিল। কয়েক শতাব্দী আগেই সেটা কাফিরদের দখলে চলে গিয়েছে। সেটা নিয়ে তো আমাদের আলেম-ওলামারা কখনও কথা বলেন নি। ...

রেজাকে থামিয়ে দিয়ে মুফতী সাহেব বলেন,

- সেটা তো অনেক আগে।

- আগে আর পর কি যায় আসে? চুরি করা জিনিস চোরের হাতে যুগ যুগ ধরে থাকলেই চোর সেটার মালিক হয়ে যায় না। তাছাড়া বর্তমানের কথায় বলি, আফগানে তো আবার আমেরিকা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকট অতীতে ইরাকও দখল করেছিল। তখন আরব আজমের আলেম-ওলামারা একমত হয়ে জিহাদের ডাক দেন নি কেনো?

মুফতী সাহেব এই কথার কোনো উত্তর দিতে পারেন না। রেজা বলতে থাকে,

- বর্তমান যুগের মুসলিম দেশের শাসকরা কি আল্লাহ-রাসুলের কথায় দেশ পরিচালনা করে নাকি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কথায়?

মুফতী সাহেব স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- এটা তো সবাই জানে, তারা তো ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের দালাল।

তাহলে আলেম-ওলামারা ঐ সব দালালদের সাথে জিহাদ করার ডাক আপনাদের আমলেও দেয়নি আমাদের আমলেও দিচ্ছে না। এর রহস্য কি?

মুফতী সাহেব অনুযোগের সূরে বলেন,

- মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো জায়েজ নয়। রেজা বলে,

- এটা তো সে সময় যখন মুসলিম শাসকরা মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষা করে চলে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, শাসক হলো ঢাল স্বরুপ তার নেতৃত্বে মুসলিমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তার মাধ্যমে মুসলিমদের (জান মালের) নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় মুসলমানদের শাসকরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার বদলে তাদের দলে যোগ দিয়ে মুসলিম দেশে কাফিরদের এজেন্ডা গুলো বাস্তবায়িত করছে তবে কেমন হবে? কাফিরদের আইন-কানুন, তাদের কৃষ্টি কালচার, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ইত্যাদি যা কিছু কাফিররা মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদি মুসলিম শাসকরা নিজ দায়িত্বে সেগুলো প্রতিষ্ঠা করে। কাফিররা যেসব সম্পদ লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশগুলো দখল করতে চায় যদি কোনো মুসলিম শাসক সেসব সম্পদ নিজ থেকেই কাফিরদের হাতে তুলে দেয়। এমনকি কাফিররা ইচ্ছামতো যে কোনো মুসলিম দেশের সম্পদ ব্যবহার করে অন্য মুসলিম দেশের উপর হামলা করতে পারে। এটাই কি মুসলিম দেশ দখল করা বলে গণ্য নয়? এরপর মুসলিম দেশগুলো দখল করার কোনো

প্রয়োজন থাকে কি? একজন কাফির নিজে এসে মুসলিম দেশ দখল করে সেখানে কুফরী কায়েম করলো আর অন্য একজন কাফির নিজের দেশে বসেই আঙ্গুলী হেলনে মুসলিম দেশগুলোতে ইচ্ছামতো আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করলো। কার দখলদারিত্ব অধিক শক্তিশালী সেটা একটু চিন্তা করে বলুন তো। কুরআন-হাদীস এবং উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলিম শাসকের মাধ্যমে যদি মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের হুদুদসমূহ তথা ইসলামী আইনকানুন প্রতিষ্ঠা না পায় বা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী পরিত্যাক্ত হয় তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে ফতোয়ার গ্রন্থসমূহতে বিস্তারিত লেখা আছে। আলেম-ওলামারা ছাত্রদের সেগুলো কেনো পড়ায় না?

তিনি কিছু বলেন না কেবল ঠোটদুটো বাঁকা করেন অর্থাৎ তিনি জানেন না। রেজা বলে,

- তারাই আবার আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফতোয়া দিলো। এর রহস্যটা কি?

মুফতী সাহেব মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলেন,

- সেটাই তো প্রশ্ন।

- এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয়। সে সময়

মুসলিম দেশের শাসকরা কি আফগান জিহাদের পক্ষে ছিল নাকি বিপক্ষে ছিল?

মুফতী সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন,

- ঠিকমতো মনে পড়ছে না।

- মনে করা খুবই সহজ ব্যাপার। সে সময় কোনো আলেমকে আফগান জিহাদের পক্ষে কথা বলার কারণে জেল-ফাস দেওয়া হয়েছে কি?

- না, না। এটা হয় নি।

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- এর অর্থ হলো, মুসলিম দেশের শাসকরা জিহাদের পক্ষেই ছিল বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে হলে তো ধর-পাকড় হতো নাকি?

- তা তো ঠিকই।

- এ থেকে কি বুঝলেন?

মুফতী সাহেব কিছুই বুঝলেন না। কেবল ফ্যাল-ফ্যাল করে রেজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। রেজা বলতে থাকে।

- মুসলিম দেশের শাসকরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের দালাল। কুরআন-হাদীসের আইন তারা আজও যেমন মানে না তখনও মানতো না। তারা যে কাজই করে বিদেশী

প্রভুদের নির্দেশে করে। তারা আফগান জিহাদকে সমর্থন করেছিল এর অর্থ কখনও এই নয় যে, কুরআন-হাদীসে জিহাদের যেসব ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পাঠ করে তারা এটা করেছে বরং এর অর্থ হলো, বিশ্বের কোনো এক শক্তিশালী কাফির রাষ্ট্র আফগান জিহাদকে সমর্থন দিয়েছে। এমন কিছু কি তখন শুনেছেন?

- হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি। শুনেছি আমেরিকা মুসলিমদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সমর্থনও করেছে।

মুফতী সাহেব থেমে গেলে রেজা বলে,

- আমেরিকা সমর্থন করার কারণেই তাদের কেনা গোলাম সৌদি শাসকরা এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসকরা এ জিহাদকে সমর্থন দিয়েছে। তৎকালীন আলেম ওলামারা কেবল তখন জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছে যখন বুঝতে পেরেছে শাসকদের এতে কোনো আপত্তি নেই। জেল-জুলুমের ভয় নেই। এখন আমেরিকা জিহাদের বিপক্ষে, মুসলিম দেশের শাসকরাও জিহাদের বিপক্ষে। তাই আলেম-ওলামারাও জিহাদের বিপক্ষে কথা বলছে। এভাবে চিন্তা করলে অংক মিলে যাচ্ছে, কি বলেন?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে মুফতী সাহেব নরম

স্বরে বলেন,

- মুসলমানদের জিহাদে যদি কাফিররা সাহায্য করতেই চায় তবে ক্ষতি কি?

- ক্ষতি তো একটু আছেই। কোনো সঠিক ইসলামী কাজে তো কাফিরদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানের জিহাদে আমেরিকা ও তাদের দালাল মুসলিম নামধারী শাসককরা সহযোগিতা করেছে এটা প্রমাণ করে উক্ত জিহাদ পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তার মধ্যে নিশ্চয় কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল।

মুফতী সাহেব কৌতূহলী হয়ে বলেন,

- কী ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি?

- সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন। তবে সেজন্য আপনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে হবে। আমি আপনাকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করবো। আশা করি সেসময়ের ঘটনাবলী ভালভাবে স্মরণ করে উত্তর দেবেন।

মুফতী সাহেব নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। মনের পর্দায় কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সাজাতে থাকেন। তার নিকট মনে হয় তিনি সত্যি সত্যিই আফগানিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে আবার ফিরে গেছেন।

আবারও অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদরা হিজরত করে এসেছে জিহাদ করতে। সবাই একত্রে সপথ বাক্য পাঠ করছেন, বিদেশী কাফিরদের বিতাড়িত করবোই। তারুণ্যের আবেগ যেনো মুফতী সাহেবের বৃদ্ধ শরীরে আবারও বইতে শুরু করে। ঠিক তখনই রেজার গলা শোনা যায়,

- আফগান যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল? আপনারা কি জন্য যুদ্ধ করেছেন?

মুফতী সাহেব তৎক্ষনাৎ বলে ওঠেন,

- মুসলিমদের ভূখন্ড থেকে ভীন দেশী কাফিরদের বিতাড়িত করা।

রেজা হালকা হেসে বলে,

- ভীনদেশী কাফিররা চলে যাওয়ার পর কি হবে সেটা নিয়ে কি আপনাদের কোনো প্লান ছিল?

মুফতী সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন,

- বুঝলাম না।

কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে রেজা বলে,

- এই ধরুন, রাশিয়ান কাফিরদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর কীভাবে দেশ চলবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা এইসব।

মুফতী সাহেব মাথা নেড়ে বলেন,

- না, না। এসব নিয়ে আমরা ভাববো কেনো। যাদের দেশ তারা ভাববে। রাশিয়ান বাহিনী চলে যাওয়ার পরই আমরা যাদের দেশ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে এসেছি।

রেজা ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

- দেশে দেশে এই বিভক্তি আপনি মানেন! এসব সীমানা তো কাফিরদেরই তৈরী তাই না? যাই হোক এটা প্রমাণ করে, আফগান জিহাদের মাধ্যমে শক্তিশালী কোনো ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা উদ্দেশ্য ছিল না বরং কেবল রাশিয়ান সৈন্যদের বিতাড়িত করাই উদ্দেশ্য ছিল। আপনার কি মনে হয় না একারণেই আমেরিকা আফগান জিহাদকে সমর্থন করেছিল। যদি আমেরিকা মনে করতো ঐ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য তবে সেটা সমর্থন করার পরিবর্তে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে লেগে যেতো। আফগান জিহাদের নেতৃত্বে যারা ছিল তাদের উপর আমেরিকার পূর্ণ আস্থা ছিল যে তারা ক্ষমতায় গেলে আল্লাহ-রাসুলের আইন বাস্তবায়নের পরিবর্তে তাদেরই দালালী করবে। তাদের সেই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। রাশিয়ান বাহিনী পরাজিত হওয়ার পরই

তথাকথিত আফগান জিহাদের নেতারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ দশ বছর দেশটিতে গৃহযুদ্ধ লেগে থাকে। ইসলাম কায়েম তো দূরের কথা হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি কাজই তাদের পেশা হয়ে দাঁড়ায়। এ দূরাবস্থা লক্ষ্য করে পরবর্তীতে মাদ্রাসা ছাত্ররা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করলে ঐ সকল সুনামধন্য নেতারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তারা প্রাণপনে চেষ্টা করে যাতে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত না হয়। এমন কি যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা আমেরিকাকে উক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে যখন আমেরিকা সত্যি সত্যি আফগানিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হামলা করে তখন তারা প্রকাশ্যে কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে। ঐ ধরণের জিহাদকে আমেরিকা সমর্থন করবে এতে অবাক হওয়ার কি আছে! যদি আজও কোথাও এমন জিহাদ হয় তবে আপনি দেখবেন কাফির-মুশরিক এবং তাদের দালাল মুসলিম নামধারী শাসকরা সে জিহাদকে সমর্থন করবে। সেই সুযোগে আলেমরাও মন খুলে সে জিহাদের স্বপক্ষে ফতোয়াবাজী করবে। কিন্তু সকল সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সত্যিকার ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ শুরু হলে কাফির-মুশরিক এবং

তাদের অনুসারী মুসলিম নামধারী শাসকরা সেটার বিরুদ্ধে একযোগে হামলা শুরু করবে। আলেম-ওলামারাও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করতে থাকবে।

রেজার কথাগুলো শুনে মুফতী সাহেবের মুখটা শুকিয়ে যায়। নরম স্বরে বলেন,

- তবে কি আমার হিজরত, আমার জিহাদ সব মাটি হয়ে গেলো!

রেজা মাথা নেড়ে বলে,

- না, না। মাটি হয় নি। তবে ইসলামী মানদন্ডে পুরোপুরি খাটি হয়নি এই আর কি। মুসলিমদের উপর অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে শুনে আপনারা দূর থেকে ছুটে গিয়েছেন। মুসলিম মা-বোনদের রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন। এর সওয়াব তো অবশ্যই পাবেন। তবে সেটা কখনই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বব্যাপী নবুয়তের আদলে খেলাফত কায়েমের জন্য সংগ্রাম করার সমপর্যায়ে পৌঁছাবে না।

কথাটা শুনে মুফতী সাহেব সান্তনা পেলেন বলেই মনে হয়। সব শেষে রেজা বলে,

- আল্লাহর রসুল বলেছেন, মুমিন এক গর্ত থেকে

দুইবার দংশিত হয় না। আল্লাহ যদি আমাদের সুযোগ দেয় তবে আমরা কাফিরদের একটি পক্ষের মন রক্ষা করে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে জিহাদ করবো না। এ ধরণের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ জিহাদের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী পূর্ণাঙ্গ খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ করবো ইন-শাআল্লাহ। সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের সকল তাগুতী শক্তি সে জিহাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। আর নামকরা সব আলেম ওলামারা সে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করবে। কিন্তু আমরা তাদের পরওয়া করবো না। আমাদের জিহাদের ফলাফল কাফির-মুশরিকদের ঝোলায় ভর্তি হতে দেবো না। কাফিরদের মন রক্ষা করে চলে এমন মুসলিম নামধারী কোনো দালালের নেতৃত্বে আমরা জিহাদ করবো না। আমাদের রক্তের উপর ভেলা ভাসিয়ে এ ধরণের লোকেরা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে সেটা আমরা কখনও মেনে নেবো না। তথা-কথিত ওলামা মাশায়েখদের ফতোয়াবাজীতে প্রতাড়িত হয়ে আমরা ইসলামের সঠিক ভাবধারা থেকে সামান্যও বিচ্যুত হবো না। ইনশা-আল্লাহ। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন, “তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আর কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করে না।”

রেজার কথাগুলো শুনে বৃদ্ধ মুফতী সাহেবের মনটা ভরে যায়। তার ইচ্ছা হয় যদি তিনি আবার যৌবনে ফিরে যেতে পারতেন তবে এমন একটা জিহাদে অংশগ্রহণ করে পূর্বের ভুলটা শুধরে নিতেন। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। অনুতাপে তার দুটি চোখ ভিজে আসে। তিনি রেজার জন্য দোয়া করেন,

- দোয়া করি বাবা আল্লাহ যেনো তোমার আশা পূরণ করেন।

বৃদ্ধ মানুষটিকে অবোধ শিশুর মতো কাঁদতে দেখে রেজার মনটা বিগলিত হয়। নরম গলায় বলে,

- আহা! কাঁদবেন না। আপনারা শুধু মন খুলে দোয়া করবেন। আপনাদের পক্ষ থেকে আমরাই দায়িত্ব পালন করবো। ইনশাআল্লাহ।

- দোয়া করি তাই যেনো হয় বাবা।

ততক্ষণে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। সৌজন্য কিছু কথা বলে মুফতী সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে রেজারা ফিরে আসে। আসার সময় মুফতী রবিউলের দিকে তাকিয়ে শাহিন বলে,

- এই! বসে বসে খেয়ে তো ভুড়িটা বেশ বানিয়েছিস। জিহাদে যাবি তো?

মুফতী রবিউল কোনো উত্তর দেয় না। কেবল রাগে

ফুসতে থাকে। তাতে তার ভুড়িটা আরও বেশি বড় মনে হয়।

ছয়:

....

সাধারণত রেজা এশার নামাজের পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। কিন্তু সেদিন তার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেলো। খুব বেশি দেরি হওয়ার অবশ্য সুযোগ নেই। ফজরের আজান হলেই রেজার মার ঘুম ভাঙে। তারপর আর তার ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকেন। তারপর উঠে অজু করে নামাজ পড়েন। রেজার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তিনি দু বার তার নাম ধরে ডাকেন। তাতেও কাজ না হলে দরজায় কড়াঘাত করতে থাকেন। দরজায় কড়াৎ কড়াৎ করে শব্দ হতে দেখে রেজা বুঝতে পারে তার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ে।

- মা?

- হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ওঠ। নামাজ কাজা হয়ে গেলো তো।

নামাজ কাজা হওয়ার কথা শুনে রেজার মোটেও চিন্তা

হয় না। সে জানে মা যতটা নরম ভাবে কথাটা বলল, তাতে এখনও আধঘন্টা সময় নিশ্চয় আছে। এসব ব্যাপারে তার মা একটু বাড়িয়েই বলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার অনুমান ঠিক কিনা দেখে নিয়ে রেজা ধীরে সুস্থে নামাজের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মসজিদে যাওয়ার ঠিক আগ মুহুর্তে তার মা বলেন,

- তোকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?

- আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি, মা।

রেজার মাকে একরকম স্বপ্ন বিশারদ বলা চলে। যে কোনো স্বপ্ন শোনার সাথে সাথেই কোনো একটা চমৎকার অর্থ বলে দেয়। স্বপ্নের কথা শুনে তাই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

- কী দেখলি?

- দেখলাম একটা প্রশস্ত মাঠে আমি দৌড়াচ্ছি। হঠাৎ দেখি চোখের সামনে বড় একটা চাঁদ। অনেক বড়। মনে হচ্ছে যেনো আমার খুব কাছে। যেনো হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

এতদূর বলতেই রেজার মা বলেন,

- ভাল স্বপ্ন।

রেজা অবাক হয়ে বলে,

- কেমন ভাল?

- মনো বাসনা পূর্ণ হবে। বহু দিন থেকে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিস শীঘ্রই তা হাসিল হবে।

এতদূর বলে রেজার মায়ের মনে একটু সন্দেহ হয়। ছেলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। রেজার নির্দোষ চেহারাটা দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হোন। কদিন থেকে তিনি রেজাকে যেমন উদাস দেখছেন সাধারনত এই বয়সের ছেলেরা প্রেম করলে এমন হয়। কিন্তু রেজার কথা আলাদা। তার ব্যাপারে এটা ধারণা করা যায় না। তবে এমন কি জিনিস যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে? রেজাকে তিনি কোনো প্রশ্ন করেন না। কেবল নিজের মনে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেনো সেটা ভাল জিনিস হয়। রেজা আর অপেক্ষা করতে পারে না। তাড়াহুড়ো করে মসজিদে চলে যায়।

নামাজ শেষে শাহিন রেজাকে বলে,

- খুশির খবর আছে।

শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রেজা অনুমান করার চেষ্টা করে কী ধরণের খবর হতে পারে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু বোঝা যায় খবরটা দেওয়ার অপেক্ষায় আজ রাতে বেচারা ঘুমতে পারে নি। উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ জ্বল-জ্বল করছে। সেটা লক্ষ্য

করে রেজা নিজেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

- কী খবর!

- চরম খবর।

- চরম খবর মানে?

- মানে সে ভীষণ ব্যাপার!

রেজার মেজাজটা এবার গরম হয়ে যায়। এটা শাহিনের চিরচারিত অভ্যাস। আকর্ষণীয় কোনো বিষয় যতদূর সম্ভব ঢঙ করে বলার চেষ্টা করে। তবে অন্যান্য দিন মূল আলোচনার কিছু অংশ বর্ণনা করার পর তার ঢঙ শুরু হয় কিন্তু আজ প্রথমেই শুরু হয়েছে। রেজা বুঝতে পারে খবরটার একটু আলাদা গুরুত্ব আছে। তবে সে গুরুত্ব মুখে প্রকাশ করলে শাহিনের রঙ-ঢঙে নতুন মাত্রা যোগ হবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেও খবরটার আগা-গোড়া সম্পূর্ণ শোনা যাবে কিনা তাতে বেশ সন্দেহ রয়েছে। রেজা তাই ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে,

- আমার এখন খবর শোনার সময় নেই। বাড়িতে অনেক কাজ আছে।

কথাটা শুনেই শাহিন বিচলিত হয়ে ওঠে। গতকাল টিভির খবরে বিষয়টা শোনার পর থেকে সে কথাটা রেজাকে বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এখন কথাটা বলতে না পারলে তার বুকটা হয়তো ফেটে যাবে। সব রঙ ঢঙ ছেড়ে তাই সে এক নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ ঘটনাটা বলতে থাকে,

- টিভিতে খবর শুনলাম। আরব দেশে জিহাদ শুরু হয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে দলে দলে মানুষ সেখানে যাচ্ছে।

- তাই নাকি! ঠিক শুনেছিস তো!

রেজা নিজেও চরম উত্তেজনা অনুভব করে।

- হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই শুনেছি।

রেজার মনটা যেনো আকাশের মতো প্রশস্ত হয়ে যায়। খুশিতে তার হৃদয়টা ফেঁটে যাওয়ার উপক্রম হয়। খবরটা নিজ কানে শোনার জন্য তার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাহিন বলে,

- দেখিস আজ পেপারেই খবরটা আসবে।

পেপারে সত্যিই খবরটা পাওয়া গেলো। বেশ বিস্তারিত লেখা। জিহাদ শুরু হয়েছে। দলে দলে মানুষ জিহাদে যোগ দান করছে। ইতোমধ্যে সরকারী বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে। খবরটা পড়ে রেজার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। তার মনটা জিহাদে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। খবরের প্রতিটা লাইন পড়ে আর কল্পণা করে, একদল মুজাহিদ কালো পতাকা

হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে। তাগুতের মসনদ চুর্ণ বিচুর্ণ করে কালেমার পতাকা উত্তোলন করছে। তার ইচ্ছা করে এখুনই সেখানে চলে যেতে। কিন্তু বাকী কথাগুলো পড়ে রেজার মনটা বেজার হয়ে যায়। শাহিন লক্ষ্য করে প্রথমে রেজাকে যেমন আনন্দিত মনে হচ্ছিল এখন তাকে হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। শাহিন খবরের শেষ অংশটি আবার পড়ে কিন্তু খারাপ কোনো খবর তার নজরে পড়ে না। কিছু বুঝতে না পেরে সে প্রশ্ন করে,

- এখন বল জিহাদে যাবি তো?

- উহু।

রেজার কথা শুনে শাহিন যেনো আকাশ থেকে পড়ে। জিহাদে যাওয়ার জন্য রেজা কত আগ্রহী সেটা সে জানে। জিহাদে যেতে না পারার কারণে প্রায়ই সে কাঁদে। মাঝে মাঝেই শাহিনকে জিহাদের ফজিলত শুনায়। তার কথা শুনে শাহিন নিজেই জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে এখন তার জিহাদী বলেই মনে হয়। পত্র-পত্রিকা বা টিভিতে যখন মুজাহিদদের সন্ত্রাসী-জঙ্গী ইত্যাদি বলে গালি দেয় শাহিনের মনে হয় কথাটা তাকেই বলা হচ্ছে। রাগে তার প্রতিটা লোম তখন খাড়া হয়ে যায়। ইচ্ছা করে এসব সাংবাদিকদের

উচিৎ শিক্ষা দিতে। আর এখন কিনা চোখের সামনে জিহাদ হতে দেখে রেজা পিছিয়ে যাচ্ছে! তবে কি তার সব কথা মিথ্যা! নাকি এখানে এমন কোনো বিষয় আছে যা শাহিন বুঝতে পারছে না। বিস্ময় প্রকাশ করে সে বলে,

- জিহাদ না করলে খেলাফত কায়েম হবে কিভাবে?

রেজা হালকা হেসে বলে,

- এ জিহাদে খেলাফত কায়েম হবে না। এতে তাগুতের শাসনই প্রতিষ্ঠা হবে।

- কেনো?

- এখানে দেখ।

কথাটা বলে রেজা আঙ্গুল দিয়ে পত্রিকার কয়েকটা লাইনের দিকে ইঙ্গিত করে। শাহিন বেশ কষ্ট করে কথাটা পড়ে,

- আরব বিশ্বের সব সুনামধন্য আলেম-ওলামা এই জিহাদের পক্ষে কথা বলেছেন। প্রায় পাঁচ শত আলেম এক বৈঠকে একমত হয়ে বলেছেন এই জিহাদ মুসলিমদের উপর ফরজ।

এতদূর পড়ে শাহিন রেজার দিকে তাকিয়ে বলে,

- এ তো ভাল খবর। আলেমরা জিহাদের পক্ষে কথা

বললে তো মুজাহিদদের উপকারই হবে তাই না।

শাহিনের কথাটা শুনে রেজা বেশ খানিকটা অবাক হয়। সাধারন মুসলিমরা কতটা সরল মনের হয় সেটা সে বুঝতে পারে। রেজা বুঝতে পারে গতকাল যে আলোচনা সে মুফতী আতিয়ারকে শুনিয়েছে শাহিন সেটাও ভুলে বসেছে। তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ আলেমদের ফতোয়ায় উপকার তো হবেই। যেমন হয়ে ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানদের জিহাদে।

শাহিন এতক্ষণে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে। গতকালের সব কথা তার মনে পড়ে যায়। সে বিড়বিড় করে বলে,

- আলেমরা এখন তাগুতের চর হয়ে গেছে। তারা জিহাদের পক্ষে কথা বলা মানে এ জিহাদে তাগুতী শক্তির কোনো স্বার্থ আছে।

- আলেমরা তাগুতের চর হয়ে গেছে কথাটা সঠিক নয়, আসলে তাগুতের চররা আলেম হয়ে গেছে।

রেজার কথায় শাহিন ভেবাচেকা খেয়ে যায়। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে,

- দুটো তো একই বিষয় হলো।

- মোটেও একই বিষয় নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহকে যে ভয় করে সেই আসলে আলেম। তারা সদা সর্বদা সত্য কথা বলে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করে। সত্য বলার ব্যাপারে তারা কাউকে ভয় করে না। ফলে তাদের বেশিরভাগ কথা তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যায়। একারণে তাগুতী শাসকরা তাদের জেল-জুলুমের শিকারে পরিণত করে। বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজের লোককে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের সন্ত্রাসী, জঙ্গী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। তারা না কোনো টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করার সুযোগ পায় আর না কোনো বড় মাদ্রাসাতে শিক্ষকতা করার সুযোগ পায়। ফলে হক্কানী আলেম হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাদের চিনতেও পারে না। তাদের ফতোয়াও শোনে না। বিপরীত দিকে আলেম নামধারী কিছু লোক আল্লাহকে মোটেও ভয় করে না ফলে নিজের যতটুকু ইলম আছে সেটা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করে। তাগুতকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা সদা-সর্বদা তাগুতের মর্জি মতো ফতোয়া দেয়। একারণে তাগুতী শক্তি তাদের পক্ষে প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে দেয়। মানুষ বলে, অমুক ব্যক্তি মাদ্রাসার শিক্ষক বা অমুক বক্তা টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দেয়, এরাই বড় আলেম। তারা এটা একবারও ভাবে

না যে, তাগুতের পক্ষে কথা বলার কারণেই এসব লোকেরা বড় আলেম হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অতএব, আলেম-ওলামারা ঠিকই আছে তারা তাগুতের চর নয় কিন্তু সাধারন মানুষ তাদের চিনতে ভুল করছে। তাগুতের গোলামী করে যারা বড় বড় পদ দখল করেছে তারা তাদের হাক্কানী আলেম মনে করছে। আসলে এরা কখনই হক্কানী আলেম নয় এরা হককানা আলেম। হক গোপন করার কারণেই তারা মানুষের কাছে বড় আলেম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। যদি জীবনের শুরু থেকেই তাগুতের বিরুদ্ধে কথা বলতো তবে বড় আলেম হওয়ার বদলে মানুষের চোখে বড় জঙ্গী হয়ে যেতো। মানুষ তাদের নিকট ফতোয়া নেওয়ার বদলে তাদের নাম শুনলে ঘৃণা প্রকাশ করতো। অতএব, দুনিয়াতে বড় আলেম হওয়ার লোভে তারা ঈমান আমানত সব হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোকেরা একমত হয়ে জিহাদের পক্ষে কথা বলবে এটা কি ভাবা যায়! এটা কখনও প্রকৃত জিহাদ হতে পারে না! এটা কাফির মুশরিকদের ষড়যন্ত্র।

শাহিন ভীষণ হতাশ হয়ে বলে,

- তাহলে প্রকৃত জিহাদ কোনটা?

- যখন দেখবি বিশ্বের সব তাগুতী শক্তি আর

বিশ্ববিখ্যাত সব আলেম-ওলামারা কোনো একদল মুজাহিদদের নিন্দা করছে তখনই বুঝে নিবি ঐ দলটি সকল তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে।

বিশ্বের সব তাগুতী শক্তি জিহাদের বিপক্ষে যাবে কথাটা সহজ কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত সব আলেম-ওলামারা জিহাদের বিপক্ষে কথা বলবে এটা শাহিনকে খুব ব্যাথিত করে। সে আক্ষেপ করে বলে,

- বিশ্ব বিখ্যাত আলেমরা তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলে না কেন?

- কারণ সহজ। তাগুতের সাথে আপোস করেই তো তারা বিখ্যাত হয়েছে। তাই তাগুতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সারা জীবন তাদের গোলামী করে যাচ্ছে।

এসব শুনে শাহিনের মনটা ভেঙে যায়। সে দারুণ ব্যথিত হয়। তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাথিত হয় রেজা। মনে মনে বলে,

- সত্যিকার জিহাদ শুরু হতে আরও কত দিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক মাস অতিবাহিত হতেই ঘটনার মোড় ঘুরে গেলো। হঠাৎ

দেখা গেলো কাফির-মুশরিকরা আরবদের এই জিহাদকে নিন্দা করতে শুরু করেছে। সেখানে নাকি ভয়ংকর একটা দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা গোড়া ধর্মান্ধ। যে কোনো মূল্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য। তারা নাকি জঙ্গী, সন্ত্রাসী, বর্বর ইত্যাদি। বিশ্বের সব তাগুতী শক্তি তাদের ব্যাপারে এমন কথাই বলছে। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ব-বিখ্যাত সব আলেম-ওলামারা ঐ সকল মুজাহিদদের খারেজী, কাফিরদের চর, ইসলাম বিরোধী অপশক্তি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে তিরষ্কার করছে। অন্যান্য বিদ্রোহীদের একত্রিত হয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান করছে। যে কোনো মূল্যে এই দলটাকে প্রতিহত করার জন্য বিশ্বের সব তাগুতী শক্তি মরিয়া হয়ে উঠেছে। রেজার মুখে আনন্দের ঝিলিক পড়ে যায়। গত কয়েক বছরে প্রতিটি মুহুর্ত সে এমন একটা খবর শোনার জন্য অধীর আগ্রহে আপেক্ষা করেছে। আজ তার সময় হয়েছে। শাহিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে,

- এবার যেতে হবে।

কথাটা শুনেই শাহিনের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আজ রাতেই রওয়ানা হয়ে যাবে। রেজা তাকে শান্ত করার জন্য বলে,

- যেতে বেশ কিছু সময় লাগবে। পরিকল্পণা করতে হবে। রাস্তাঘাট সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হবে। মনে মনে তুই নিজেও প্রস্তুত হয়ে নে। কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু।

শাহিন তার কথা রাখলো। কাউকে কিছুই বললো না কিন্তু কোনো মানুষকে বিষয়টা বলতে ভুললো না। এক সপ্তার মধ্যে দেখা গেলো গ্রামের গরু-ছাগলগুলো ছাড়া ছেলে-বুড়ো সবাই বিষয়টা জেনে ফেলেছে। রেজার মসজিদের মুছল্লীরা অনেকেই সরাসরি তাকে প্রশ্ন করে,

- আজগরের ছেলে বলল, তুমি নাকি জিহাদে যাবা!

রাগে রেজার মনটা তখন ফুসে ওঠে। মনে হয় শাহিনকে চিবিয়ে খেয়ে নিই। কিন্তু মনের রাগ মনে চেপে রেখে মুচকি হেসে বলে,

- ও তো একটা আস্ত বোকা।

শাহিন যে বোকা এটা সবাই জানে। তা না হলে কি আর এমন আজগুবী কথা বলতে পারে।

এভাবে কয়েকদিনের মধ্যে খবরটা ধামা-চাপা পড়ে গেলো। শাহিনের এই বোকামীর কারণে অবশ্য একটা লাভ হলো। এলাকার কয়েকজন ছেলে রেজার সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। তাদের সবাইকে বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া

সবাইকে সাথে নেওয়াও সম্ভব নয়। তাই রেজা বিষয়টা এড়িয়ে গেলো। তবে একটা ছেলে নাছোড়বান্দা। সে রেজার পিছু ছাড়লো না। তার নাম হাসনাত। সারাদিন ইন্টারনেটে পড়ে থাকে। জিহাদের সব খোঁজ খবর তার নখ দর্পণে। কোথায় জিহাদ হচ্ছে, কতটি দল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। তারা কে কতটুকু স্থান দখল করেছে ইত্যাদি। রেজা বুঝতে পারে সঠিকভাবে পৌঁছাতে হলে একে সাথে নেওয়া জরুরী। উপায় নেই দেখে সে তাই হাসনাতকে সাথে নিতে রাজি হলো। তিনজনে আলোচনা করে সব কিছু ঠিকঠাক করে নিল। কে কত টাকা জোগাড় করতে পারবে এবং বাড়িতে কে কি অজুহাত দেখাবে এসব আলোচনার পর কিভাবে যাত্রা করা যায় সে আলোচনা শুরু হলো। হাসনাত বলল,

- প্লেনের টিকিট কেটে সরাসরি যে দেশে জিহাদ হচ্ছে সেখানে নামলেই হবে।

রেজা তার কথা নাকচ করে দিয়ে বলল,

- প্লেনে গেলে সেটা সরকারী বিমানবন্দরে নামবে। যে সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে। বিমান বন্দর থেকে বের হওয়ার আগেই সে সরকার আমাদের বন্দি করবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাছাড়া প্লেনে

গেলে ভিসা পাসপোর্টের ব্যাপার আছে। অতিরিক্ত অনুসন্ধানের ঝামেলা আছে। আমার মনে হয় অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে গেলে ভাল হবে।

অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার কথা শুনে হাসনাত যেনো চমকে ওঠে।

- মাঝ খানে তো কয়েকটা দেশ পড়বে। সবগুলো সীমান্ত পার হওয়া তো বেশ কঠিন।

শাহিনের কাছে বিষয়টা কঠিন মনে হয় না। আগে সে প্রায়ই সরকারী আইন অমান্য করে পাশের দেশের সীমান্ত পার হয়ে গরু ক্রয়-বিক্রয় করতো। এ ব্যবসায় তার ভাল লাভ হতো। নামাজ-কালাম শুরু করার পর অবৈধ ব্যবসা মনে করে সে এটা পরিত্যাগ করে। পরে রেজা তাকে বলেছে এটা মোটেও অবৈধ ব্যবসা নয়। টাকা দিয়ে যে কারও জিনিস ক্রয় করা ইসলামে বৈধ। বিক্রেতা সীমানার এপারে কি ওপারে সেটা দেখার বিষয় নয়। মানুষের তৈরী এসব সীমানা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাগুতী সরকারের আইন অমান্য করাও পাপের কাজ নয় বরং সওয়াবের কাজ। এটা শোনার পর শাহিন আবারও গরু পারাপারের ব্যবসা শুরু করবে মনে করেছিল কিন্তু সময় সুযোগ হয়ে ওঠে নি। সুতরাং সীমান্ত পারাপারের বিষয়টি তার

কাছে পানির মতো সোজা মনে হয়। উৎসাহী হয়ে সে বলে,

- সীমান্ত পারাপারের দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমিই নিলাম।

কথাটা শুনে হাসনাত বলে,

- ঠিক আছে সীমান্ত না হয় পার হওয়া গেলো কিন্তু প্লেন ছাড়া এত লম্বা পথ পাড়ি দেবো কিভাবে?

রেজা বলে,

- কখনও হেটে কখনও বাস-বা ট্রেনে, প্রয়োজনে জাহাজে যখন যেটা সহজলোভ্য হয় তাতেই যাত্রা করবো। মানচিত্রের উপর চিন্তা-গবেষণা করে নিরাপদ পথ নির্বাচন করতে হবে। যেসব এলাকার উপর দিয়ে আমরা যাবো ঐ সকল এলাকার লোকদের পোশাক অনুকরণ করবো এবং কুশল বিনিময় করা বা প্রয়োজনীয় কিছু কেনা-কাটা করার মতো দু-একটা বাক্য শিখে নেবো। এভাবে হয়তো দীর্ঘ সময় লাগবে তবে আল্লাহ চাহে তো আমরা পৌঁছে যাবো।

আলোচনা করে সব কিছু ঠিকঠাক করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে একদিন তারা রওয়ানা হয়ে গেলো। দেশ থেকে দেশে মাঠ-ঘাট প্রান্তর পাড়ি দিয়ে তারা চলতে লাগলো। তাদের শিরা উপশিরায় অজানা

আতংক খেলা করছিল। সেই আতংককে হার মানিয়ে নিজেদের চাল-চলনকে স্বাভাবিক রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

একবার তো একটা মজার ঘটনা ঘটলো। যাত্রার কয়েকদিনের মাথায় কোনো এক স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেই পূর্ব পরিকল্পণা অনুযায়ী তারা একটা নির্জন এলাকা হেঁটে পাড়ি দিচ্ছিল। ঠিক তখনই তারা দেখলো বিকট শব্দ করে একটা বিমান ধেঁয়ে আসছে। সবার অন্তরের অবস্থা হয়তো একই রকম ছিল। তাই বিমানটাকে বোমারু বিমান মনে করে বোমার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। কেউ শুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে মাথা গুজে দিলো, কেউ গাছের নিচে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলো।

বিমানটা চলে যেতেই রেজা বেশ জোরে হেসে উঠলো। তাকে হাসতে দেখে অন্য দুজন তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে বলে উঠলো,

- জিহাদের ময়দান থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে আছি। এখানে জঙ্গী বিমান আসার কোনো কারণ নেই। এটা যাত্রী বিমান।

কথাটা বলে, রেজা বিমানটির দিকে তাকালো ততক্ষণে

সেটা বহু দূর চলে গেছে। একটা পাখির মতো দেখা যাচ্ছে। রেজা ভাবে, জঙ্গী-বিমানের সাথে সাধারন বিমানের শব্দ ও আকৃতিতে নিশ্চয় অনেক পার্থক্য আছে। যারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ তারা বিষয়টা বোঝে। খুব শীঘ্র হয়তো আমরাও বুঝবো। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কত অভিজ্ঞতা হবে! নিজের ভিতরে সে একটা শিহরণ অনুভব করে।

তারপর আবার তার অন্তরে আতংক ভর করে। সত্যিই যদি এটা বোমারু বিমান হতো। চারিদিকে বোমা নিক্ষেপ করতো। হয়তো এতক্ষণে তিনজন মৃত লাশ হয়ে যেতো। সে বুঝতে পারে তার সামনের জীবনটা হবে অত্যন্ত বিপদসংকুল। বোমারু বিমান, বারুদ কামান এসবের মাঝে তাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। একটি রাতও নিরাপদে ঘুমাতে পারবে কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। তার মনে পড়ে বাড়ির কথা, মা-বাবার কথা। মসজিদের দু-একজন মুছল্লী আর পাড়ার দু-একটা ছেলের কথা। তাদের সবাইকে নিয়ে তার জীবনটা কত নিরাপদ ছিল। এখন সে বুঝতে পারে মানুষ জিহাদকে কেনো অপছন্দ করে। তখনই তার মনে পড়ে জিহাদের সওয়াবের কথা। শহীদের মর্যাদার কথা। জান্নাতের হুর আর তার সুমধুর কণ্ঠের গানের কথা। তার মনে হয় সুদূর আরব ভূমি থেকে কেউ

একজন তাকে ডাকছে। আকাশ থেকে কেউ একজন বলছে তুমি পিছিয়ে যেয়ো না। সে আপন মনে বলে,

- আমি আসছি।

বেশ কিছু দিন এবং রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনবন্ধু গন্তব্যের খুব কাছাকাছি চলে আসলো। আর একটা মাত্র সীমান্ত পাড়ি দিলেই তারা জিহাদের ময়দানে পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে তাদের অন্তরের উত্তেজনা কয়েকগুন বেড়ে যায়। তবে রেজা অধিক সতর্ক হয়ে যায়। এত কষ্ট করে শেষ মুহূর্তে তাগুতের সেনাদের হাতে ধরা পড়ে আশাটাকে বিফল করার ইচ্ছা তার নেই। আনন্দিত বা উত্তেজিত হয়ে বোকামী না করার ব্যাপারে সবাইকে সে সতর্ক করে দেয়। তারপর সবাই সতর্কতার সাথে রওয়ানা হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর রেজা লক্ষ্য করে সীমান্তের খুব নিকটে দু'তিন জন সীমান্তরক্ষী টহল দিচ্ছে। তাদের দেখে রেজারা খুব বেশি হতাশ হলো না। এর আগেও কয়েকবার তারা টহলদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হয়েছে। তবে তার জন্য দরকার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা। গন্তব্যের খুব কাছাকাছি এসে মাথা ঠান্ডা রাখা খুব কঠিন। রেজা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখে, একেবারে ফাঁকা জায়গা। আড়াল নেওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে উঁচু বালির ঢিবি আর হাঁটু

পর্যন্ত এক প্রকার ঘাস ও আগাছা রয়েছে। সেগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে হলে পুরো মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। আপাতত এ ছাড়া অন্য কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। অতএব, সবাইকে ছোট আগাছাগুলোর মধ্যে শুয়ে পড়ে সতর্কতার সাথে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সে। প্রশিক্ষণ থাকলে এখানে হয়তো সবাই ক্রোলিং করে এগিয়ে যেতো। কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব না হওয়াই যে যেভাবে পারে হাত পা দিয়ে ঠেলে মাটিতে পড়ে থাকা দেহটাকে সামনে এগিয়ে নিতে থাকে। কিন্তু এভাবে শেষ রক্ষা হলো না। তারা টহলদারদের নজরে পড়ে গেলো। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে কিছু একটা বলল। হাসনাত আর শাহিন কিছুই বুঝলো না। তারা রেজার দিকে তাকিয়ে জানার চেষ্টা করলো সে কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা। রেজা বুঝতে পারে লোকটা আঞ্চলিক আরবীতে কথা বলছে। কিন্তু ঠিক কি বলল তা বুঝতে পারে না। ইতোমধ্যে লোকটা আরও কাছে চলে আসে। রেজা এদিক সেদিক তাকাতেই লোকটার চোখে চোখ পড়ে যায়। হাতের অস্ত্রটা উঁচু করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে আবারও কিছু বলে, কথাটা পুরো বুঝতে না পারলেও রেজা অনুমান করে সে বলছে,

- এখানে কি করছো?

তাড়াহুড়া করে সে আরবীতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই মাথায় কিছু আসে না। একটু ভেবে সে বলে,

- মানাজির খাল্লাবা।

বলে নিজের চোখের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে। এভাবে অর্ধেক মুখে আর অর্ধেক ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছি।

কথাটা শুনে লোকটা চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। তার হাসির কারণ কি সেটা রেজা বুঝতে পারে না। তখনই লোকটা বলে,

- মানাজের খাল্লাবে? ইয়া আল্লাহ কুম কুম।

এবারের কথাটা রেজা বুঝতে পারে। লোকটা বলতে চাচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি আর মাটিতে শুয়ে উপভোগ করা যায়। দাঁড়িয়ে যাও।

রেজা সবাইকে উঠতে বলে, নিজেও উঠে দাঁড়ায়। তারপর তাগুতের সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে আক্ষেপে তার অন্তর ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এত কষ্ট এত চেষ্টা এভাবে শেষ হয়ে যাবে এটা সে মেনে নিতে পারে না। তার মনে হয় হয়তো তাদের এখানেই গুলি করে শেষ করে দেওয়া হবে অথবা বন্দী করা হবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে লোকটি বলে

ওঠে,

- লে ওয়াকেফ? রুহ রুহ।

কথাটি বলতে বলতে লোকটি সীমান্তের দিকে ইশারা করে। নিজের কানকে রেজা বিশ্বাস করতে পারে না। এই লোকটি তাদের সীমান্তের দিকে চলে যেতে বলছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। অত শত ভাবার সুযোগ নেই। সবাইকে নিয়ে রেজা রওয়ানা হয়ে যায়। তার মনে হচ্ছিল হয়তো তাগুতের সেনাগুলো পিছন থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করবে। সে যে কোনো মুহুর্তে গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পিছন থেকে কোনো শব্দ শোনা গেলো না। রেজার কানে শুধু ভেসে আসে লোকগুলো বারবার হাসছে আর বলছে,

- মানাজের খাল্লাবে!

তাদের হাসি রেজার কোমল অন্তরটা বিদীর্ণ করে। এভাবে তারা সীমান্ত পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সীমান্তের ওপারে গিয়ে হাসনাত আর শাহিনের খুশি যেনো উপচে পড়ে। খুশিতে আটখানা হয়ে বলে,

- লোকগুলো কত ভাল!

রেজা বিরক্ত হয়ে বলে,

- তাগুতের চেলা।

হাসনাত বলে,

- তাতে আমাদের কি? আমরা তো ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি।

- মোটেও ঠিক জায়গা নয়। একেবারে ভুল জায়গায়।

শাহিন অবাক হয়ে বলে,

- ভুল জায়গা হবে কেনো!

- একটু অপেক্ষা করলেই সেটা বুঝতে পারবি।

কথাটা বলে নাক বরাবর হাঁটতে থাকে রেজা। রাস্তার দু'পাশের বেশিরভাগ বাড়ি-ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত। এলাকাটা বলতে গেলে জন-মানবহীন। সীমান্তের টহলদার সৈনিকগুলো বিনা বাঁধায় তাদের ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে রেজার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ কাজ করছে। বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি-ঘর আর নির্জন এলাকা দেখে তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে। যে দলটি সরকারের বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহ শুরু করেছিল তাদের নাম ছিল জায়শে তাহরীর, সংক্ষেপে জে.টি। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল একটি তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে আরেকটি তাগুত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। একারণে প্রথমে কাফির মুশরিকরা এ বিদ্রোহকে সমর্থন করে। এমনকি তাদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগীতা করে। তবে সাধারন মানুষ এতে

খুব একটা সাড়া দেয় নি। অকারণে জীবন দেওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তাদের ছিল না। ফলে এই দলটি দিনে দিনে দূর্বল হয়ে পড়ে। তাগুতী শক্তি এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তারা ইসলামের নামে কয়েকটি দল গঠন করে মানুষকে জিহাদের দিকে আহ্বান করে। তাদের অনুগত ওলামা-মাশায়েখরা এই জিহাদকে ফরজ হিসেবে আখ্যায়িত করে। ফলে দলে দলে মানুষ এসব দলে যোগদান করে। এদের মধ্যে একটি দলের নাম কাতায়েবে আহলে হাক। সংক্ষেপে বলা হয় কাতায়েব। এ দলের নেতারা মুখে ইসলামের কথা বললেও গোপনে তাগুতের সাথে হাত মিলায়। তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করে। তাগুতী শক্তি চেয়েছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে জিহাদ পরিচালনা করে সরকার পতনের পর নিজেদের পছন্দ মতো একটা রাষ্ট্র গঠন করতে। বিদ্রোহী নেতারা যেহেতু তাদের পুতুল হিসেবে কাজ করছে, তাই তাদের এ আশা বাস্তবে পরিণত হতে কোনো বাঁধা ছিল না। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে কিছু বিচক্ষণ মুজাহিদের কাছে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। তারা সঠিক ইসলামী ভাবধারার উপর একটি দল গঠন করে। দলটির নাম জায়শে নবী সংক্ষেপে জে.এন। এই দলটির নেতৃত্বস্থানীয়রা দেশী বিদেশী সকল তাগুতী শক্তির

সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। প্রতিবেশী আরব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বুঝতে পারে তাদের ষড়যন্ত্র বিফল হতে চলেছে। ফলে তারা এই দলটির উপর বিভিন্ন অপপ্রচার চালাতে থাকে। তাদের অনুগত ওলামা-মাশায়েখরাও এই দলটির বিরুদ্ধে নানা রকম বিভ্রান্তিমুলক ফতোয়া দিয়ে মানুষকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কথায় বলে, রাখে আল্লাহ মারে কে! এতো ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এই দলটির লোক সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সরকারী বাহিনীর কাছ থেকে তারা কয়েকটি এলাকাও দখল করে নেয়। ইন্টারনেটে খোঁজ খবর করে আর মানচিত্র দেখে যতদূর মনে হয়েছে এই এলাকাটা তাদের দখলে থাকার কথা। একারণে তারা অনেক কসরত করে এই এলাকায় প্রবেশ করেছে যাতে সত্যপন্থী দলটির সাথে যোগ দেওয়া যায়। কিন্তু এখন রেজার মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় চলে এসেছে। তা না হলে তাগুতের সৈনিকরা তাদের সহজে ছেড়ে দিলো কেনো!

হঠাৎ সে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারে। জায়গাটা ঠিকই আছে। তবে অবস্থা পাল্টে গেছে। তারা রওয়ানা হওয়ার পর হয়তো সরকারী বাহিনী বা আন্তর্জাতিক জোট এখানে ব্যাপক বোমা হামলা করেছে। সেই ফাঁকে

অন্য কোনো বিদ্রোহী গ্রুপ এলাকাটি পুনর্দখল করেছে। এই গ্রুপটি হয়তো নামধারী মুজাহিদদের কোনো গ্রুপ হবে। কাতায়েবও হতে পারে। তাদের হাতে পড়লে সব আশা হতাশায় পরিণত হবে। প্রকৃত জিহাদের পরিবর্তে ফিতনা ফাসাদ করেই জীবনটা শেষ হবে। হাসনাতের দিকে তাকিয়ে সে বলে,

- আমাদের সতর্কভাবে চলতে হবে। কোনো ক্রমেই এদের হাতে পড়া যাবে না।

হাসনাত অবাক হয়ে বলে,

- কাদের হাতে!

কথাটার ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় পাওয়া গেলো না। রেজার চোখে পড়লো খানিকটা দূর দিয়ে দশ-বারো জন লোক হেঁটে যাচ্ছে। সবার মুখে দাড়ি, কাঁধে অস্ত্র। তাদের দেখামাত্র শাহিন বলে উঠলো,

- ঐ তো মুজাহিদরা যাচ্ছে!

কথাটা বলতে বলতে শাহিন জোরে পা চালিয়ে তাদের দিকে যেতে থাকে। হাসনাত একবার রেজার দিকে আর একবার শাহিনের দিকে তাকাতে থাকে।

- এই গাধা ফিরে আয়।

কথাটি বলতে বলতে রেজা হাসনাতের বাম হাতটি শক্ত করে ধরে টানতে টানতে রাস্তার পাশে একটা ভাঙা

ঘরের দিকে চলে যায়। ওখানেই আত্মগোপন করতে হবে। শাহিন কিছু বুঝে উঠতে পারে না। বহু দূর থেকে তারা জিহাদ করতেই এসেছে। তবে মুজাহিদদের সামনে পেয়ে কেনো আত্মগোপন করতে হবে সেটা তার বুঝে আসে না। তবু অন্য দুজনকে আত্মগোপন করতে দেখে নিজেও তাদের পিছু নেয়।

ভাঙা ঘরটাতে ঢুকেই দেখা গেলো একজন বৃদ্ধা একটা চাদর পেতে তজবী টিপে টিপে যিকির করছে। এই ভাঙা ঘরে যে কেউ থাকতে পারে সেটা রেজার কখনও মনে হয় নি। কোনো কিছু চিন্তা না করে সে বৃদ্ধার চোখের আড়াল হওয়ার চেষ্টা করে। একটা ভাঙা দেওয়ালে নিজেকে আড়াল করে রেজা। তাকে দেখে হাসনাতও পা টিপে টিপে সেখানে হাজির হয়। আর তখনই শাহিন ধপ করে লাফিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বৃদ্ধা কানে যে খুব ভাল শোনেন তা নয়। একটু আগে রেজা আর হাসনাতের উপস্থিতি তিনি ধরতে পারেন নি। তবে শাহিন বেশ জোরে শব্দ করায় তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। শব্দের উৎসের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই মূর্তিমান একটা মানুষকে দেখতে পান। এ সময় তার মুখে ভয় বা বিস্ময় প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু তার চেহারায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় মানুষের এমন লুকোচুরি

তিনি প্রায়ই দেখেন। শাহিনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,

- হেনা তায়াল।

কথাটা না বুঝলেও হাতের ইশারা দেখে শাহিন বুঝতে পারে বৃদ্ধা তাকে কাছে যেতে বলছে। কিছু ভয় আর আগ্রহ মিশ্রিত হয়ে সে বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে যায়। হাতের ইশারায় তিনি তাকে পাশে বসিয়ে বলেন,

- আস-মুক

এমনিতেই শাহিন আরবীর কিছুই বোঝে না। তার উপর বৃদ্ধার জড়ানো কথাটা সে ঠিক মতো শুনতে পায় না। বৃদ্ধা যে তার নাম জিজ্ঞাসা করছে এটা সে বুঝতে পারে না। তার কাছে মনে হয় বৃদ্ধা হয়তো তাকে হাতমুখ ধুতে বলছে। নতুন মেহমান আসলেই গ্রামের লোকজন হাত মুখ ধুয়ে আসতে বলে। শাহিন চারিদিকে তাকিয়ে দেখে এখানে কোনো পানির ব্যবস্থা নেই। হাতমুখ ধুতে হলে এখন এই বৃদ্ধা মানুষটিকে উঠে গিয়ে পানি নিয়ে আসতে হবে। সে তড়িঘড়ি করে বলে,

- না, না।

- নানা!!

নামটা শুনে বৃদ্ধা যেনো একটু অবাকই হলেন।

রেজা বুঝতে পারে দলের একজন ধরা পড়ার পর

বাকীদের লুকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া এই বৃদ্ধার সাথে আলাপ করতে পারলে হয়তো মুক্তির একটা উপায় বের করা যাবে। এই ভেবে সে দেওয়ালের আড়াল থেকে বেড় হয়ে আসে। তার দেখাদেখি হাসনাতও বের হয়ে আসে। তাদের দেওয়ালের আড়াল থেকে বের হতে দেখে বৃদ্ধা কিছুটা অবাক হলেন। রেজাদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে শাহিনের দিকে তাকিয়ে বলেন,

- আসহাবুকা?

অর্থাৎ এরা কি তোমার সাথী। কথাটা শুনে অবশ্য খুশিতে শাহিনের দাঁতগুলো বের হয়ে পড়লো। সে ভাবল বৃদ্ধা রেজাদের বলছে, আচ্ছাবোকা। রেজাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল,

- এই বোকারা।

এতদূর বলে হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের কাছে আসতে বললো।

শাহিনের কথাটা শুনে বৃদ্ধা খিল খিল করে হেসে উঠলো। কারও নাম যে বাকারা বা গাভী হতে পারে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। বৃদ্ধার হাসি দেখে রেজা নিশ্চিন্ত হলো। তার মনে হয় সেই হাসিতে মমতা আর সততা উভয়ই মিশ্রিত হয়ে আছে। সে ভাবে বৃদ্ধাকে

সব খুলে বলা যায়।

তবে সে বলার আগেই শাহিনই প্রসঙ্গটা তোলে। বাইরের লোকগুলোকে দেখে রেজা কেনো পালিয়ে আসলো শাহিনের এখনও সেটা বুঝে আসে নি। তার কাছে মনে হচ্ছে লোকগুলো মুজাহিদই হবে অতএব পালিয়ে আসার বদলে তাদের সাথে যোগ দেওয়া দরকার। মনে মনে রেজার উপর তার খুব রাগ হয়। তার মনে হয় এই বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলে তিনিই আসল খবর বলতে পারবেন। এই ভেবে সে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল দ্বারা ভাঙা দেওয়াল গুলোর দিকে ইশারা করে বলে,

- ওরা কি মুজাহিদ না!

শাহিনের বাংলা কথা বৃদ্ধার না বোঝায় উচিৎ ছিল কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। ওরা অর্থ পিছনে বা আড়ালে, কি মানে আপনি, মুজাহিদ না শব্দটি একত্রে তিনি বুঝলেন মুজাহিদীনা অর্থাৎ একদল মুজাহিদ। গড়ে মিলে তিনি বুঝলেন ছেলেটি বলছে আপনার পিছনে এই দেওয়ালের আড়ালে একদল মুজাহিদ রয়েছে। ঘটনা বুঝতে তার কোনো সমস্যা হয় না। গত কয়েকদিন হলো বিমান হামলার প্রভাবে জায়শে নবীর মুজাহিদরা এ এলাকা থেকে সরে পড়েছে। সেই ফাঁকে

কাতায়েবের লোকেরা এলাকাটা দখল করেছে। তারা নিজেদের মুজাহিদ বলে পরিচয় দিলেও আসলে তারা মুজাহিদদের শত্রু। এখানে সেখানে জায়শে নবীর সদস্যদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে, হত্যা করছে। শাহিনের কথা শুনে বৃদ্ধা বুঝতে পারেন তারা হয়তো আবারও খোঁজ খবর করতে এসেছে। ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়িয়ে বলেন,

- মুজাহিদ! লে, হারামী, কুত্তা তুরুক।

কথাগুলো বলেই বৃদ্ধা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যান।

আরবীতে হারামী মানে চোর-ডাকাত, কুত্তা তুরুক মানে যে রাহাজানী করে। শাহিন এতো কিছু বুঝলো না। কেবল বুঝলো বৃদ্ধা মানুষটি হারামী কুত্তা ইত্যাদি বলে ঐ সব লোকদের গালি গালাজ করছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে রেজার কথাই ঠিক। এরা আসল মুজাহিদ নয়। এরা হারামী। রেজার দিকে তাকিয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,

- তুই আগে থেকেই কিভাবে বুঝলি? এ তো অবাক ব্যাপার।

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- তুই যে আরবী কথা বুঝে ফেললি এটা তো আরও

বেশি অবাক ব্যাপার!

শাহিন স্বাভাবিক ভাবে বলে,

- আরবী হবে কেনো? এতক্ষণ তো উনি আমার সাথে বাংলাতে কথা বললেন। আমার তো মনে হচ্ছিল বাড়ি বসে নানির বা দাদির সাথে গল্প-গুজব করছি। এতদূর বলতেই বৃদ্ধাকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখা গেলো। মেঝেতে বিছানো চাদরটি তাড়াতাড়ি করে তুলে নিয়ে শাহিনের দিকে তাকিয়ে বলেন,

- আয় নানা। খোজ।

বৃদ্ধার আঙ্গুলির ইশারার দিকে চোখ বুলিয়ে শাহিন খুঁজতে থাকে। কিন্তু তার চোখে কিছুই পড়েনা। কিছুক্ষণ খুজার পর রেজার দিকে ঘুরে বলে,

- উনি আমাকে কি খোঁজ করতে বলছেন? এখানে তো কিছুই নেয়!

- আরে গাধা কিছুই খুঁজতে বলছে না, কিছু একটা ধরতে বলছে।

কথাটা বলে রেজা ভালভাবে লক্ষ্য করে। ছাদের একটা অংশ ভেঙে মেঝেতে পড়েছে। তার উপরই বৃদ্ধার চাদরটি বিছানো ছিল। বৃদ্ধা এখন সেই ভাঙা অংশটিকে সরাতে বলছেন। সে তাড়াতাড়ি সেখানে হাত লাগায়। তার দেখাদেখি শাহিন আর হাসনাতও হাত লাগায়।

সেটা উঁচু করতেই দেখা গেলো নিচে মাঝারী সাইজের একটা গর্ত। তিন জন লোক কষ্ট করে লুকিয়ে থাকার মতো। এতক্ষণে বৃদ্ধার উদ্দেশ্য অনুধাবনে কারও কোনো কষ্ট হলো না। প্রথমেই রেজা আর হাসনাত গর্তের ভিতর ঢুকে পড়লো। ভিতর থেকে হাত উঁচু করে ঠেলে তারা ভাঙা ছাদটিকে উঁচু করে রেখেছিল। শাহিন প্রবেশ করতেই ধীরে ধীরে সেটাকে নিজেদের মাথার উপর বসিয়ে দিলো। গর্তের মধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে আসলো। আবছা যে আলোটি গর্তে প্রবেশ করছিল বৃদ্ধা চাদর বিছাতেই সেটিও গায়েব হয়ে গেলো। আগের মতোই ভাঙা ছাদটির উপর চাদর বিছিয়ে বসে তিনি দোয়া-দরুদ পড়তে থাকেন। এভাবে অনেক্ষণ কেটে গেলো কিছুই ঘটলো না। এতটুকু জায়গার মধ্যে তিনজন ঠাসা-ঠাসি করে থেকে সবাই একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল চাপ দিয়ে মাথার উপর থেকে ভাঙা ছাদটি সরিয়ে উঠে পড়ি। কিন্তু সে উপায় নেয়। বৃদ্ধা মানুষটি এই ভাঙা ছাদটির উপর বসে আছেন। এমতাবস্থায় এটা উঁচু করে সরাতে গেলে তিনি পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাবেন। তারচেয়ে বরং নিরবে অপেক্ষা করাই উত্তম মনে হয় রেজার কাছে। সেই কখন থেকে একটা বিষয় হাসনাতের মাথায় উঁকি দিচ্ছে। এই সুযোগে সে শাহিনকে বলে,

- উনি তোমাকে নানা বলে ডাকলো কেনো?

- এইটা বুঝলে না। আমাদের দেশে মুরব্বীরা আমাদের বয়সী ছেলেদের নিজের নাতির মতো মনে করে। তাই দাদা বা নানা একটা কিছু বলে ডাকে। উনি আমার নানির বয়সের তাই আমাকে নানা বলে ডাকছে। সহজ হিসাব।

শাহিনের ব্যাখ্যাটি চমৎকার মনে হলেও হাসনাত বুঝতে পারে তাতে গলদ রয়েছে। সে একটু অবাক হয়ে বলে,

- এই বৃদ্ধা তো আর বাঙালী নন তিনি আরবী। তিনি কেনো নানা বলবেন?

কথাটা শুনে শাহিনও একটু চিন্তায় পড়ে যায়। তারপর সহজভাবে বলে,

- ইনি আরবী হলেও হয়তো বাংলা বোঝেন। আমাদের রেজা যেমন বাঙালী হয়েও আরবী বোঝে।

কথাটা শেষ হতেই হঠাৎ হৈ-চৈ শোনা গেলো। দু-একজন আঞ্চলিক আরবীতে বৃদ্ধার সাথে কথা বলল। মনে হলো তারা ভাঙা ঘরটিতে উঠে আসলো। এদিক সেদিক ঘুরা-ফিরা করলো। উত্তেজনায় তিনজনের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। ঠিক তখন গর্তের মধ্যে আবছা আলো দেখা গেলো। অনেক্ষণ অন্ধকারে থাকার কারণে সেই আলোটুকুই যেনো গর্তের মধ্যে

চকচক করছিল। কি ঘটেছে বুঝতে রেজার সময় লাগলো না। লোকগুলো চাদরটা সরিয়ে ফেলেছে। এখনই তারা ভাঙা ছাদটা তুলে ফেলবে। তিনজন হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে। জে.এন এর সদস্য হিসেবে তাদের এখানেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে অথবা বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে। রেজা বুঝতে পারে বাঁচার কোনো পথ নেই। মনে মনে সে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। হঠাৎ তার মাথায় একটা পরিকল্পণা আসে। ভাঙা ছাদটির নিচের দিকে বেশ কিছু রড বের হয়ে রয়েছে। রেজারা যেদিক থেকে ছাদটি উঁচু করেছিল সেদিকে একটা রড খাড়া বের হয়ে রয়েছে। লোকগুলো যদি ছাদটি উঁচু করতে চায় তবে সেদিক থেকেই উঁচু করার চেষ্টা করবে। যেহেতু সেটাই সুবিধাজনক। কি করতে হবে রেজা সবাইকে ইশারায় বুঝিয়ে দেয়। তিনজন ঐ দিকের রড গুলো ধরে যতদূর সম্ভব শক্তি দিয়ে নিচের দিকে টেনে ধরার চেষ্টা করে। এই বুদ্ধি দারুণ কাজ করে। বাইরে দুজন লোক ছিল। তারা কয়েকবার চেষ্টা করেও ভাঙা ছাদটি সামান্যও নড়াতে পারলো না। শেষে একজন বিরক্ত হয়ে বলল,

- মাসদুদ। লা আহাদ ফিহি।

রেজা মনে মনে হাসলো। ওরা মনে করছে এটা শক্তভাবে আটকানো। এর মধ্যে কেউ ঢোকা সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ পর ঘর খালি হয়ে গেলো। মনে হলো বৃদ্ধা নিজেও বের হয়ে গেলেন। হয়তো দেখতে গেছেন এরা আসলেই চলে যায় কি না। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন,

- ইয়া নানা। উখরুজ।

তার কথা শুনে সবাই মিলে ছাদটা উঁচু করে ধরলো। প্রথমেই শাহিন বের হয়ে আসল। এরপর সে বাইরে থেকে ছাদটাকে উঁচু করে ধরলো আর অন্যরা ভিতর থেকে বের হয়ে আসলো। দুজন লোক গাট্টাগোট্টা মানুষ যে জিনিস তুলতে পারলো না সেটা শাহিনকে একা তুলতে দেখে বৃদ্ধা অবাক হয়ে বললেন,

- ইনতা গয়ী।

রেজা মুচকি হেসে বলে,

- লা ইয়া জাদ্দাহ্ ইন্নাহু গবী।

কথাটা শুনে বৃদ্ধা শব্দ করে হেসে ওঠেন। এই সহজ সরল ছেলেটা যে একটু বোকা হতে পারে তিনি সেটা বুঝতে পারেন।

শাহিন বুঝতে পারে তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। মুখ ভার করে বলে,

- এই কী বললি!

শাহিনের মুখের ভাব দেখে রেজা হেসে বলে,

- তোর খুব সুনাম করছিল তো তাই একটু ডজ দিলাম।

এসব নবাগত মুজাহিদদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা বৃদ্ধার নিকট খুব জরুরী মনে হয়। তিনি কালবিলম্ব না করে তাদের নিয়ে গোপন পথে বের হয়ে পড়েন। পথে খুব সতর্তকতার সাথে চলতে হচ্ছিল। এমনিতে এলাকার সবাই জায়শে নবীকে ভালবাসে। এই ছেলেগুলো যে তাদের নিকট যাবে তা তাদের অজানা নয়। জালেম শাসক আর ভন্ড মুজাহিদদের বিপরীতে জায়শে নবীর মুজাহিদরা এ দেশের সবার নিকট একমাত্র আশার প্রদীপ। মুক্তির একমাত্র পথ। রেজাদের দেখে শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও তাই তাদের মুখে খুশির ঝিলিক দেখা যায়। অতএব, এখানে রেজাদের পথ আটকানোর কেউ নেই। তবে এদের মধ্যে কোনো গোয়েন্দা থাকা অসম্ভব নয়। এটাই একমাত্র সমস্যা নয়। এদিক সেদিক কাতায়েবের লোকেরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে এলাকার মানুষগুলো একে অপরের সহযোগীতায় সিদ্ধহস্ত। বন্যার সময় সাপ আর মানুষ যেমন একই গাছে বাস করে। এই বিপদে তারা অতীতের সব বিভেদ ভুলে জান-প্রাণ দিয়ে একে

অপরকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। রেজা দেখলো মোড়ে মোড়ে দু'একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা তাদের সাথে হাতের ইশারায় কথা বলে জেনে নিচ্ছেন সামনের রাস্তা নিরাপদ কিনা। গ্রীন সিগনাল পেলে তিনি রেজাদের নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে নিরাপদে বেশ কিছু পথ পার হওয়া গেলো। এরপর বৃদ্ধা রেজাদের নিয়ে একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আগের মতো এটিও একটি পরিত্যাক্ত ভাঙা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে শাহিনের দিকে তাকিয়ে তিনি দ্রুত আরবীতে কিছু কথা বলে বের হয়ে গেলেন। বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পর রেজা শাহিনকে বলে,

- কিরে কি বুঝলি?

- কিচ্ছু বুঝলাম না।

হালকা হেসে রেজা বলে,

- বাংলা কথা বুঝলি না?

- বাংলা না ছাই। অমন হিজিবিজি কথা জীবনে শুনি নি?

হেয়ালী ছেড়ে রেজা এবার গম্ভীর হয়ে বলে,

- আমাদের এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে। রাতে কেউ এসে নিয়ে যাবে।

হাসনাত বলে,

- যে কেউ আসলেই কি আমরা তাদের সাথে বের হয়ে পড়বো? তারা যে জায়শে নবীর সদস্য তার প্রমাণ কি? শত্রুপক্ষও তো হতে পারে?

হাসনাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তার প্রশ্নটি শুনে নিয়ে রেজা শাহিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে,

- তারা এসে তোর নাম ধরে ডাকবে। এতেই আমরা বুঝবো তারা আমাদের বন্ধু, শত্রু নয়। শত্রু পক্ষ তো আর তোর নাম জানে না।

কথাটা শুনে শাহিনের দাতগুলো তার অজান্তেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তবে একটু পরই তার মুখটা আবার সংকুচিত হয়ে যায়। নিজের মনেই বলে,

- কিন্তু উনি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন নি। নাম বলাও হয় নি।

মুচকি হেসে রেজা বলে,

- প্রথমেই উনি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করেছেন। যখনই উনি নাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কিছু না বুঝে বললে, না, না। উনি ভেবেছেন তোমার নাম নানা।

কথাটা শুনেই হাসনাত বেশ একটু শব্দ করেই হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে,

- আর এই কারণেই তো বারবার নানা বলে ডাকছে।

হাসনাতকে হাসতে দেখে শাহিনের মুখটা লাল হয়ে যায়। রেজা হাতের ইশারায় সবাইকে নিরাবতা অবলম্বন করতে বলে।

এভাবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো এবং একসময় রাত নামলো, রাত গভীর হলো। কিন্তু কেউ এলো না। শাহিন বেশ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসনাত একটু আগেও রেজার সাথে দু একটা কথা বলছিল। এখন নিরব হয়ে গেছে। সেও হয়তো ঘুমাচ্ছে। শুধু রেজা ঠাঁই বসে রয়েছে। তাকে ঘুমালে চলবে না। ছোট এই দলটির নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন তার হাতে। হঠাৎ কিছু লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। রেজার চোখে-মুখে একই সাথে আনন্দ আর আতঙ্ক উভয়ই ফুটে উঠলো। এরা শত্রু পক্ষও হতে পারে আবার বন্ধুও হতে পারে। সে সম্পূর্ণ নিরব থাকলো। তখনই শোনা গেলো,

- নানা, নানা, ইনতা হেনা।

রেজা দ্রুত উত্তর দিয়ে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে জানান দিলো,

- আনা হুনা।

লোকগুলো তাদের দ্রুত বের হতে বলল। রেজা শাহিন আর হাসনাতকে ডেকে তুলে দ্রুত আস্তানা থেকে বের

হয়ে পড়ল। মাঠ-ঘাট প্রান্তর পাড়ি দিয়ে ভোর হওয়ার আগেই তারা জায়শে নবীর এলাকায় পৌঁছে গেলো। প্রথম দিন থেকেই তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। অস্ত্র চালানো, বোমা ফাটানো, চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া, আগুনের উপর লাফিয়ে যাওয়া, এরকম কত কৌশল তাদের রপ্ত করতে হলো। এরপর ছোটখাটো অভিযানে তাদের সাথে নেওয়া হলো। রেজার অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবে রুপ নিল। খুশিতে তার হৃদয় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। একদিন বাইরে থেকে একজন অতিথি আসলেন। জায়শে নবীর আমীর এর পক্ষ থেকে তিনি সবাইকে বায়াত করালেন।

“আমরা শুনবো ও মানবো, পছন্দ হোক আর অপছন্দ হোক। যদিও আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমীরের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তার আনুগত্য করতে থাকবো”

রেজারা তিনজন সেদিন বায়াত হয়েছিল। বায়াতের সময় শাহিনের মনে পড়ে যায় পটলপুরের অটলবীরের কথা। সেও তো মানুষের বায়াত নিতো। কিন্তু তার বায়াত ছিল ভুয়া। এই বায়াতটাও ভুয়া নয়তো!

- ছি ছি আমি এ কি ভাবছি! এটা তো জিহাদের

বায়াত। জিহাদের বায়াত কি ভুয়া হতে পারে! এ তো আর পীরের বায়াত নয়!

নিজেকে নিজেই ধমকায় শাহিন। রেজাও তখন পটলপুরের কথা ভাবছিল। ভাবছিল পীরের মাহফিলে গিয়ে দেখা স্বপ্নটার কথা। একদল মুজাহিদ, কালো পতাকা আর ইমাম মাহদির জন্য বাহিনী প্রস্তুত করার কথা। সকল তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার কথা। আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে বলে,

- এটা কি খেলাফতের বায়াত?

মুচকি হেসে তিনি বলেন,

- এটা খেলাফতের বায়াত নয়। তবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার বায়াত। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করার বায়াত। এখনও কাওকে খলীফা মনোনিত করা হয় নি। এখনও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। তাই এখন আমরা কেবল জিহাদের বায়াত নিচ্ছি। এভাবে যখন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা খেলাফতের ঘোষণা দেবো। একজন খলীফা মনোনিত করে তার হাতে বায়াত হবো। এভাবেই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা শুনেই রেজার মনটা নেচে

ওঠে। তার মনে হয় আজকের এই বায়াতের মাধ্যমে সত্যিই একদিন বিশ্বব্যাপী খেলাফত কায়েম হবে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রিয় মাতৃভূমী। সেখানে রেখে আসা মা-বাবা আর আত্মীয় স্বজনের কথা। সে ভাবে একদিন সেখানেও তাগুতী শাসনের অবসান হয়ে ইসলামী শাসন কায়েম হবে। নিজের অজান্তেই রেজার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। মুখ শক্ত করে অস্ফুট স্বরে সে বলে,

- আমরা আসছি।

আরবী জানার কারণে রেজার অনেক সুবিধা হলো। খুব কম সময়ের মধ্যেই মুজাহিদ নেতাদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো। কয়েক মাসের মধ্যে জায়শে নবীর উঁচু স্তরের নেতাদের সাথে তার পরিচিতি ঘটলো। তারাও তাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলো। আরবী, বাংলা এবং উর্দু ভাষায় বিশেষ দক্ষতার কারণে দ্রুতই ভারত উপমহাদেশ থেকে আশা মুজাহিদদের সাথে আরব মুজাহিদদের যোগাযোগের একটা মাধ্যমে পরিণত হলো সে।

প্রথম কয়েক মাস অতিরিক্ত আবেগ আর কর্ম-ব্যস্ততার কারণে মুজাহিদদের ভাল গুণগুলো ছাড়া মন্দ কিছু তার

চোখে পড়েনি। কিন্তু পরের দিনগুলোতে হঠাৎ এমন কিছু বিষয় তার চোখে পড়ে যেতো যা তার অন্তরকে ভীষণভাবে ব্যথিত করতো। সবার প্রথমে যে বিষয়টি তার চোখে পড়ে তা হলো, বৈষম্য নীতি। জায়শে নবীর কর্মনীতিতে দেশী মুজাহিদ আর বিদেশী মুজাহিদদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হতো। অনারব মুজাহিদদের তো বটেই এমনকি অন্যান্য আরব দেশ থেকে আসা মুজাহিদদেরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হতো না। বড় বড় পদ গুলো দেশীয় মুজাহিদদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এধরণের গোত্রপ্রীতি যে সুস্পষ্ট জাহেলীয়াত সেটা বুঝতে রেজার মোটেও অসুবিধা হলো না। সে চিরকালই একগুয়ে স্বভাবের। অনিয়ম গুলো মেনে নেওয়া তার পক্ষে সহজ নয়। একবার এক সমাবেশে জায়শে নবীর সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। সে তাদের সবার সামনে সরাসরি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা বলে,

- গোত্রপ্রীতি যে জাহেলীয়াত সেটা তো আমরা বুঝি। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে এটা শক্তভাবে স্থান গেড়ে রয়েছে। এখন যদি এদের উপর ভীনদেশের লোকের নেতৃত্ব দেওয়া হয় তবে তারা বিদ্রোহ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত জিহাদটাই মাটি হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) মানুষের উপর সহজ করতে আদেশ করেছেন।

কঠিন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আনসারদের উপর মুহাজিরদের নেতৃত্ব না দেওয়াই ইসলামী নীতি।

কথাটা শুনে রেজার বুকটা ভেঙে গেলো। যুক্তি তর্কে তার জুড়ি নেই। এই কথাটা ভুল প্রমাণ করে দেওয়া তার জন্য এক মিনিটের ব্যাপার। এর আগে বহু ফিরকা আর মতবাদের লোকেরা তার যুক্তির কাছে হার মেনেছে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে যে লোকগুলোকে সে সর্বোত্তম লোক মনে করেছে আজ তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হবে। বিষয়টি সে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তবে নিজেকে সে সংযত রাখতে পারে না। মন ভার করে বলে,

- মুহাজিরদের নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি কথাটা কি সঠিক হলো? খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেনাপতি হয়ে কয়টা অভিযান পরিচালনা করেছেন সেটা কি আপনারা জানেন না? তিনি তো মক্কার লোক ছিলেন মদীনার নয়। মু'তার যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তিনজনকে আমীর নিয়োগ করেন। যায়েদ ইবনে হারিছা, জা'ফার ইবনে আবি তালীব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। তাদের মধ্যে প্রথম দুজন ছিলেন মুহাজির। রোমের বিরুদ্ধে যে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন তার আমীর করেন উসামা ইবনে যায়েদকে। এমনকি এ বিষয়ে মানুষ যখন আপত্তি উত্থাপন করেন তিনি তাদের ভীষণ তিরষ্কার

করেন।

তাছাড়া আপনারা স্বদেশ আর বিদেশের মধ্যে যে পার্থক্য করছেন এই সীমানা তো কাফিরদের তৈরী। এক দেশের মুসলিমরা ভীন দেশের মুসলিমদের পর ভাববে এ উদ্দেশ্যেই তো এ সীমানা তৈরী করা হয়েছে। অন্য দেশে যত অন্যায় অবিচার হোক তার প্রতিবাদ করবো না। কেবল নিজের দেশে হামলা হলে রুখে দাঁড়াবো। অন্য দেশের লোক যোগ্য হলেও তার নেতৃত্ব মেনে নেবো না। নিজের দেশের লোক অযোগ্য বা ফাসেক হলেও তার নেতৃত্ব মেনে নেবো এটাই তো কাফিরদের এই সীমানার উদ্দেশ্য। এখন আপনারা এই জাহেলী সীমানা মেনে নিয়ে এ দেশের লোকেরা ভীনদেশের মুসলিমদের নেতৃত্ব মেনে নেবে না এটাকে যদি স্বাভাবিক মনে করেন তবে আমিও বলবো অন্য দেশের লোকেরা যে আপনার দেশের লোকদের রক্ষা করার জন্য জিহাদ করতে আসছে না এটাই স্বাভাবিক। এটাও আপনাদের মেনে নিতে হবে, এটাকে তিরষ্কার করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।

পাশ থেকে একজন বলে,

- জিহাদ করা তো আল্লাহর আদেশ। সেটা কি পরিত্যাগ করা যায়?

রেজা তার দিকে তাকিয়ে বলে,

- জিহাদ করা যেমন আল্লাহর আদেশ তেমনি বংশ, গোত্র, দেশ ইত্যাদির উর্ধ্বে যোগ্য লোকের নেতৃত্ব মেনে নেয়াও আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই অধিক সম্মানিত যে অধিক তাকওয়াবান।

এরপর সবাই কিছুক্ষণ নিরব থাকে। কিন্তু তারা যে রেজার কথা মেনে নিয়েছে সেটাও মনে হয় না। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য রেজা বলে,

- আরও একটি জটিল বিষয় লক্ষ্য করুন। আপনারা তো ইসলামী খেলাফত চান?

সবাই একবাক্যে বলে,

- হ্যাঁ অবশ্যই চাই।

- ইসলামী খেলাফত মানে তো সকল মুসলিমকে এক নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করা তাই না?

- হ্যাঁ তা তো ঠিকই।

- এখন যদি এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের নেতৃত্ব মানবো না এই নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে কি কখনও খেলাফত হওয়া সম্ভব? আপনার দেশের লোকেরা যদি অন্য দেশের নেতৃত্ব মানতে না চায় তবে অন্য দেশের লোকেরা আপনাদের নেতৃত্ব কেনো মানবে? অতএব, খেলাফত কিভাবে হবে?

কিছুক্ষণ নিরবতার পর একজন বলেন,

- ততদিনে মুসলিম উম্মাহ এই রোগ থেকে মুক্ত হবে।

রেজা উত্তেজীত হয়ে বলে,

- মুক্ত হবে বললেই তো হয়ে যাবে না। রোগের চিকিৎসায় আপনারা কি ভূমিকা রাখছেন সেটাই এখানে মুখ্য বিষয়। বাতিলকে মেনে নিয়ে সেটা সংশোধন সম্ভব নয় বরং বাতিলকে পরিত্যাগ করে এবং তার বিরুদ্ধে প্রচার করেই তার সংশোধন করতে হয়। যদি সত্যিই আপনারা বিষয়টির সংশোধন চান তবে এখন থেকেই এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করুন। তা না হলে এলাকাভিত্তিক ইসলামী শাসন হয়তো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত কায়েম করা কখনও সম্ভব হবে না।

জায়শে নবীর আমীর স্বয়ং সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এতক্ষণ নিরবে সব কথা শ্রবণ করছিলেন। এ পর্যায়ে নিরবতা ভঙ্গ করে গম্ভীর স্বরে বলেন,

- দেখুন, এমনিতেই কাফিরদের মিডিয়া আমাদের বিপরীতে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে এমন কিছু আমরা করতে পারি না যাতে সাধারণ জনগণ উত্তেজিত হয় এবং আমাদের সুনাম নষ্ট হয়।

আমীর সাহেবের কথা শুনে রেজার মনে আতঙ্ক ভর

করে। দুর্নামের ভয় যখন কোনো মুসলিমের মনে ঢোকে তখন সে আস্তে আস্তে আল্লাহর দ্বীনের মূলনীতিসমূহ পরিত্যাগ করতে শুরু করে। জায়শে নবীর নেতৃত্বস্থানীয়রা এতদিন দুর্নামের ভয় করেনি বিধায় তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের নিন্দা করেছে কিন্তু সত্যপন্থীরা তাদের খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারাও দুর্নামের ভয়ে শরীয়তের দু'একটি মূল্যবোধকে উপেক্ষা করতে শুরু করছে। এই সর্বনাশা নীতি পরিত্যাগ না করলে দলটির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। রেজার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কিছুই বের হয় না। দুঃখে তার মনটা ভেঙে যায়। শুধু বলে,

- সুনাম নষ্ট হওয়ার ভয় যার আছে তার জিহাদ করার কি দরকার। মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না।

তখনই আমীর সাহেব বলে উঠলেন,

- থামো, তুমি কি জানো তুমি নেতৃত্ব অমান্য করছো! যা গুরুতর অপরাধ।

সমাবেশ থেকে ফেরার পথে রেজাদের কমান্ডার রেজাকে বেশ বকাঝকা করলেন। তিনি বললেন,

এধরণের বোকামীর কারণে উপর থেকে রেজার শাস্তির ব্যবস্থা করা হতে পারে সে জন্য প্রস্তুত থাকতে। রেজার কোনো প্রস্তুততির দরকার নেই। তবে রেজাকে ছাড়া শাহিন আর হাসনাতের এখানে থাকা বেশ কষ্টকর। তাদের কিছুটা প্রস্তুতির দরকার হবে নিশ্চয়। ক্যাম্পে ফিরেই তাই রেজা শাহিন আর হাসনাতকে সব খুলে বললো। এ জন্য যে তার শাস্তি হতে পারে সেটাও বললো। সব শুনে শাহিন তো কেঁদেই ফেললো। হাসনাত কাঁদেনি তবে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। রাতে রেজার ডাক পড়লো। কমান্ডার বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন,

- তোমার শাস্তির নির্দেশ এসেছে। আমাকে বলা হয়েছে অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তোমাকে যেনো কথা বলতে না দেওয়া হয়। তোমার সঙ্গীদের সাথেও নয়। তোমার কারণে মুজাহিদদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুঝতেই পারছো আমরা এখন যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি। এখানে বন্দি রাখার খুব একটা সু-ব্যবস্থা নেই। তাই যদি পারো আমীরের নির্দেশ মেনে নিজেই নিজেকে বন্দি করে রাখো, সেটাই ভাল হয়। সারাদিন পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটাতে একা বসে থাকবে। তুমিও কারও সাথে কথা বলবে না অন্য কেউ যেনো তোমার সাথে কথা না বলে। যদি তোমাকে

অন্য কারও সাথে কথা বলতে দেখা যায় তবে তোমার উপর কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো।

রেজা সত্যি সত্যিই নিজেকে বন্দি করে রাখলো। কঠিন শাস্তির ভয়ে নয়। শাস্তিকে সে ভয় পায় না। শুধু আমিরের আনুগত্যের স্বার্থে সে কটা দিন মুখ বুজে থাকলো। জায়শে নবীর উপর এখনও তার আস্থা রয়েছে। তারা দেশী-বিদেশী মুজাহিদদের মধ্যে বৈষম্য করলেও ইসলাম তো কায়েম করবে! বিশ্বব্যাপী খেলাফত তো প্রতিষ্ঠা করবে! রেজার জন্য এটাই যথেষ্ট। অতএব, খুটিনাটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমীরের নির্দেশ অমান্য করা তার নিকট বৈধ মনে হয় না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য ছিল না। সে তো সাধারণ মুজাহিদদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করে নি বরং নেতৃস্থানীয়দের নিকট তা তুলে ধরেছে। এটা বিশৃঙ্খলা নয় বরং সংশোধন। অতএব, তার উপর আরোপিত এ শাস্তি জুলুম। কিন্তু শৃঙ্খলার স্বার্থে এ জুলুমকে মুখ বুজে সহ্য করলো রেজা। এভাবে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলো।

এরপর একদিন হঠাৎ কমান্ডার সব মুজাহিদদের একত্রিত করলেন। প্রথমেই জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, মহান আল্লাহ মুসলিমদের একনেতৃত্বে একত্রিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই

নির্দেশকে অনুসরণ করে এই অঞ্চলের সাতটি মুজিহাদ গ্রুপ মিলে একটি জোট গঠন করেছে। এই সাতদলীয় জোট একত্রিত হয়ে সরকারী বাহিনীর উপর বিরাট হামলা করার পরিকল্পণা করেছে। হামলাটা সফল হলে, ঐ অঞ্চলে তাগুতের শাসন পরিত্যাক্ত হবে এবং ইসলামের শাসন শুরু হবে। ঐ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আশা করি আপনারা সবাই সানন্দে রাজি আছেন। সবাই সানন্দে রাজি হলো। তাগুতী বাহিনীর উপর বিরাট হামলাম কথা শুনে রেজাও খুশি হলো কিন্তু এই সাত দলীয় জোটের ব্যাপারটা রেজার মনে একটা জট পাকিয়ে দিলো। মহান আল্লাহ মুসলমানদের একনেতৃত্বে একত্রিত হতে বলেছেন। বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে বহুদলীয় জোট গঠন করতে বলেন নি। ইসলাম কায়েম করাই যদি এসব দলগুলোর সবার ইচ্ছা হয় তবে তারা একজন অন্য জনের নেতৃত্ব মেনে নেয় না কেনো? নাকি নেতৃত্ব বা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করাই এদের উদ্দেশ্য? রেজার নিকট সেটা এখন বিরাট একটা রহস্য। সেই রহস্যকে সমাধান করতে হলে নিজ চোখে সাতদলীয় জোটের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করাটা জরুরী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই সে অভিযানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

চারিদিক থেকে বিশাল মুজাহিদ বাহিনী একযোগে

হামলা শুরু করলে সরকারী বাহিনী প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিন দিনের মধ্যে তারা পরাজিত হয় এবং এলাকাটি মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। তখন মুজাহিদদের চোখে মুখে যে আনন্দের ঝিলিক দেখেছিল রেজা সেটা কখনও ভুলবে না। বিশেষত জায়শে নবীর সদস্যরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিল আর বলছিল এ এলাকায় আজ থেকে ইসলামী শাসন কায়েম হলো। রেজা ভাবে,

- সত্যিই কি ইসলামী শাসন কায়েম হলো! চিরটাকাল সে কুরআন-হাদীসে পড়ে এসেছে, চুরির শাস্তি হাত কেঁটে দেওয়া, জেনা কারীর শাস্তি বেত্রাঘাত করা, বিবাহিত হলে রজম করা, সন্ত্রাসীকে শূলে চড়ানো। সত্যিই কি আজ থেকে এখানে এসব শাস্তি প্রয়োগ করা হবে? সে নিজ চোখে এসব দেখতে পারবে? এমন হলে তো তার জীবন ধন্য হবে। কত দিনের স্বপ্ন পূরণ হবে!

রেজার স্বপ্ন কিন্তু পূরণ হলো না। পরদিন জায়শে নবীর আমীর স্বয়ং তাশরীফ আনলেন। এলাকাটিকে তিনি ইসলামী ইমারাত হিসেবে ঘোষণা করলেন। আবেগী যুবকরা প্রশ্ন করলো,

- এখানে কি হদ কায়েম হবে?

আমীর সাহেব দ্রুত বলে ওঠেন,

- না, না। হদ কায়েম হওয়ার সময় এখনও হয় নি। এখন আমরা যুদ্ধ অবস্থায় রয়েছি। এখন হদ কায়েম করা যাবে না। যুদ্ধ শেষ হলে এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে এবং হদ কায়েম করা হবে। হদ কায়েম করার জন্য তামকীন শর্ত।

রেজা দাঁতে দাঁত চেপে মনের রাগ মনে চেপে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আর সহ্য হয় না। একটু এগিয়ে গিয়ে আমীর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে,

- আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

কথাটা কে বলল দেখার জন্য মাথা তুলে তাকাতেই আমীর সাহেব চমকে ওঠেন। কয়েকবার ঢোক গিলে রাগত স্বরে বলেন,

- না, না কোনো প্রশ্ন চলবে না। এটা তো আর প্রশ্নোত্তর পর্ব নয়।

সুযোগ হাতছাড়া হতে দেখে রেজা চিৎকার করে বলে,

- আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আমার প্রশ্নগুলো আপনাকে শুনতে হবে। তারপর যে শাস্তি হয় দেবেন।

আরব দেশে একটা নিয়ম আছে। আল্লাহর কসম দিয়ে কিছু বললে সেটা শুনতে হয়। অগত্যা আমীর সাহেব প্রশ্নগুলো শুনতে রাজী হলেন। রেজা বলতে শুরু করে,

- আপনি বললেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

মুজাহিদদের দখলকৃত ভূ-খন্ডে হদ কায়েম হবে না। কারণ হদ কায়েমের জন্য তামকীন তথা স্থায়ী ক্ষমতা শর্ত। প্রশ্ন হলো এর মধ্যে যদি এখানে চুরি, ডাকাতি, জেনা ইত্যাদি কর্মকান্ড ঘটে তবে তার কি হবে? যদি বিনা বিচারে এগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তো অন্যায় অবিচারে পুরো এলাকা ছেঁয়ে যাবে।

আমীর সাহেব খুব স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়া হবে কেনো! প্রচলিত আইনে বিচার হবে। এখানে গোত্র প্রধানরা আছে। আগে যে নিয়মে এসব সমস্যার সমাধান করা হতো এখনও সেভাবেই করা হবে। আমরা মুজাহিদরা এসবের মধ্যে নাক গলাবো না। এখনই আমরা হদ কায়েম করবো না।

- এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহর বিধান কায়েম করতে হলে তামকীন শর্ত আর প্রচলিত তাগুতের বিধান কায়েম হওয়ার জন্য সেটা শর্ত নয়?

আমীর সাহেবের মুখটা তিতো হয়ে যায়। তিনি কিছু বলতে পারেন না। উপস্থিত অন্যান্য মুজাহিদদের মধ্যে দুরকম অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কেউ রাগান্বিত হয় আর কেউ আনন্দিত হয়। আমীর সাহেবকে নিরব দেখে রেজা আবার বলে,

- আপনি বললেন, যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন হদ কায়েম হবে। প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ কখন শেষ হবে?

আমীর সাহেব যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। বেশ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

- এই সহজ বিষয়টা বুঝলেন না। এদেশের তাগুতী শাসনের অবসান হলেই যুদ্ধ শেষ হবে। তখনই আমাদের তামকীন হবে। আমরা তখন শরীয়তের সব হদ কায়েম করবো।

মুচকি হেসে রেজা বলে,

- আপনি কি মনে করেন এ দেশের তাগুতী শাসনের অবসান হলেই আশেপাশের তাগুতী শাসকরা আর বিশ্বের পরাশক্তিরা এখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি মেনে নেবে? তখন তারা বোমা হামলা করবে না? প্রয়োজনে সৈন্য পাঠিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে না?

আমীর সাহেব সহজভাবে বলেন,

- তা তো অবশ্যই করবে।

রেজা উৎসাহী হয়ে বলে,

- এভাবে হক বাতিলের লড়াই কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। মহান আল্লাহ বলেন, কাফিররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে কখনই বিরত হবে না। রাসুলুল্লাহ (সঃ)

বলেন, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। যুদ্ধের কোনো শেষ নেই। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত হদ কায়েম হবে না। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। কুরআন হাদীসের কোথাও আপনি হদ কায়েমের জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়া শর্ত এটা দেখাতে পারবেন না। এটা ভ্রান্ত যুক্তি, যা কাফির-মুশরিকরা মুসলিমদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাতে জীবনে কখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয়।

এ পর্যায়ে আমীর সাহেব হাত নেড়ে রেজাকে থামানোর চেষ্টা করেন। পিছন থেকে একদল মুজাহিদ চিৎকার করে বলে,

- ওকে বলতে দিন, ওর প্রশ্নের উত্তর দিন।

ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এই ভয়ে আমীর সাহেব তিক্ত কথাগুলো শোনার জন্য আবার নিজেকে প্রস্তুত করেন। রেজা বলে,

- যে সাতটি দল জোটভুক্ত হয়েছে তারা সবাই কি সত্যিই এ দেশে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়?

আমীর সাহেব বেশ জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন। রেজা বলে,

- তাহলে সাত দলীয় জোট গঠন না করে আপনারা একজনকে আমির নিয়োগ করে একদল হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন না কেনো? এই যেমন ধরুন আপনি নিজের নেতৃত্ব এবং দলীয় নাম পরিত্যাগ করে অন্য একটি দলের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন না কেনো? এটা কি নেতৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে?

- না, না এর অনেক কারণ আছে। অন্য দলের নেতারা ইসলাম কায়েমের কথা বললেও তারা প্রতিবেশী তাগুতী রাষ্ট্রের সাথে গোপনে আঁতাত করে। তাদের নিকট সহযোগিতা পায় এবং তাদের কথামতো কাজ করে। তারা স্বাধীন নয় বরং তাগুতী শক্তির অধীন। আমরাই একমাত্র দল যারা কোনো তাগুতের সহযোগিতা গ্রহণ করি না। তাদের নেতৃত্বে চলে গেলে তো স্বাধীনভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কাজ করার মত আর কেউ থাকবে না।

রেজা আফসোস করে বলে,

- স্বাধীনভাবে আর কাজ করছেন কই। তাগুতের ঐ সব চেলাদের সাথেই তো জোট করে কাজ করছেন। সবাই মিলে যখন দেশটা স্বাধীন করবেন তখন আপনার একার কথা তো আর চলবে না। যাদের সাথে জোট করেছেন তাদের কথাও তো শুনতে হবে।

নামধারী এসব ইসলমী দল যেসব তাগুতী শাসকদের নুন খাচ্ছে তারা যা বলবে সেদিন এরা তাই করবে। তাগুতী শাসকরা কখনই ইসলাম কায়েমের পক্ষে থাকবে না। অতএব, এসব নামধারী ইসলামী দলগুলো এখন ইসলাম কায়েমের কথা বললেও সময়মতো ঠিকই বেঁকে বসবে। আফগান জিহাদ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পায়। অতএব ইসলাম কায়েম করতে হলে সঠিক বিশ্বাসের অধিকারী মুজাহিদদের এককভাবে সকল বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি অর্জন করতে হবে। তেলে জলে মিশিয়ে গোলেমালে একটা রাষ্ট্র কায়েম করাই যথেষ্ট নয়। শহীদের রক্তের সম্মান রাখতে হলে পরিপূর্ণ একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে আপনারা সেটা করতে পারবেন না। এর জন্য দরকার অন্য কোনো শক্তি। বাতিল পন্থীদের সাথে জোট নয় বরং সত্যপন্থী মুজাহিদদের একক শক্তি। সারা বিশ্বে তাদের নেতা হবে একজন। যাকে বলা হবে খলীফা। সেই খলীফার নেতৃত্বে এক ও একীভূত হয়ে মুসলিমরা এমন শক্তিশালী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবে যার সামনে সকল বাতিল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিশ্বের সকল তাগুত তার সামনে বালুকণার মতো উড়ে যাবে।

খলীফা আর খেলাফতের কথা শুনে আমীর সাহেবের

মনটা আতঙ্কিত হয়ে যায়। এদেশের সীমানার ওপারে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে একদল মুজাহিদ জিহাদ করছে। প্রথমে তাদের মধ্যেও অনেক দলাদলি ছিল কিন্তু পরে একত্রিত হয়ে তারা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছে। যে কোনো অঞ্চল দখল করার পরেই তারা সেখানে ইসলামী আইন-কানুন চালু করে। এসব কারণে তাদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিক এবং নামধারী আলেম-ওলামারা যথেষ্ট প্রচার প্রসার করছে কিন্তু তারা সেসবের কোনো পরওয়া করে না। খুব কম সময়ের মধ্যে তারা অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছে। মুখের দাবী কাজে পরিণত করার কারণে যুবকরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এতদিন তাদের সাথে জায়শে নবীর কোনো বিরোধ ছিল না। তারা তাদের দেশে যা খুশি করুক তাতে জায়শে নবীর বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না। জায়শে নবীর মুজাহিদদের স্বাধীনভাবে মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। অতএব নিজ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দলছুট হয়ে জায়শে নবীর কোনো সদস্য তাদের সাথে যোগ দেবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে তারা খেলাফতের ঘোষণা দিয়ে সীমানা ভেঙে এদেশে ঢুকে পড়বে। সেক্ষেত্রে যুবকদের ধরে রাখা কঠিন

হবে। সবাই তাদের দলে যোগ দেবে। অতএব তাদের বিষয়টি এদেশের সবগুলো মুজাহিদ দলের নিকট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যুবকদের সামনে একটা কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জোট করে কিছু একটা করে দেখাতে গিয়ে নিজেদের অদক্ষতা মানুষের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই স্পষ্ট বিষয়কে অস্পষ্ট করার জন্য যে কাজটি প্রায়ই করে থাকেন তিনি এবারও তাই করলেন। গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

- আপনি কি ঐ খারেজীদের কথা বলছেন যারা আমাদের দেশে হামলা করতে চায়? ভীন দেশে হামলা করাটা কি সৈরাচারীতা নয়?

খারেজী কারা রেজা এটা বুঝতে পারে না কিন্তু ভীন দেশে হামলা করার ব্যাপারে আমীর সাহেব যা বললেন সেটা তার নিকট আপত্তিকর মনে হয়।

- ভীন দেশে হামলা করা সৈরাচারীতা হবে কেনো? আপনারা এদেশ দখল করার পর প্রতিবেশী দেশগুলোতে তাগুতী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে হামলা করবেন না?

- না, না। প্রতিবেশী দেশে আমরা হামলা করবো

কেনো?

- তাহলে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে কিভাবে?

কিছুক্ষণ নিরব থেকে আমীর সাহেব বলেন,

- ঐ দেশের লোকেরা আমাদের মতো সংগ্রাম করে নিজেদের দেশে ইসলাম কায়েম করবে। আমরা ভীনদেশ থেকে সেখানে কেনো যাবো?

রেজা বুঝতে পারে কাফির-মুশরিকদের বেঁধে দেওয়া সীমানা এসব নামধারী মুজাহিদদের কতটা প্রভাবিত করেছে। সে আক্ষেপ করে বলে,

- ধরে নিলাম প্রতিটা দেশে এভাবে পৃথক পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে কিন্তু বিশ্বব্যাপী এক খলীফার খেলাফত তো এভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়! অথচ আপনারা মুখে বলেন আমরা খেলাফত চাই। সেটা কিভাবে হবে?

আমীর সাহেব এবার যেনো খেই হারিয়ে ফেলেন। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে একটা গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করেন,

- এটা খুব একটা কঠিন নয়। সব দেশগুলোতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে তখন সবগুলো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা একটেবিলে বসে জোট করে একটা খেলাফত কায়েম করলেই হবে।

রেজা হেসে ওঠে,

- তার মানে সাত দলীয় খেলাফত তাই তো?

কথাটা শুনে কয়েকজন হেসে ওঠে। রেজা আবার বলে,

- আপনারা ডজনখানেক ইসলামী দল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী না হয়েই এক নেতৃত্বে আসতে পারছেন না আর প্রতিটা রাষ্ট্রের আলাদা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এবং ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর একজন আরেকজনের অধীনে চলে আসবে এমন মন্তব্য করছেন? আপনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। ভোট করে যেমন খেলাফত হবে না জোট করেও হবে না, এটা মনে রাখবেন।

আমীর সাহেব কিছু বলার আগেই তার কানে ভেসে আসলো উপস্থিত মুজাহিদদের একটা দল স্লোগান দিচ্ছে,

ভোট বাদ জোট বাদ

খেলাফত জিন্দাবাদ

বিষয়টা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। অতএব, এখানে এখনই রক্তপাত হতে পারে ভেবে নেতৃত্বস্থানীয়রা দ্রুত আমীর সাহেবকে সরিয়ে নিলেন। একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

- ভাই সব দ্রুতই খেলাফতের ঘোষণা হবে। জামানার

ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন আত্মপ্রকাশ করবেন এবং আগামী শুক্রবার জুময়ার খুতবায় খলীফা মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেবেন। আমাকে এই বার্তা সহ শামে পাঠানো হয়েছে। আমি বিষয়টি ঘোষণা করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এই যুবকের বরকতে আল্লাহ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রশংসা।

কথাটা বলে রেজার দিকে দৃষ্টি ফেলে মুচকি হেসে ওঠে যুবকটি। রেজাও মুচকি হেসে তাকে স্বাগত জানায়। যুবকটি বলতে থাকে,

- আমাদের হাতে মোটেও সময় নেই। কুচক্রীরা এতক্ষণে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। এখনই আমাদের এই অঞ্চল পরিত্যাগ করতে হবে। যারা খেলাফতের রাজ্যে প্রবেশ করতে চান তারা আমার সাথে আসতে পারেন। আমি রাস্তা চিনি এখান থেকে বেশি দূরে নয়। রাস্তায় কেউ আমাদের বাঁধা দিলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবো।

উপস্তিত সবাই চিৎকার করে তাকবীর দিয়ে ওঠে। সে তাকবীরে রেজার মনটা উত্তোলিত হয়ে ওঠে। যুবকটি রেজার কাঁধে হাত দিয়ে বলে,

- কী ভাই! যাবেন তো খেলাফতের রাজ্যে?

রেজার কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শাহিন আর হাসনাতের চেহারা। ডান হাতের দুই আঙ্গুল উঁচিয়ে সে বলে,

- জায়শে নবীর ট্রেনিং ক্যাম্পে আমার দুজন বন্ধু আছে।

- আছে তো কি হয়েছে! আমরা আবার আসবো। খেলাফতের বাহিনী শামে আসবে, বায়তুল মাকদিস দখল করবে, ইমাম মাহদী আসলে তার হাতে পতাকা তুলে দেবে। শামের এই ভূমি আমরা মুরতাদ আর মুনাফিকের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে ছাড়বো। ইনশাআল্লাহ।

উপস্থিত মুজাহিদদের কেউ কেউ বলে,

- আমরা তো জায়শে নবীর আমীরের হাতে বায়াত হয়ে রয়েছি এ বায়াত ভঙ্গ করা কি বৈধ হবে?

যুবকটি সহাস্যে বলে,

- জায়শে নবীর আমীরের হাতে আপনারা বায়াত হয়েছেন কেনো? ইসলামি হুকুমত আর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নাকি নানা কৌশলে ইসলামী মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করার জন্য?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে,

- ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য।

যুবকটি আবার বলে,

- কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারা তা করতে ইচ্ছুক নয় অথবা ইচ্ছা থাকলেও সেটা করতে তারা সক্ষম নয়। তাই তো যেসব দল তাগুতের সাথে আতাত করে তাদের সাথে জোট গঠন করেছে। সুতরাং যে শর্তে তাদের হাতে আপনারা বায়াত হয়েছিলেন সেটা তারা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি অতএব, তাদের বায়াত পূর্ণ করার জরুরত নেই। এখন হবে আসল বায়াত। খেলাফতের বায়াত।

যুবকের চোখে মুখে আশার আলো যেনো ঝিলিক দিচ্ছে। কথাটা বলেই সে দ্রুত সামনে রওয়ানা হয়ে যায়। তার পিছু পিছু মুজাহিদদের বিরাট একটা দল রওয়ানা হয়। রেজা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিজের অজান্তেই সে তাদের দলে ভিড়ে যায়।

খেলাফতের রাজ্যে গিয়ে রেজা সত্যিই অভিভূত হলো। সেখানে ইসলামী আইন রয়েছে। মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করে তা বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। অমুসলিমদের জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। মুরতাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ সত্যিই

তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। বাকি আছে শুধু একটি বিষয়। খেলাফতের ঘোষণা। শুক্রবার দিন সেই স্বপ্নটিও বাস্তবায়িত হলো। বিভিন্ন জনের নিকট শোনা গেলো খলীফা বায়াত নিয়েছেন, খেলাফতের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলার অঙ্গীকার করেছেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। পরদিন রেজাদের অঞ্চলে একজন প্রতিনিধি আসলেন। খলীফার বয়ানের অডিও শোনালেন। তারপর খলীফার পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে বায়াত করালেন।

“আমি অঙ্গীকার করছি শুনবো ও মানবো আমার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক। যদিও আমার উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ....

সেই একই কথা, কিন্তু কত পার্থক্য!! এটা খেলাফতের বায়াত। পুরা মুসলিম উম্মাহকে একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করার বায়াত। তিনি কোনো দেশ বা গোত্রের নেতা নন, তিনি সারা বিশ্বের নেতা। তার নিকট কাফিরদের তৈরী এসব সীমানার কোনো মূল্য নেই। তিনি এসবের উর্ধ্বে। কিন্তু সত্যিই কি তিনি এসব সীমানাকে অমান্য করে নিজের দেশের বাইরে কোনো বাস্তব ভূমিকা রাখবেন! নাকি এ সবই মুখের দাবী মাত্র? রেজার মনটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ সন্দেহ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। খেলাফতের দায়িত্ব

গ্রহণের পরেই সীমানা পেরিয়ে শামে হামলা করার নির্দেশ হলো। বিশাল বাহিনী অভিযানে বের হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে রেজাও ছিল। জায়শে নবী শামের অন্যান্য বিদ্রোহী দলের সাথে একজোট হয়ে এই হামলা প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণ লড়াই করলো। কিন্তু খেলাফতের বাহিনীর সামনে তারা ধুলিকণার মতো উড়ে গেলো। গোলাবারুদ আর বোমার আঘাতে চারিদিকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল। তার মধ্যে মুজাহিদরা ছোটাছুটি করছিল। মনে হচ্ছিল তারা মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। রেজার মনে হয় জীবনের সব চাওয়া তার পাওয়া হয়ে গেছে। শুধু একটা চিন্তা,

- শাহিন আর হাসনাত বেঁচে আছে তো!

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েকদিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা খেলাফতের অধীন হয়ে গেলো। অনেক বিদ্রোহী মুজাহিদ নিহত হলো, অনেকে বন্দি হলো। খেলাফতের বাহিনী বিদ্রোহী মুজাহিদদের মধ্যে পরিচিত মুখগুলো খুঁজে বের করছিল। কেউ খুঁজছিল নিহতদের মধ্যে আর কেউ খুঁজছিল বন্দিদের মধ্যে। নিহতদের মধ্যে খোঁজার সাহস হলো না রেজার। সে বন্দিদের মধ্যে খুঁজতে লাগলো। সে ভেবেছিল জীবিত অবস্থায় হয়তো তাদের পাওয়া যাবে না। মনে মনে কেবল দোয়া করছিল

“আল্লাহ তুমি তাদের উপর তোমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করো, খেলাফতের বাহিনীতে যুক্ত না করে তুমি তাদের মৃত্যু দিয়ো না।” আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন। কিছুক্ষণ খোঁজার পর এক সময় সে উভয়কে খুঁজে পেলো। আনন্দে তার হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। পালাক্রমে তাদের সাথে আলিঙ্গন করলো। বন্দির দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি রেজার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলেন। তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি উভয়কে মুক্তি দিলেন। রেজা তাদের নিয়ে দ্রুত ঐ এলাকা থেকে চলে আসার জন্য জোরে পা চালাতে লাগলো। যেনো সে ভয় করছে হয়তো তার বন্ধুরা আবার বন্দি হয়ে পড়বে। শাহিন তাকে থামিয়ে বলল,

- আচ্ছা, খারেজী মানে কি?

রেজা ভীষণ অবাক হয়ে বলল,

- কেনো?

- ওরা বলছিলো, খারেজীরা আসছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তা না হলে তারা তোমাদের কেটে টুকরো টুকরো করবে।

শাহিনের কথা শুনে রেজা হো হো করে হেসে উঠে বলে,

- খারিজ মানে বাইরের দিক। অতএব খারেজী মানে

যারা বাইরের দেশ থেকে হামলা করতে আসে। বুঝেছো?

রেজার তামাশাটা শাহিন ধরতে না পারলেও হাসনাত হেসে ওঠে। সে খারেজী শব্দের প্রকৃত অর্থ জানে। এখন সে এটাও জেনেছে যে, এই অর্থে খেলাফতের বাহিনীকে খারেজী বলা চলে না। তবে রেজা যে ব্যাখ্যা দিলো সেই অর্থে তারা অবশ্যই খারেজী। কিন্তু সে খারেজীতে সমস্যা নেই। সাহাবারা আরব দেশ থেকে গিয়ে অনেক বাইরের দেশে হামলা করেছেন। ভীন দেশে হামলা করে দ্বীন কায়েম করা দোষের কিছু নয়। বরং এটাই তো খেলাফতের বৈশিষ্ট। অতএব, এ অর্থে খেলাফতকে খারেজী হওয়াই লাগবে।

শাহিন আর হাসনাতের দিকে তাকিয়ে রেজা বলে,

- এখন কেবল একটি কাজ বাকী আছে।

হাসনাত বিস্মিত হয়ে বলে,

- কী কাজ?

- বায়াত হতে হবে।

বায়াত হওয়ার কথা শুনে শাহিন আৎকে ওঠে। আতংকিত হয়ে বলে,

- আবারও বায়াত!

হালকা হেসে রেজা বলে,

- হ্যাঁ। এবার হবে আসল বায়াত। খেলাফতের বায়াত। যে বায়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয় সেই বায়াত।

কথাটা শুনে শাহিনকে কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হয়। নানা রকম নকল বায়াতের মাঝে আসল বায়াত যে সত্যিই আছে এটা যেনো তার বিশ্বাস হতে চায় না। শাহিনের মনের অবস্থা রেজা বুঝতে পারে। সে ভাবে,

- সত্যিই তো! পীর-মুরীদীর নকল বায়াত, তথাকথিত সালাফীদের তাগুতের হাতে বায়াত, গণতন্ত্রপন্থীদের কল্পিত ইসলামী আন্দোলনের নেতার হাতে বায়াত, জাতীয়তাবাদী মুজাহিদদের আমীরের হাতে বায়াত এতসব বায়াতের মাঝে আসল বায়াত খুঁজে পাওয়া কি সহজ ব্যাপার! তারা যে একজন সত্যীকার খলীফার হাতে বায়াত হতে পেরেছে এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা! গর্বে রেজার বুকটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়।

- সমাপ্ত -

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)

২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)

৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)

৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস

৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)

৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)

৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী

৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)

৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)

১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা

১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন

১৩. দরবারী আলেম

১৪. মারেফাত

১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্

১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ

১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল

১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)

২০. মাসায়িলুল ই’তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু”
কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

* ভাষা শিক্ষা:

৩০. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩১. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)
২। ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
৩। সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)